প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের
ডক্টরেট অফ ফিলোজফি (পিএইচ.ডি) উপাধির শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

মনোজিৎ মণ্ডল

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. শিবাশিস চ্যাটার্জী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

CERTIFICATE

Certified that the thesis titled **'প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫): একটি মূল্যায়ন'** submitted by me for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Prof. Shibashis Chatterjee (Department of International Relations, Jadavpur University)**, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

LTI of Manojit Mondal

Countersigned by the

Candidate: 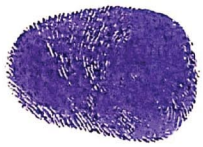

Supervisor:

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Dated: 06.11.2024

Dated: 06.11.2024

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন, অত্যন্ত প্রভাবশালী জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর হাত ধরেই ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়তে গিয়ে আমার মনে এই জনপ্রিয় নেতার প্রতি গবেষণা করবার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি আমার গবেষণার জন্য প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি।

আমার এই গবেষণা পত্রটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহস, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন যিনি তিনি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. শিবাশিস চ্যাটার্জী মহাশয়। তিনিই আমার গবেষণা সন্দর্ভটির তত্ত্বাবধান করেছেন। কাজ করতে গিয়ে বারংবার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, বার বার ভুল করেছি কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে আমার গবেষণা সন্দর্ভটিকে পূর্ণতা প্রদানে তার অকৃত্রিম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার সহায়তা ছাড়া আমার গবেষণা পত্রটির বাস্তবায়ন ছিল কল্পনাতীত। তাই তার প্রতি রইলো আমার অন্তঃস্থলের সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিশা দেখিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড.পার্থ প্রতিম বসু মহাশয়। তাঁর প্রতিও রইলো আমার অন্তঃস্থলের সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও আমার গবেষণা পত্রটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি সরবরাহের কাজে সহায়তা করেছেন যারা তারা হলেন, সহকারী অধ্যাপক ড.মৈনাক পূততুন্ড, সহকারী অধ্যাপক ড.আশরাফুল ইসলাম লস্কর, সহকারী অধ্যাপক শ্রী অবিনাশ দর্ণাল, সহকারী অধ্যাপক শ্রী ঋষভ জয়সোয়াল, সহকারী অধ্যাপক শ্রী শঙ্কর ভুঁইয়া, সহকারী অধ্যাপক শ্রী সুবীর গায়েন। পাশাপাশি সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলেন শ্রী কমল মন্ডল, শ্রী নারায়ণ মন্ডল, শ্রী অজয় বর। কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন আমার পিতা শ্রী রণজিৎ মন্ডল এবং আমার স্ত্রী শ্রীমতী সুমিতা মন্ডল, আমার দাদা শ্রী মৃনাল দত্ত মহাশয়, আমার মামী চন্দনা মন্ডলের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মানুষের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণা পত্রটি টাইপ ও প্রুফ দেখার কাজ অত্যন্ত যত্নসহকারে করেছেন আমার প্রিয় ছাত্র লোকেশ মন্ডল। তার কঠোর পরিশ্রমের অবদান ভোলার নয়। তার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মনোজিৎ মণ্ডল

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা। ১–৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করা হবে। ৩৩-৫৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে। ৫৯-৮৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। ৮৮-১২০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসন ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। ১২১-১৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ১৬৫-২২১

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার। ২২২-২৩৫

গ্রন্থপঞ্জী ২৩৬-২৪২

মুখবন্ধ

১৯৪০ সালের পর মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দলে দলে ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও মুসলিম সমাজের জনগণ এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানও এই আন্দোলনের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ক্রমশ তাঁকে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল।

১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের দিকে রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সিলেটের গণভোটেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত বাংলা গঠনের দাবির প্রতিও শেখ মুজিবুর রহমানের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের উপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন শুরু করেছিল। এর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। এছাড়াও আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য রাজনৈতিক তারকায় উন্নীত হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এই কারণে আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে 'প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) - একটি মূল্যায়ন' বিষয়টি বেছে নিয়েছি।

এই পর্বটি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সেই সম্পর্কেও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষকরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষণা করতে এগিয়ে আসবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের বিষয়টি ছিল না। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠন করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই। ১৯৪৬ সালে দিল্লি কনভেনশনে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি পরিবর্তিত করে একটিমাত্র রাষ্ট্র অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাসিম প্রমুখ এটা মেনে নিতে পারেননি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই দেখা যায় ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলা গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিবুর রহমানও এদের সঙ্গে ছিলেন।

মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়েছিল। দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী সংঘাতও কম ছিল না। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একদল নেতাকর্মী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই ভিন্নধর্মী রাজনীতি চর্চা শুরু করেছিলেন। এরা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ বলে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই সমস্ত প্রগতিশীল নেতা কর্মীরা ঢাকার ১৫০ নং মোগলটলিতে এসে তাঁদের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসিম, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। মুসলিম লীগের এই সমস্ত প্রগতিশীল কর্মী প্রথমে যুবলীগ, তারপর ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দলটির জন্ম দেয়। এই দলের নাম ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেয় আওয়ামী লীগ। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন রক্ষণশীল মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বিপদজনক। কারণ, সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির সমর্থক। তাই তাঁকে দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের রাজনৈতিক তৎপরতা অঙ্কুরেই যাতে বিনাশ করা যায়, তারজন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই আক্রমণ শুরু করে বাংলা ভাষার উপর। তারা ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্যকোন ভাষা নয়। এর বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন। বাঙালিরা উপলব্ধি করে যে, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই এই ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনঃ ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গনপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও

উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গনপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখন্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গনপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলা ভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়। বিতর্কের পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাংলাকে গনপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ব বাংলায় গন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গনপরিষদে দেওয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষনার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবি শ্রেনি এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকার ছাত্রগন ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলা ভাষার সমর্থনে স্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকায় মিছিল করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শেষ হলে সেখানে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তমুদ্দিন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন, পাকিস্তান গনপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন তা কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয় , বরং সমস্ত বাঙলা ভাষাভাষীদের দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে। বাংলা ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে ২মার্চ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। নবগঠিত এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে এটাই ছিল প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম গ্রেফতার।

১১ই মার্চের ধর্মঘট সফল করতে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, দৌলতপুর, যশোরের মতো কয়েকটি স্থানে জনসভা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ, ১১ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের দিন আন্দোলনের রনকৌশল স্থির করার জন্য রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আপসকামীরা আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। তারা সরকারের সাথে আপস রফায় যেতে চায়। এর তীব্র প্রতিবাদ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে গাজিউল হক লিখেছেন, ঢাকায় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হল। ১১ মার্চে (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১১ মার্চে রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি সভা বসল। সভায় আপসকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপোস

করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল, সরকার কি আপোস প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। এই বজ্রকণ্ঠ ছিল শেখ মুজিবের। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলির শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপসকামীদের ষড়যন্ত্র ভেসে গেল। এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সৈনিক অলি আহাদের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন, তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না।"

১১ মার্চ সকাল থেকে সেক্রেটারিয়েটের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশ ছাত্রদের উপর পেশি শক্তি প্রয়োগে তৎপর হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এই আন্দোলন দুর্বল করার জন্য পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায়, ব্যবহার করে কাঁদানি গ্যাস। ৪৯ জন ছাত্র জখম হন। গ্রেফতার করা হয় ৬৯ জন ছাত্রকে। কিছু ছাত্রকে ধরে নিয়ে অন্যত্র রেখে আসে নাজিমুদ্দিন প্রশাসন। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পুলিশের নিক্ষেপ করা কাঁদানি গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সুস্থ হলে তিনি গ্রেফতার হন। এই আন্দোলন নাজিমুদ্দিন সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। কঠোর দমননীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়নি। আন্দোলনের প্রবল চাপে নিঃশর্তে আন্দোলনকারীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। মেনে নেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের আট দফা দাবি।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৫২ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তিনি আরো বলেন পরীক্ষামূলক একুশটি কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ও জনগণ স্বীয় উদ্যোগে নতুন কেন্দ্র খুলছে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে আটদফা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাকে জলাঞ্জলী দিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের এই ঘোষণার ফলে পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য খাজা নাজিমুদ্দিন যে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করতে ওই আটদফা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন দূরদর্শি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। খাজা নাজিমুদ্দীনের এই জনবিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এই ধর্মঘটকে সাফল্য মন্ডিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে আন্দোলনকারীরা । ১৯৫২ সালের ৪ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রার ডাক দেয়। হাজার হাজার ছাত্র এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের যুবলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোস্তফা রওশন আখতারের প্রস্তাবে যুবলীগ নেতা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২১ শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার প্রস্তাব

গৃহীত হয় ও একটি বিশাল মিছিল রাজপথ পরিক্রমা করে। ২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট - বড় সভা সমিতি ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রশাসন হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠলে আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলনে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫২ সালে শেখ মুজিব জাতীয় নেতায় পরিণত হননি। তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতিও খুব বেশি ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালিদের ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেখ মুজিবের প্রথম গ্রেফতার। ভাষা আন্দোলন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের আপসহীন সংগ্রাম ১৯৬৬ ও তার পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য রাজনৈতিক চরিত্রে পরিনত হন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক নেতা। সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে মাসুদুল হকের উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করে শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে চূড়ান্ত শীর্ষে উপনীত করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন ....।" ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ আত্মসচেতন বাঙালিদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শেখ মুজিবের পক্ষে কারাগারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমান জেলের ভিতরে থেকে যেভাবে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করতে প্রয়াস চালিয়েছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন দূরদর্শি রাজনীতিবিদের কাছে জাতি এমনটাই আশা করে। ভাষা পাগল বাঙালিরা যখন ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকা জেলে বন্দি । ভাষা আন্দোলনের নেতা মহিউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী, ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তিনি ও শেখ মুজিবুর রহমান দূজনে যুক্তি করলেন যে মুজিব অসুস্থতার ভান করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবেন। ডাক্তারের সাহায্যে শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। শেখ মুজিবের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা। তিনি চিরকুটের সাহায্যে আন্দোলনকারীদের কাছে নির্দেশ পাঠাতেন।

১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমেদ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দুই নেতা মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে জেলের মধ্যেই আমরন অনশন শুরু করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক উত্তেজেনা শুরু হয়। শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্ত আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন উদ্যমের সূচনা করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমেদকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়। নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তাদের সাথে দেখা হয় শামসুদ্দোহাসহ কয়েকজন ছাত্র নেতার। শেখ মুজিব অনুরোধ করে গেলেন যেন ২১ ফেব্রুয়ারিতে হরতাল মিছিলের শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন শেখ মুজিবের অনশন শুরু ও অনশন ভাঙার তারিখ নিয়ে লেখকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে শেখ মুজিব যে জেলের

অভ্যন্তরে আমরন অনশন শুরু করেছিলেন এ বিষয়ে লেখকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে বঙ্গ আইনসভার সদস্য আনোয়ারা খাতুন শেখ মুজিবের অনশনের বিষয়টি মুলতবি প্রস্তাব হিসেবে উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যদিও এই প্রস্তাবটি সরকার পক্ষ গুরুত্বহীন বলে মনে করলেও বাঙলার জনগণ ও ভাষা পাগল ছাত্র যুবকদের মধ্যে আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করে।

আন্দোলনের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে ভীত সন্ত্রস্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকার ২০ তারিখ বিকালের দিকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করার ঘোষণা করেন। পাকিস্তান রেডিওতে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়। বলা হয় একমাস ঢাকায় কোনো সভা, সমিতি, মিটিং, মিছিল করা যাবে না। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কিনা এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সভায় অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো দাবি জানান। এখানেও আপোষকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আপোষকামীরা এই রকমই ষড়যন্ত্র করেছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের আন্দোলনের ক্ষেত্রে। সেইদিন এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ঠিক হয় ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না। আপোষমুখীদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলো বাঙলা মায়ের দামাল ছেলেরা।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ভাষা পাগল ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমা হতে থাকে। দলবদ্ধহয়ে স্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম.এল.এ. ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে গিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকেন। পুলিশ এসময় বেপরোয়া ভাবে ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালায় । ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল ও অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জ। পুলিশ ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই রফিকউদ্দিন আহমদ, আব্দুল জব্বার শহীদ ও প্রায় ১৭ জন গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে আনা হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম আবুল বরকত রাতে অপারেশন টেবিলে মারা যান।

গুলি চালানোর সাথে সাথেই পরিস্থিতি অচিন্তনীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৪৪ ধারার নাম নিশানাও তখন আর দেখা যায় না। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সচিবালয় ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেড়িয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে।

বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেও এসে লাগে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নূরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর কৈফিয়ৎ দাবি করেন এবং পরিষদ মুলতবি রাখার দাবি জানান। নূরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন -"কয়েকজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদের ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না। "পরিষদ কক্ষেই এমন জঘণ্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠল। লীগ পরিষদ দলের সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ বলে উঠলেন - "যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবি নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত, তখন আমরা

আরামে পাখার নীচে বসে হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না"- এই বলে তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি শোক মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। আন্দোলন তীব্রতর হয়। ঢাকা শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে ধর্মঘটের চেহারা নেয়। শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। উত্তেজিত জনতা মর্নিং নিউজের অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। আন্দোলন দমন করতে সরকার এইদিন কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। অনেকেই আহত হন। রিকশা চালক আব্দুল আউয়াল শহীদ হন। আব্দুল আউয়ালের এই মৃত্যু প্রমাণ করে ভাষা আন্দোলন শুধু ছাত্র, যুবক ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলন গন-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ঢাকা শহর অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জের রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ও শহীদদের স্মরণে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্ররা শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। দ্রুত এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ এই শহীদ মিনার দর্শনের জন্য ভিড় করতে থাকেন। এই শহীদ মিনার তীর্থস্থানে পরিনত হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই শহীদ মিনারটি জনগণের দেখার কোনো বিষয় ছিল না। প্রকৃতপ্রস্তাবে শহীদ মিনারটি ছিল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই শহীদ মিনারটি পুলিশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলে ঢুকে ছাত্রদের উপর পুলিশ নারকীয় অত্যাচার চালায়। কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেও ভাষা আন্দোলন দমন করা যায়নি। এই আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ভিত নাড়িয়ে দেয়। আন্দোলনের চাপে বাংলার আইনসভা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য গনপরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে।

আন্দোলনের প্রবল চাপে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সরকার বাধ্য হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিরোধকে জোরদার করার প্রয়াস নেন। খুব সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশর জন্ম হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে এই নির্বাচনের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার উদ্ভব ঘটে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মানুষ প্রথম মুসলিম লীগ ও শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ও জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি আওয়ামী মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের মর্যাদা

লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৮ ই মার্চ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা চালায়। মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে *Left Democratic Party, Awami Muslim League, Nezam-e-Islami* এবং *Labour Party* নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।

মৌলানা হামিদ খান ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেয় তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। এই ২১ দফার মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র-যুবক, হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য-বস্ত্র ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের কথাও বলা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে। পূর্ব বাংলায় তৃণমূল স্তরের জনগনের কাছে ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যুক্তফ্রন্ট নেতারা সক্ষম হন।

২১ দফার বিপরীতে কোনো শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করতে ব্যর্থ হয় মুসলিম লীগ। তাদের একমাত্র ইশতেহার ছিল, ইসলাম ধর্ম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি। তাই এই নির্বাচনে দেখা গেল মুসলিম লীগের কর্মসূচির প্রতি জনগণের কোনো আস্থা ছিল না। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির দিশা, তাই পূর্ব বাংলার মানুষ এই কর্মসূচিকে সাদরে গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, শোচনীয় পরাজয় ঘটে মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগ নির্বাচনে পেশি শক্তি প্রয়োগ, প্রশাসনের অপব্যবহার, অর্থ, মিথ্যা মামলা, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করেও নির্বাচনে জয়ী হতে পারলো না।

৮ই মার্চ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল যুক্তফ্রন্ট ৩০১ টি আসনের মধ্যে ২২৪ টি আসনে জয়লাভ করেছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ একাই পেয়েছিল ১৩৪ টি আসন এবং মুসলিম লীগের ভাগ্যে জোটে মাত্র ৯ টি আসন। প্রদত্ত ভোটের ৬১ শতাংশই আওয়ামী মুসলিম লীগের অনুকূলে আসে এবং মুসলিম লীগ পায় প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৪ শতাংশ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের টিকিটে গোপালগঞ্জ মহকুমার কুঠারিপাড়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই নির্বাচনে শেখ মুজিবের প্রতিপক্ষ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সম্পদশালী নেতা পাকিস্তান বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জুমান ঠান্ডামিয়া। ঠান্ডামিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবের জয় সহজ ছিল না। ঠান্ডা মিয়া অর্থবল, পেশিশক্তি, প্রশাসনের সহযোগিতা ইত্যাদি ব্যবহার করার পরও এই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করতে ব্যর্থ হন। প্রবল প্রভাবশালী এই নেতার বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের গনসমর্থন এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কিছুই ছিল না। মৌলানা ভাসানীর নির্দেশে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিকে পাথেয় করে শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিয়েছেন কুঠারিপাড়া কেন্দ্রের ভোটাররা। শেখ মুজিবুর রহমান

বিপুল ভোটে এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। ১০ হাজার বেশি ভোট পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর পান ১৯ হাজার ৩৬২, ওয়াহিদুজ্জুমান ১ হাজার ৫৬৯ ভোট। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আন্দোলনের লড়াইয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আত্মনিয়োগ করেন।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে। এ.কে ফজলুল হক হন প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবুর রহমানও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য হন। যুক্তফ্রন্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই ২১ দফা কর্মসূচি ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করার দিকে অগ্রসর হয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় মুসলিম লীগকে হতাস করে এবং ২১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ঘটনায় এই দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। মুসলিম লীগ নেতারা শুরু করে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। যেনতেন প্রকারে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দেওয়াই এই দলের মূল কর্মসূচিতে পরিনত হয়। এই অবস্থায় সংবাদপত্রে একটি গুজব রটে যে এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তবে এর স্বপক্ষে তাঁরা কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রর্দশন করতে ব্যর্থ হন। এ.কে. ফজলুল হক এটা বোঝাতে ব্যর্থ হন যে তিনি বাঙলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। এই ভুয়ো খবরটিকে ব্যবহার করে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯২(ক) ধারা জারি করে তিন মাসের মধ্যেই ভেঙে দেয়। গৃহবন্দি করা হয় এ.কে.ফজলুল হককে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বহু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর ব্যাপক ধরপাকড় চলে। তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিঃ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ১৯৬৬ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এই বছরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে পাকিস্তানের জনপ্রিয় জাতীয় নেতায় পরিণত হন। শুধু তাই নয় তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়। এমন এক সময় এই ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয় যখন পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে আকাশ ছোঁয়া দ্রব্য মূল্য, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার ভীতি ও আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন শোষনে পূর্ব পাকিস্তানে এক হতাশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর কনভেনশনে বাঙালিদের মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর এই দাবি বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কনভেনশনের সভাপতি চৌধুরী মহম্মদ আলি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি কনভেনশনে গৃহীত না হওয়ায় তিনি তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুসলিম লীগ কনভেনশনে মৌলানা মহম্মদ ভাসানী ছয় দফা দাবিকে বিচ্ছন্নতাবাদী বলে আখ্যা দেন। ভাসানী স্পষ্ট মন্তব্য করেন ছয় দফার পেছনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর হাত রয়েছে। তাদের বক্তব্য এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন এটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল। ছয় দফা দাবি মেনে নিলে পাকিস্তানই শক্তিশালী হবে।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি আরেকটি কারণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেটা হল, এর রচয়িতা কে বা কারা? এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের যে সমস্ত প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাহোরে বিরোধী দলগুলোর কনভেনশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তারা কেউই জানতেন না বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি উত্থাপন করবেন। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগেও কোন আলোচনা হয়নি। কনভেনশনের আয়োজন কর্তৃপক্ষকেও কিছু জানানো হয়নি। তাই বিতর্কিত ছয় দফা দাবি উত্থাপনকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধে।

১১ ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই অঞ্চলের নিরাপত্তার দিকে কোনো নজর দেওয়াই হয়নি। ছয় দফা বাঙালিদের একমাত্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। তিনি বলেন, এটা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে বিরোধী দল ও রাজনৈতিক নেতারা যে সমালোচনা করে চলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে বলেন এই ধরনের সমালোচনা লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছুই না।

আগরতলা মামলা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলাটি একটি মাইলফলক। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। এর জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ছিল এই প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সে জন্যই একে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আগরতলা মামলা নামে।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন এটি প্রমাণিত যে, এই মামলার ভিত্তি ছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য দেখে, স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার বা কুশীলবরা যেভাবে বিষয়টি সাজিয়েছিল আসলে সেটি তেমন কিছু ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য ভেবেছিলেন, একটি পরিকল্পনা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্যই জাতীয় বীর।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এ ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পাকিস্তান সরকার মামলা সাজিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত

নৌ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন ১৯৬২-৬৩ থেকে এবং অধিকাংশই ছিলেন নিম্ন পর্যায়ের অফিসার। ক্যাপ্টেন শওকতরা প্রধানত একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূল বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। সিভিল সার্ভিসের রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল, কারণ এরা সবাই ছিলেন বাঙালি প্রেমী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি। শওকত আলীদের কাছে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করছেন এবং গোপনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সজাগ নন। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন । বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। প্রশ্রয় হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি যে মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা তো সত্য, স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও তো সত্য। গোয়েন্দা দফতর তা জানত। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এ মামলা করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা প্রচার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব ভারত বা হিন্দুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছেন।

এই মামলার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হল যে শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়ছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু তো ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে। এই সময় আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। এখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রধান হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে 'ড্যাক'।

ইতোমধ্যে মামলার শুনানি শুরু হলে পত্রিকাগুলি ফলাও করে প্রচার করতে থাকে অভিযুক্তদের প্রতি কী অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা শুধু প্রত্যাহার নয়, বিনা শর্তে সকল অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয়।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানঃ পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বছরে সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তীব্র গন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই রকম গনবিস্ফোরন পাকিস্তানে আর কখনো হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পূর্ব বাংলার মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তৃনমূল স্তরের জনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাই ১৯৬৯ সালের এই গণআন্দোলনকে ৬৯-এর গনঅভ্যুত্থান বলা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরো কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহ্বান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচী' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী। ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা । কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য।

১১ দফা ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী কাউন্সিল, মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক'ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে (ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম, (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কলাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার, (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার.... দাবি করেন। মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন "জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।"

শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও রাজনৈতিক দলের ৮ দফা বাঙালিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ৬ দফা ও ৮ দফা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১১ দফার মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ছাত্ররা ছিলেন চালিকাশক্তি। তাই আমরা দেখি আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের শুরু করে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই দেখা যায় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশী নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারী ছাত্রদল এনএসএফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আসাদের শহীদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল। লিখলেন কবি শামসুর রহমান-

"আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন, এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি। পরদিনও ইপিআর পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খাঁরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস. এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফু।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফু ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর

মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। এই আন্দোলনের প্রবল চাপে স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানেরও পতন ঘটে।

৭০-এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধঃ আয়ূব খানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শাসনব্যবস্থায় একগুচ্ছ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটায়। বাংলার মানুষ মনে করেছিলেন ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের উপরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাজনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটাবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আইয়ূব খানের তুলনায় ইয়াহিয়া খান কম স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাঁর আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবথেকে বেশি রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রুখে দাঁড়ান ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা সহ বেশ কিছু আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্কিত কর্মসূচির সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী ইশতেহার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে এলে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে দুহাত তুলে আশির্বাদ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই দল। এই ফলাফল হতবাক করে দেয় ইয়াহিয়া খান পরিচালিত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে। শাসকগোষ্ঠী একপ্রকার নিশ্চিত ছিল যে, এই নির্বাচনে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা এই নির্বাচনে কোনো দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেনি। শান্তিপূর্ণ ভাবেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তান ও সমগ্র পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ।

এই নির্বাচনে দেখা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০ আসন লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্স পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রে টাল বাহানা শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্র এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা। শেখ মুজিবের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনার পরেও কোন সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন মার্চ মাসের ৩ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। খান সাহেবের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ৩ তারিখের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না, এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সাধারণ ধর্মঘট,

মিছিল, আইন অমান্য ও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার নীতি গ্রহন করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পুলিশের লাঠি গুলি উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, তৈরি করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের দিনে গভর্নর হাউসের মতো কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোথাও উড়তে দেখা গেল না পাকিস্তানের পতাকা। তাদের স্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু" ইত্যাদি স্লোগানে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তখন মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। এখানের জনপ্রশাসন পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ফলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। বিদ্রোহের আগুন যখন জ্বলছে, সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। মুক্তিকামি বাঙালি আন্দোলনের নতুন রসদ খুঁজে পায়। সোহরাওয়ারদী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি আরো বলেন তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

ইয়াহিয়া খানের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ এখন আর তার হাতে নেই। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা করার নির্দেশ দিয়ে টিক্কা খানকে গভর্নর জেনারেল করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন। ২৫ শে মার্চ ইতিহাসের এক কালো দিন, এই দিন পাকিস্তানি সেনারা শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট'। এই দিন রাতে পাকিস্তানের সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষের উপর। ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জারি করা হয় কারফিউ। অল্প বয়সী মেয়ে ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এমন যুবক ছিল তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। পাক বাহিনীর নির্বিচারে এই গণহত্যার ফলে ঢাকা রক্তের নগরীতে পরিণত হয়।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই বাংলাদেশর স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল, জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ তখনো ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর। তার মাটিতে তখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দানবেরা।

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়ার্ত নারী–পুরুষ, শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল তিনি যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছেন, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের মাঝে দখল করে নেবেন। কিন্তু বাস্তবে সেটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড়ো অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শোনান। এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নূতন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা, ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময়ে পাকিস্তান থেকে দুইটি ডিভিশন বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিক্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীকে সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল

বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কলেরা ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মানুষ মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই!

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নূতন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অবঃ) এম. আতাউল গণি ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে. এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর সি. আর. দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ. মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. এ. জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্যে, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না, নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-

কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং শফিউল্লাহর নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের অদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইলে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলাযোদ্ধার একটি দল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক যুদ্ধে যোগ দেয়, যুদ্ধে যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না, এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্যে গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলাবাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের নিজেদের লেখা বইয়ে একটি ছোট কাহিনি এরকম: ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজশাহীর রোহনপুর এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। শত অত্যাচারেও সে মুখ খুলছে না। তখন পাকিস্তানি মেজর তাঁর বুকে স্টেনগান ধরে বললেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। নির্ভীক সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিকে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন করবে! এই হচ্ছে দেশপ্রেম, এই হচ্ছে বীরত্ব এবং এই হচ্ছে সাহস। এঁদের দেখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এই দেশটিকে তারা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না, আগে হোক পরে হোক, পরাজয় স্বীকার করে তাদের এই দেশ ছেড়ে যেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক

কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

জুলাই মাসের দিকে নূতন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না ।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয় এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী, নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল, তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল!

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না!

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা, মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করলেন। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।

শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনকালঃ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নয়নের মনি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশে উপস্থিত হলেন। রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে সাদরে গ্রহণ করলেন। লাখ মানুষের এই সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানালেন। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনিই হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ, সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো হলোঃ (১) প্রশাসন সুষমকরণ; (২) ভারত প্রত্যাগত প্রায় এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন; (৩) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকদের নিয়ন্ত্রণ; (৪) যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং রেলসড়কের মেরামত; এবং (৫) জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প এবং অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করে তোলা। এছাড়াও বেশ কয়েকটি কারণে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানযোগ্য যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো সেগুলো হলো: (ক) বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থিতি; (খ) সীমান্তে চোরাচালান; (গ) যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিলো এমন দালালদের উপস্থিতি; এবং (ঘ) যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশে

আটকে পড়া বিহারী অবাঙালী এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের পাশাপাশি, সংগ্রামে সফলতা আসার পর দেশের জনগণের আচার আচরণে গগনচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছিলো। স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবের দায়িত্ব ছিলো দেশের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ন।

স্বাধীনতার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ জনগনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জনগণ যে আশায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য শেখ সাহেবের সরকার একগুচ্ছ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেমন- পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থার জাতীয়করণ, ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, পরিকল্পনা কমিশন ও পাঠশালা পরিকল্পনা, জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন, দালাল আইন ইত্যাদি একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই পদক্ষেপগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে আমার গবেষণা পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় এই সমস্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না। এছাড়াও আওয়ামী লীগ ছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সামর্থ্যও ছিল না। তাই দেখা যায় এই সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই ফুলে ফেঁপে ওঠে। রাতারাতি কয়েকগুণ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাদের। জনগণ ক্রমশ দরিদ্রতম হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। খাদ্যের অভাবে ১৫ লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু হয়। দেশে লুটপাট, খুন, ধর্ষণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি, চোরাচালান মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। খুব সহজভাবে বলা যায় অবস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসনের থেকেও নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রবনতা শুধুমাত্র নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল। ত্রান বন্টন কর্মসূচি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন ইত্যাদি মহান কর্মসূচি গুলির মাধ্যমে লাভবান হয়েছিল আওয়ামী লীগ। পরিস্থিতি এতই সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, আওয়ামী লীগ নেতাদের পাহাড় সমান দুর্নীতি দলের অভ্যন্তরেই সংঘাতের সৃষ্টি করে।

আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচিও ছিল। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধ মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্মূল করা। এই কাজে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করত। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হত না। আমলাতন্ত্রের উপর ছিল রাজনৈতিক এলিটদের আধিপত্য। দালাল আইনের সাহায্যে হতদরিদ্র মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের হয়রানি করা হতো তাদের গায়ে দালাল তকমা লাগিয়ে দিয়ে। মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি বাহিনীর কার্যকলাপে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনকে একপ্রকার প্রহসনে পরিণত করে আওয়ামী লীগ ও শেখ সাহেবের সরকার। এক পর্যায়ে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার জয় সুনিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক বর্গের সার্বিক মুক্তির জন্য একটি প্রগতিশীল সংবিধান প্রণয়ন করেন। দেখা যায় এই সংবিধানকে ক্রমশ দুর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৭২ সালর ৪ ঠা নভেম্বর সংবিধান গ্রহণের দিন বাংলাদেশের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ছিল না। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা প্রথমে না থাকলেও দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমেই এটা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থার একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন। এর মাধ্যমে বাকশাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সরকারি কর্মচারীও সংসদ সদস্যদের বাকশালে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। কয়েকজন আওয়ামী লীগ সাংসদ বাকশালে যোগদান করতে অস্বীকার করলে তাদের সাংসদ পদ বাতিল করা হয়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয় এক ব্যক্তির হাতে। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হয়ে বসেন রাষ্ট্রপতি। শেখ সাহেব সারাজীবন যে উচ্চ গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুশীলন করেছিলেন সেই আদর্শকেই নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। শেখ মুজিব এটিকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলেছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবেও বাকশাল ব্যবস্থাকে গণ্য করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের শ্রেণিচরিত্র সমাজতন্ত্র নির্মানের উপযোগী ছিল না। এটা ছিল ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে সমস্ত সেনা অফিসারদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন সেই সমস্ত অফিসাররা দাবি করেন যে, সেনাবাহিনী ও কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তারা এই বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র অবস্থায় অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মুসলিম লীগের হাত ধরে। তিনি ১৯৪০ সালের পর মহম্মদ আলি জিন্নাহর পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ তাঁকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। শহীদ সাহেবের নির্দেশে পাকিস্তান আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনমত সংগ্রহ করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। মুসলিম লীগের প্রবল চাপে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন শুরু করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান একটি নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ।

শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পরেন। পাশাপাশি বাঙালিদের উপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হল ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালিদের মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৯ সালে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে তাঁর মুক্তির দাবিতে প্রবল গনআন্দোলন গড়ে ওঠে। পাশাপাশি ৭০-এর নির্বাচন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের জন্ম ও স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসন ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক তারকা।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৬ - ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সেই অভাব কিছুটা পূরণের উদ্দেশ্যে "প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (1966 - 1975)- একটি মূল্যায়ন" এই শিরোনামটি আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান, পুস্তক ও নথিপত্রের সাহায্যে আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছি।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক সমস্যা ও ধারণা লাভের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যার দ্বারা গবেষণামূলক বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।

ডক্টর রওনক জাহান তার "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা" প্রবন্ধে প্রধানত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার মানবতাবাদী এক ব্যাক্তি। তাত্ত্বিক আলোচনা অপেক্ষা তার চিন্তা ছিল অত্যন্ত বাস্তব ও কর্মমুখী। বঙ্গবন্ধুর চিন্তায় অত্যাধিক গুরুত্ব পেয়েছে ব্রিটিশ বিরোধীতা ও স্বদেশীকতা, পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। তাঁর এই রাজনৈতিক আদর্শ গুলি জনগণের কাছে অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। মুজিবুর রহমানের আহবানে মুক্তিকামী বাঙালি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল।

মোহম্মদ জাফর ইকবাল, "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস"- বইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপক বৈষম্যের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ বাঙালি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের জন্য কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিকামী বাঙালিরা জেল, পুলিশের লাঠি উপেক্ষা করে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। অত্যন্ত কঠোর হাতে শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তিনি আরো দেখিয়েছেন 'রাজাকার আলবাদার' নামক এক অংশের বাঙালি, শাসকগোষ্ঠীকে সহায়তা করলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি কামী বাঙালিরাই জয়ী হয়। জন্ম হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

আবুল ফজল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার "শেখ মুজিব তাকে যেমন দেখেছি" গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা

করেছেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন উদার মূল্যবোধ সম্পন্ন নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন, সমাজে যার যেমন সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্য শেখ মুজিব সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। মুজিবের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করলেও, লেখক তার শাসনব্যবস্থার কিছু ত্রুটি সম্পর্কেও এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। যেমন- মুক্তি ফৌজ ও আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের দৌরাত্ব, শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশগুলি নিম্ন স্তরে বাস্তবায়িত না হওয়া এবং বাকশাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Talukder Maniruzzaman, 'Bangladesh: An Unfinished Revolution?' vol. 34, No. 4 (Aug., 1975) প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছিল। কমিউনিস্ট দলগুলি এই বিষয়কে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে মনে করেছেন। বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে তারা বলেন, এই বিজয় অর্জিত হয়েছে ভারতের হাত ধরে। ভারত সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয়ের পেছনেও সাম্রাজ্যবাদের হাত ছিল বলে বাম মনোভাবাপন্ন দলগুলি মনে করেন। বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের সহায়তা গ্রহণ কমিউনিস্ট দলগুলি ভালো চোখে দেখেনি। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে কমিউনিস্ট দলগুলি সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশ শিল্প জাতীয়করণ করা হলেও সেগুলি ছিল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। মুজিববাদের আদর্শ গুলি কমিউনিস্ট দলগুলি মহান বলে মনে করলেও জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র মুজিববাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, তা কমিউনিস্ট দলগুলোর কাছে ছিল নেতিবাচক। এমনকি আওয়ামী লীগ দলের মধ্যেও ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল। পাশাপাশি কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যেও মতানৈক্য ছিল বর্তমান।

অরুন সেন, "দুই বাঙালি এক বাঙালি" গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাঙ্গালীদের কিছু ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বাঙালির নিজস্ব সত্তার উপর কঠোর আঘাত করেছে, তবুও বাঙ্গালীদের ঐক্য পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়নি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দেয়। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। তবে মুসলিমরা যে একদম অংশগ্রহণ করেনি একথা যুক্তিযুক্ত নয়। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিছুটা বিকশিত হয়। তবে এটা শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছিল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পরে 'ভাষা আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। এই ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে। এই আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়, যার চরম পরিনতিতে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের।

Ayesha Siddika, Amina Saara Khan, "Sheikh Mujibur Rahman and the Understaing of Democracy: A Brief Analysia"(Jan., 2021) প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণতন্ত্রের পূজারী হিসেবে তুলে ধরেছেন । বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান মুজিববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেখ মুজিবের দর্শনের চারটি নীতি রয়েছে, সেগুলি হল- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই প্রবন্ধটিতে

মূলত গণতন্ত্র সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গণতন্ত্র সংবলিত নীতি ও গণতন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিমী ধ্যান-ধারণাকে বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিব। বাকস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের আধিক্য ও মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে ভোটাধিকার ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। গণতন্ত্রের এই মূলনীতি গুলি বাস্তবায়িত করার জন্যই পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মুজিব। এই কারণে তাকে সহ্য করতে হয়েছিল অমাণবিক নির্যাতন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুর্নীতি, সশস্ত্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে ও গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শেখ মুজিব বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যা এই গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বাকশাল ব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী। মুজিবের এই অগণতান্ত্রিক প্রবণতা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা হস্তগত হয়। এই চারটি খাতা অনুধাবন করে লেখা হয়েছে "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থটি। এই বইটিতে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখক-এর বংশপরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতা কেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশ বিভাগের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সালে রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজির দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ বিষয়ে লেখক-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। আরো বর্ণনা করা রয়েছে লেখকের কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সর্বোপরি সহধর্মিনীর কথা। যিনি তার রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সকল দুঃসময়ে অবিচল পাশে ছিলেন। একই সঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও এই বইটিতে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে "কারাগারের রোজনামচা" বিশেষ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার মানুষের জন্য 'ছয় দফা' দাবি উত্থাপন করেন। এই অপরাধের জন্য শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কারারুদ্ধ করে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কারাগারে অবস্থানকালে শেখ মুজিবের লেখা ডায়েরী অনুসরণ করে এই পুস্তকটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্র-পত্রিকার অবস্থা, শাসকদের নির্যাতন ও ছয় দফার গুরুত্ব ইত্যাদি এই গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মুজিবের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। আরো দেখানো হয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবের আত্মত্যাগ ও বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

রেহমান সোবহান তাঁর "উত্তলরোমন্থনঃ পূর্ণতার সেই বছরগুলো" এই গ্রন্থটিতে তাঁর বংশপরিচয়, তাঁর কলকাতায় বেড়ে ওঠা, দার্জিলিং-এ পড়াশোনা, লাহোরে অবস্থান, লন্ডনে গমন ও কেমব্রিজে পরিণত হওয়ার বছরগুলো সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়, রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ-এ পরিণত হওয়া, জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম লগ্নের সাক্ষী হওয়া, একজন বলিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন রাষ্ট্রদূত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

Rounaq Jahan, "Bangabandhu and After conflict and change in Bangladesh" এই নিবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুজিব পরবর্তীকালের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে এই খবর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের স্তম্ভিত করে। তিনি উল্লেখ করেছেন মুজিব প্রশাসনের অদক্ষতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণে সমালোচিত হলেও মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে রওনক জাহান দেখিয়েছেন মুজিবের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল মুজিবের ব্যক্তিত্বের উপর। আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাদের কার্যক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা ছিল না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব এ ক্ষেত্রে বজায় ছিল তাদের উপর। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলি বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। শেখ মুজিব সেনাবাহিনী উপেক্ষা বেশি নির্ভর করতেন প্যারা মিলিটারির উপর। তাই সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। শেখ মুজিব বাংলাদেশে ভারতীয় রাজনীতির মডেল অনুসরণ করেছিলেন, যা বাংলাদেশে সাদরে গৃহীত হয়নি। শেখ মুজিবের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে কিছুটা সক্ষম হলেও, পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিব জেলে বন্দী ছিলেন যুদ্ধে শুধু আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি পাশাপাশি মুক্তি ফৌজ ও সেনাবাহিনীর মতো বিভিন্ন বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয় বিপ্লব নামে শেখ মুজিব একনায়কতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। তাই ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট একদল তরুণ সেনা অফিসারের হাতে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণ দিতে হয়।

"দুই বাঙালি এক বাঙালি" প্রবন্ধে লেখক অরুন সেন দেখিয়েছেন উনিশ শতকের প্রথমদিকে হিন্দু মুসলমানের সংঘাত যে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাষা। বাংলা ভাষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন আরব, ফারসি ও উর্দু ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটায় তেমনি হিন্দুরা বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার শুরু করে। তিনি দেখিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে লেখকরা এই দুটি প্রবণতার বিরুদ্ধে কলম ধরেন তারা বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষায় সংস্কার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়। তবে তাদের এই ইচ্ছা সফল হয়নি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষিত করে পূর্ব বাংলার মানুষ। মৌলবাদ বাংলা ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতা উৎপাদনে এখনো সচেষ্ট ও সক্রিয়।

"ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামীলীগ" গ্রন্থে আহমেদ মুসা তুলে ধরেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রভৃত ক্ষমতা ভোগ করত। আওয়ামীলীগ সরকার এই সংগঠন গুলির পাশাপাশি আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে বিরোধী মতাবলম্বীদের কঠোরভাবে নির্মূল করত। এই সমস্ত সংগঠন গুলি বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষকে পদদলিত করে নিজ দলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা ও চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষমতা ভোগ করা। এই সমস্ত বাহিনীর দাপটে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আমলারা রীতিমতো আতঙ্কিত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আওয়ামীলীগের যোগসূত্র ছিল খুবই কম। তাই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি কোনো অবস্থাতেই যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য আওয়ামীলীগ হত্যার রাজনীতি বেছে নেয়। বহু রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে শেখ মুজিবের ঘাতক বাহিনী। আহমেদ মুসা তাঁর গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে চরম বিশৃঙ্খলা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করলেও সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলা দেশের মানুষের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক মুক্তি ঘটবে কোন পথে তার কোনো সুস্পষ্ট দিশা দেখাননি।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি আই.এ" পুস্তকে মাসুদুল হক তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দুটি পরাশক্তি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। এই দুটি রাষ্ট্র তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থিত করার লক্ষ্যে নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ'র উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানের উপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। মাসুদুল হক মুক্তি আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ এর ভূমিকা স্বাধীনতা যুদ্ধে কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি ছাত্রযুবক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন 'র' ও সি আই এ'র তৎপরতার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তাঁর আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকট অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকও আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে নেই।

"৭১'এর দশমাস" গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করেছেন। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের একটি স্বচ্ছ চিত্র। মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের ভূমিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা নেত্রীদের ভূমিকা, পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের চিত্র, মুক্তি বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ, পাক-ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে একটি গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচিত হয় এই পুস্তকটি। এই গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হলেও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের সার্বিক আলোচনা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত।

"একাত্তরের দিনগুলি" গ্রন্থে জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি সুন্দর স্বচ্ছ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে মুক্তি পাগল বাঙালিদের কঠোর কঠিন আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরেছেন

জাহানারা ইমাম। পাক সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার, রাজাকার, আলবাদর প্রভৃতি সংগঠনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে বোঝা যাবে যে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতার জন্য আত্মীয় পরিজন পরিবার ও নিজের জীবন তুচ্ছ করে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মরণাপন্ন লড়াই করেছিল। এই গ্রন্থটিতে ফুটে উঠেছে গেরিলা যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। কীভাবে তারা গেরিলা কায়দায় পাক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করত সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় এই পুস্তক থেকে। শুধু তাই নয় পাক বাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তানের দালালরা বাংলাদেশে কীভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল সেই নির্মম কাহিনীও এই গ্রন্থে বর্ননা করা হয়েছে। তবে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই গ্রন্থে কোনোরূপ আলোচনা নেই।

"শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল" গ্রন্থে ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ মহদুদ আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রবল আশা-আকাঙ্খা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদেরকে প্রধান শক্তি হিসেবে দাবি করে। যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের কৃতিত্বকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার। এই কর্মসূচি গুলির নেতিবাচক ইতিবাচক দিকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মওদুদ আহমেদ। তাঁর লেখায় শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনব্যবস্থার এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। আইনশৃঙ্খলা, অর্থনীতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান। পাশাপাশি তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে তিন বছরের শাসনে খুন,সন্ত্রাস, লুঠপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, একশ্রেণীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া ইত্যাদি দিক থেকে বাংলাদেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়। শেখ মুজিবের শাসন ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি যে সমস্ত ক্ষেত্রে শেখ মুজিব প্রশাসনিক সাফল্য অর্জন করেছিল সেগুলি সম্পর্কেও লেখক আলোচনা করেছেন। তবে, এই গ্রন্থে প্রবল আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম আলোচিত হয়নি।

"স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস" গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান তাঁদের পুস্তকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বাঙালি জাতির ইতিহাস, ভারত বিভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দেশ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয়। অভিন্ন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস, পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো ও পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য, ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের ভূমিকা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও মুক্তি আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও এগারো দফা আন্দোলন, ১৯৭০ এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক গ্রহণযোগ্য আলোচনা রয়েছে এই পুস্তকটিতে। তবে, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে নেতিবাচক দিকগুলির আলোচনা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত।

"আমার দেখা নয়াচীন" শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কয়েকটি বইয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে পরিচিত। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে নয়াচীন সরকারের আমন্ত্রনে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে চীন সফরে যান। এই ভ্রমনকাহিনীকে কেন্দ্র করেই এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা হিসেবে চীনা প্রশাসন কঠোরভাবে সমালোচিত হতো। শেখ মুজিবুর রহমান চীন সফরে গিয়ে চীনের শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে নয়াচীন সরকার সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। চীনা সরকার অল্প দিনের মধ্যেই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অগ্রগতি করেছে তার প্রশংসা করেছেন এই গ্রন্থে। চীনা সরকার ছাত্রযুবক, শ্রমিক, কৃষক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান ও অন্যান্য রাষ্ট্র গুলিকে নয়াচীন সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করা উচিৎ বলে শেখ মুজিবুর রহমান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে নয়াচীন সরকারের আন্তরিকতার ফলে মানুষের শুধু আর্থসামাজিক অগ্রগতিই ঘটেনি ব্যক্তি জীবনে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধগুলিও বিকশিত হয়েছে। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে নয়াচীন সরকারের সুশাসনের ফলে নাগরিকদের মধ্যে দেশ প্রেমের সঞ্চার ঘটেছে। খুব সহজভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধু কী ধরনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, রাজনীতি ও মানবিক মূল্যবোধের সমর্থক ছিলেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫" গ্রন্থে ভাষা সৈনিক রাজনীতিবিদ অলি আহাদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সময়ে রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির প্রায় কোনোটিই লেখকের লেখনী থেকে বাদ যায়নি। এরকম ঘটনা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন যা সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেননি। যেমন, ভারত বিভাগ, জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা, মুসলীম লীগের ভূমিকা, ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভূমিকা, পাকিস্তান সৃষ্টি, ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিদের তীব্র প্রতিবাদ, পাকিস্তানের রাজনীতি, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ৭৯'এর গণআন্দোলন, মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ভূমিকা, নবগঠিত বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা নেত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন অলি আহাদ। দেখা যায়, লেখক এই গ্রন্থে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

"Bangabandhu Sekh Mujibur Rahaman(1920-75):His political Thoughts and Ideals" ,অধ্যাপক Harun-or-Rashid ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী ধরনের রাজনৈতিক চিন্তার সমর্থক ছিলেন সে সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক রশিদ উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন স্বদেশী ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিবিদ। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তবে তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসী ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের যে ভাষা আন্দোলন দেখা দেয় এই আন্দোলনে শেখ মুজিব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা বিকশিত করার প্রয়াস নেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির উপর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবির উত্থাপন করেন তিনি। বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, জাতির জনক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবুর রহমানের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে এই প্রবন্ধে। রশিদ লিখেছেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি নীতির সমন্বয়ে প্রণয়ন করেন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তবে,বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির ভূমিকা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে কোনো আলোচনা নেই।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" গ্রন্থে মোনায়েম সরকার,আশফাক-উল-আলম-শেখ মুজিবুর রহমান একজন সমাজসেবক হিসেবে কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন সে সম্পর্কিত ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন। এই দুই লেখক তাদের গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর জন্ম, বাল্যকাল, ছাত্রজীবন, মুসলিম লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ, ভাষা আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে একটি সার্বিক আলোচনা করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। পুলিশের লাঠি, জেল-জুলুম ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। কোনো শক্তিই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কখনও আপোস করেননি। বাঙালি জাতির মুক্তি সুনিশ্চিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এগুলি ছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও স্বাধীন বাংলাদেশেকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু কী ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। তবে, গ্রন্থটিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ভূমিকা ও তাঁর শাসনব্যবস্থার জনবিরোধী নীতি বলে পরিচিত সেগুলি আলোচিত হয়নি।

"একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়" গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধ বিকাশ চেতনা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পাক-বাহিনীকে খুন-ধর্ষণ, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল অথবা যারা নিজেরা এগুলি সংগঠিত করেছিল সেই সমস্ত ঘাতক ও দালালদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজাকার,আলবাদর, শান্তি কমিটির লোক প্রভৃতি ছিল দালালগোষ্ঠী। এই গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার পর দেশের জনগণ এই সমস্ত দালালদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে দালালদের বিচার এদেশের মাটিতে অব্যশই করা হবে, তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। দালালদের শাস্তি প্রদানের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নও করা হয় কিন্তু দালালরা শাস্তি পায়নি। আইন এই দালালদের রক্ষা করেছিল। এই আইনের বলেই হাজার হাজার দালাল জেলকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয় ও জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য দালালরা জেলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে অধিকাংশ দালাল মুক্তি লাভ করে। শুধু বঙ্গবন্ধু নন পরবর্তীকালের শাসকগণও দালালদের বিচার তো করেইনি বরং বহু দালালকে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদগুলিতে বসিয়েছে। এই গ্রন্থে দাবি করা

হয়েছে শাসকবর্গের এই আচরণে দালালদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ ন্যায়বিচার পাননি। তবে, এই গ্রন্থে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

"মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশো দিন" পুস্তকে ব্যরিস্টার ও রাজনীতিবিদ সাদ আহমেদ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অগণতান্ত্রিক ভাবে ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধ, প্রচলিত আইন, বিচারব্যবস্থা, গণতন্ত্রের মৌলনীতি প্রভৃতি মহান আদর্শগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দালালদের শাস্তি প্রদানের যে মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় তার এক করুন চিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখকের লেখনীতে ধরা পড়েছে হতদরিদ্র, নিরক্ষর, সাধারণ মানুষের গায়ে দালাল তকমা লাগিয়ে দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। দালাল বলে ঘোষণা করে আওয়ামীলীগ ও মুক্তি বাহিনীর লোকেরা দালালদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, মুক্তিপণ আদায় করেছে, খুন-ধর্ষণ-হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি তারা। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। তিনি উল্লেখ করেছেন দালাল আইনে গ্রেপ্তার হওয়া আসামীদের জেলের অভ্যন্তরে নূন্যতম পরিসেবাও দেওয়া হতো না। তিনি আরোও দেখিয়েছেন সরকারের এই দায়িত্বহীন কার্যকলাপের ফলে দেশ এক চরম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আর্থসা-মাজিক সংকট, চোরাচালান,মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মারাত্বকভাবে বেড়ে যায়। এক শ্রেণীর মানুষ লুঠপাট ও জোর করে সম্পত্তি দখল করে রাতারাতি তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই সমস্ত দিকগুলি আলোচিত হলেও এই গ্রন্থে নয়মাসব্যাপী মরণপণ লড়াই করে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বাঙালি সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

Research Gap

প্রশংসার পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করেন। এর মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয় ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের বাকশালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইভাবে বহুত্ববাদী ধ্যান-ধারণার কণ্ঠরুদ্ধ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাকশালের চেয়ারম্যান। বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। গণতন্ত্রের পূজারী হয়েও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে গণতন্ত্রের মূলনীতি থেকে সরে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তার এই একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গ্রহণের সময় সংবিধানে জরুরি অবস্থা জারি করার কোন সংস্থান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মুজিবুর রহমান জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর মাধ্যমে তাঁর একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা বাংলাদেশ পেয়েছিল, এই স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না কমিউনিস্ট দলগুলি। কারণ হিসেবে তারা বলে মুক্তি আন্দোলনে বিদেশী শক্তি ভারত সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করেছিল শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বাম মনোভাবাপন্ন দলগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর কঠোর

দমন চালায় মুজিব প্রশাসন। এই বাম মনভাবাপন্ন দলগুলির প্রতি মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। মুজিবের শাসনে প্রবল অসন্তুষ্ট ছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও সরকারি আমলারা। সেনাবাহিনী অপেক্ষা প্যারামিলিটারিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আশা সরকারি আমলা ও সেনা আধিকারীদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, মাথাচাড়া দেয় সিন্ডিকেট রাজ ও মুক্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্য । বহুল সমালোচিত শেখ মুজিবের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝা।

২) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য পর্যালোচনা করা।

৩) পূর্ব পাকিস্থানের জনগনের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনার বিবরণ দেওয়া।

৪) বাংলাদেশের উত্থান ও তার সংবিধান প্রণয়ন সংবলিত ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৫) শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন সমন্ধে পর্যালোচনা করা।

গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions)

সামগ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review থেকে এবং সমস্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়-

১) ভাষা আন্দোলন কি বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

২) 'ছয় দফার' ভুমিকা কি ছিল?

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জনগনের আশা-আকাঙ্খা কি পুরন করতে পেরেছিল?

৪) বাকশাল কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল?

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি বা Research Methodology খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার কাজ করার আগে গবেষণাটি কিভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক ও মুল্যায়নধর্মী প্রকৃতির। যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বনে এই গবেষণাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেগুলি হল- ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি। গবেষণাটি গৌন তথ্যসমূহের (Secondary Source) উপর নির্ভর করবে। Secondary Source বা গৌন তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা, সরকারি পাবলিকেশন, আইন, আদালতের রায়, সরকারি-বেসরকারি তথ্য পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করা হবে।

গবেষণাটি প্রতর্ক বিশ্লেষণের (discourse এনালাইসিস) ব্যাখ্যামূলক এবং গঠনবাদী পথ অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। প্রতর্ক বিশ্লেষণ হল ব্যাখ্যাবাদী কারণ এটি অনুমান করে যে "মানুষ বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে যা তাদের কর্মের অর্থ দেয়, এবং রাজনৈতিক আচরণ বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে মানুষের বাহ্যিক ক্রীড়ার সাথে অর্থ সংযুক্ত হয়। ফলস্বরূপ, এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রকৃতির গোপন অর্থ উদ্ঘাটিত করা যা রাজনীতির কুশীলবদের অংশগ্রহণ ও ভাষার সুক্ষ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির ভাবার্থের প্রকাশ। কোন বিশ্বাস এবং ধারণাগুলি এই অর্থের জন্ম দেয় যা আপাতত সম্পর্কহীন নানা ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে? বক্তৃতা বিশ্লেষণ গঠনবাদী, এর উদ্দেশ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যে অর্থগুলি সামাজিকভাবে নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ, 'জাতি পরিচিতির' কোনো প্রদত্ত অর্থ নেই। একটি রাষ্ট্রের জন্য জাতীয় আত্মপরিচিতি বলতে কী বোঝায় এবং এটিকে কীভাবে চিহ্নিত করা হয় তা প্রতর্ক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই গবেষণায় এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় সমূহ(Chapterization)

প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা প্রকল্পের ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসন ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দেওয়া হল নব গঠিত পাকিস্তানের সঙ্গে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য তারা সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একমাত্র উর্দুকে গ্রহণ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই রুখে দাঁড়ায় বাঙালি বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক ও ছাত্র-যুবকরা। ইতিহাসে দেখা গেছে কখনোই কোনো জাতি তাদের মাতৃভাষার অপমান, অমর্যাদা মেনে নিতে রাজি হয়নি, বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে সমস্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একশ শতাংশ বাঙালি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাই দেখা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ শুরু করলে পূর্ব বাংলায় যে ভাষা আন্দোলন দেখা দেয়, এই আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সক্রিয় সৈনিক। 'দুই বাঙালি, এক বাঙালি' গ্রন্থে "বাঙালির আত্মপরিচয়ঃ উনিশশো পাঁচ থেকে একাত্তর" নামক প্রবন্ধে লেখক অরুন সেন দেখিয়েছেন যে, বাঙালির একটি পৃথক পরিচিতি রয়েছে।[১] যেমন- বাঙালির নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, উৎসব এবং সর্বোপরি তাদের সকলের ভাষা বাংলা। অন্যভাবে বলা যায় বাংলা ভাষাই হল বাঙালির প্রধান পরিচয়। বিভিন্ন সময়ে বাঙালি সত্ত্বাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাঙালির এই বিশেষ পরিচিতি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা। কখনো কখনো তারা সাফল্যের নিকটে পৌঁছলেও বাঙালি সত্ত্বাকে ধ্বংস করা যায়নি। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে নব গঠিত বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের অরুনোদয় লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সাল, তখনও ভারত বিভক্ত হয়নি, চলছে তার প্রস্তুতি। সেই সময় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.জিয়াউদ্দিন আহমদ মন্তব্য করেন, 'ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে তেমনই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, জিয়াউদ্দিন সাহেবের এই দায়িত্বহীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পূর্ব বাংলায়। এই প্রসঙ্গে ড.শহীদুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি জিয়াউদ্দিন সাহেবের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা। যদি পাকিস্তান সরকার একটি মাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে বাংলা ভাষাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান গনতন্ত্র সম্মত। ড. শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৯৪৭ সালে। এটি মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদে প্রথম ছাপা হয়। পরে পুস্তিকাকারে

[১] অরুণ সেন, দুই বাঙালি, এক বাঙালি। (কলকাতা ৮৪: অবভাস, ২০১৬), পৃঃ ১৩-৩৬।

রেনেসাঁস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।[২] এই গ্রন্থটি পাঠক মহলে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ড.শহীদুল্লাহের সাথে দেখা করেন এবং এই পুস্তিকাটি পূর্ব বাংলার জনগনের কাছে প্রচুর পরিমাণে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালিয়ানায় কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি বঙ্গ মায়ের প্রাকৃতিক রূপ-রস-গন্ধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। বাঙলার মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা।[৩] তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক ভৌগলিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালান। অন্যভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যে ভাষা আন্দোলন দেখা যায়, সেই আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হারুন-অর-রশিদ উল্লেখ করেছেন- ভাষা আন্দোলনের প্রথমার্ধে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা কাল থেকেই শাসকগোষ্ঠীর শাসন শোষনের নগ্ন চেহারা প্রকাশিত হতে থাকে। স্বৈরাচারী কায়দায় শাসন শোষন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু করতে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার নীল নকশা রচনা করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব বাংলার একদল মুসলিম লীগ নেতা। এর বিরুদ্ধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন। শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে উন্নিত করার প্রয়াস চালান। ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সম্পর্কে আতিক আজিজের অভিমত প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন "ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ- একটি অপরটির সঙ্গে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে অন্যটি কল্পনাতে আসে না।" পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের তীব্রতার বিরুদ্ধে বাঙালি ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবিদের প্রতিরোধও তীব্রতর হতে শুরু করে। এবিষয়ে বাঙালিদের প্রথম সভাটি হয়েছিল কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে। এই সম্মেলনে ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন- পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের

---

[২] খালেক বিন জয়েনউদদীন, "মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান।" *সচিত্র বাংলাদেশ* ৩৭,নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭): 8।

[৩] Harun-or-Rashid, "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-75): His Political Thoughts and Ideals," *South Asia Institute Papers Beiträge Des Südasien-Institutes Heidelberg*, issue 1 (2022): 4.

রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক। এভাবেই ভাষার দাবি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।[৪]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগের একদল বামপন্থী নেতাগন আজাদি লীগ গঠন করেন। তারা দাবি করেন যে রাষ্ট্রভাষা হবে বাঙলা। শেখ মুজিবুর রহমান এই গনআজাদি লীগের প্রতি সক্রিয় সমর্থন করেন। এ থেকে বোঝা যায়, ওই সমস্ত বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি থাকার জন্য গনআজাদি লীগের প্রতি সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করেননি। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এই সংগঠনটি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এই সংগঠনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরবি হরফে বাংলা লেখার কথা বললে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এই সংগ্রাম কারীদের দাবির সমর্থনে থানায় থানায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেকালে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে দিয়েছিল ২৭ বছরের যুবক শেখ মুজিব। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা হয় । এ সভায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে কমিটির মতামত নেওয়া হয়। বৈঠক চলাকালে বুদ্ধিজীবি ও ছাত্রদের একটি মিছিল সেখানে উপস্থিত হয়। এই মিছিলে অন্যান্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।[৫]

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক ও ছাত্র-যুবকদের মতো স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের পুলিশের লাঠি-গুলি ,জেল-জুলুম ও অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন অন্যান্য ভাষা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তার গভীরতার বিস্তর পার্থক্য ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তার শিকড় ছিল অনেক গভীরে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায়, বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় আবিস্কারের কাজ, যা শিল্পী-কবি-মনীষিরা করে চলেছিলেন একটি স্তরে, সেই কাজটিকে তার যৌক্তিক, রাজনৈতিক পরিনতিতে পৌঁছে দিলেন বঙ্গবন্ধু। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল লিখেছেন, "কালে কালে অধিকারের প্রশ্নে বাঙালি জেগে উঠলেও, সূর্যের তেজে চির-অম্লান স্বাধীনতার বীজ এই জাতির চেতনায় প্রথম উপ্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর এবং সেটা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে, যার অন্যতম নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তখন এদেশের ছাত্র সমাজকে তিনি সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।"[৬]

---

৪ আতিক আজিজ, "বাংলা ভাষা প্রেমিক বঙ্গবন্ধু," সচিত্র বাংলাদেশ ৪০, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০২০): ১৪।

৫ খালেক বিন জয়েনউদদীন, "মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান।" *সচিত্র বাংলাদেশ* ৩৭, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭):৫।

৬ মুহম্মদ মনিরুল হক, "বাংলা ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু," News Bangla 24.com., ফেব্রুয়ারি, ২০২১, https://shorturl.at/baZkW।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে সারা জীবন নেতা মেনেছিলেন। কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিলে তাকেই রাজনৈতিক গুরু হিসেবে মেনে চলতেন শেখ মুজিব। ১৯৪৭ সালে নতুন ভারতীয় রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল ভারত বিভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয়। মাউন্ট ব্যাটেনের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দূরূহ হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পরেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছিল না। এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অভিন্ন সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু। সোহরাওয়ার্দী এ বিষয়ে মহম্মদ আলি জিন্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শরৎচন্দ্র বসুও এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপ চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য তাঁদের আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী ও মহম্মদ আলি জিন্না সাড়া দেয়নি। ব্রিটিশের কাছ থেকেও কোনো ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হয়নি তাই দেখা যায় তাঁদের অভিন্ন বাংলা গঠনের প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অসমাপ্ত কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেন শহীদ সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৩৮ সাল গোপালগঞ্জে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শেখ মুজিবুর রহমানের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। প্রথম দেখাতেই শহীদ সাহেব শেখ মুজিবের মধ্যে ভবিষ্যতের একজন উচ্চ গুনাবলী সম্পন্ন নেতা হবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তখন থেকেই শেখ মুজিবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন সোহরাওয়ার্দী। অভিন্ন স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হলে শেখ মুজিবুর রহমান মর্মাহত হন। তাই দেখা যায় ১৯৪৭ সাল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য ভাষা আন্দোলনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে মনোনিবেশ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারত থেকে একটি সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে যান। এঁদের মধ্যে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। রায় লিখছেন- "শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা কবে প্রথম আপনার মাথায় এল?' উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- সেই ১৯৪৭ সালে আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও তাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কি না করতে পারত! তারা জগৎ জয় করতে পারত। They could conquer the world. বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোন উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল। তাই বাংলাদেশ বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। একদিন আসে, যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিগ্যেস করি, আমাদের দেশের নাম কি হবে? কেউ বলে পাক

---

[৭] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫), ৪৬-৪৮।

বাংলা। কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি শ্লোগান দিই জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রুপ করে বলে, জয় বাংলা নয়, জয় মা কালী। কী অপমান! সে অপমান আমি সেদিন হজম করি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয়। যা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।" গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি, ঊনষোত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ি মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে ভাষা ভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।[৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতির প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শেখ মুজিবের ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো আপোষ করেননি। এর জন্য সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন। শামছুল কবির লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলনের সূত্রেই মূলত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদে পরিনত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জনমানসে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ উপ্ত হয় তা ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সাথে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ ঘটায়। আর তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্য হওয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্য কাজ করা সহজ হয়ে যায়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ১৯৬২ সালে এক আলোচনা সভায় প্রথমবারের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন- ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলনের প্রোগ্রামে ওই দাবি রাখতে হব।"[৯]

বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগ করেছিলেন বাংলা মায়ের অসংখ্য কৃতি সন্তান। পুলিশের জেল-জুলুম-লাঠি উপেক্ষা করে মাতৃ ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তারা। অন্যভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ছিল এইখানে যে তিনি ভাষা আন্দোলনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে একটি ভাষা ভিত্তিক জাতি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য সহায়ক পরিবেশ রচনা করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর মুসলিম সমাজে পাকিস্তান আন্দোলন প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি মুসলিম লীগের সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে

---

[৮] মুনতাসীর মামুন, *ছয় দফা স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু।* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), ১০।

[৯] শামছুল কবির, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা," Jagannath University Journal of Arts 9, No.1 (January -June 2019): ৫৭।

সভা সমিতি করতে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, "শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই কারণে যে তিনি মনে করতেন পাকিস্তান সৃষ্টি হলে হতদরিদ্র, নীপিড়ীত ও শোষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তলাভ করবে। এইজন্য তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্মঠ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে দল সংগঠনের কাজে তাঁর বেশি উৎসাহ ছিল। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে যখন তিনি কলকাতায় ছাত্র ছিলেন তখন আবুল হাশিম সাহেব, মওলানা আজাদ সোবহানী, তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ছাত্রদের ক্লাস নেবার জন্য। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তাঁর আলোচনা শুনতেন। আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর। কিছু সময় যোগদান করেই ভাগতাম। আমি আমার বন্ধুদের বলতাম, "তোমরা পন্ডিত হও আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আনতে দাও , তারপর বসে বসে আলোচনা করা যাবে। "বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল আবেগ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে যা সত্য বলে মনে করতেন, তার থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারতেন না। তিনি জীবনে কখনো আপোষ করেননি। পালিয়ে যাওয়া রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। জীবনের বড় একটা সময় তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য কখনো তাঁকে আত্মগোপন করতে দেখা যায়নি। কিছু কিছু সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান পুলিশের কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে গ্রেফতার বরন করেছেন।[১০]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬আগষ্ট মহম্মদ আলি জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা দেখা দেয়। এই দাঙ্গা রোধ করার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন শেখ মুজিব। তিনি বহু মুসলমানকে যেমন দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, অনেক হিন্দু মানুষকেও সুরক্ষিত করেছেন শেখ মুজিব। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আন্দোলনকারীদের যেন কোন কলঙ্কের ছাপ না লাগে, বদনাম হয়না যেন মুসলিম লীগের। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সময় মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

পাকিস্তান আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গনভোটের সময়। সিলেট পাকিস্তানে যোগ দেবে না ভারতের সঙ্গে থাকবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গনভোট গ্রহণ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী বাছাই করা ৩০০ জন মুসলিম লীগ কর্মীকে সিলেটে পাঠান পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করার জন্য। এই কাজে শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই সিলেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে মতদান করে। সিলেট অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তানে। শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলে

---

[১০] ড. রওনক জাহান, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনৈতিক চিন্তাধারা," বাংলাদেশ, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, (এপ্রিল, ২০১৯): ৫-৭।

সিলেট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন নাও হতে পারত। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ বাগ্মিতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সহজেই হৃদয় জয় করে সিলেটের জনগণের।[১১]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সৈনিক। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁর মোহভঙ্গ হয়। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেন শেখ মুজিবুর রহমানের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন হলো ও ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় হলেন তার পর্যালোচনা করা দরকার। তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর বিভিন্ন প্রকার নীপিড়ন চালাত। এরমধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক বঞ্চনা।

প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পৃথক একাধিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম ও শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবকে এই ভাবেই দেখতেন। দ্বিজাতি তত্ত্বে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। তাঁরা চাইতেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষের সার্বিক মুক্তি ।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিবুর রহমান অভিযোগ করেছেন ধূর্ত সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্রকারী একদল মুসলিম লীগের নেতা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দূর্বল করার উদ্দেশ্যে ও পূর্ব বাংলায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করেছেন ১৯৪৬ সালে। এই বছরে শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লিতে মুসলিম লীগের কনভেনশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এই কনভেনশনেই তিনি ঠিক করেন পাকিস্তানের জন্য কাজ করবেন। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, "জিন্নাহ সাহেব বক্তৃতা করলেন, সমস্ত সভা নীরবে ও শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনল। মনে হচ্ছিল সকলের মনেই একই কথা, পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। তাঁর বক্তৃতার পর সাবজেক্ট কমিটি গঠন করা হল। আট তারিখে সাবজেক্ট কমিটির সভা হলো। প্রস্তাব লেখা হলো, সেই প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব থেকে আপাত দৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক একটা রদবদল হলো। একমাত্র হাশিম সাহেব আর সামান্য কয়েকজন যেখানে পূর্বে 'স্টেটস' লেখা ছিল সেখানে 'স্টেট' লেখা হয় তার প্রতিবাদ করলেন, তবুও তা পাস হয়ে গেল। ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব কাউন্সিল পাস করে সে প্রস্তাব আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে পরিবর্তন আনতে পারে কিনা এবং সেটি করার অধিকার আছে কিনা এটা চিন্তাবিদরা ভেবে দেখবেন। কাউন্সিলই মুসলিম লীগের সুপ্রিম ক্ষমতার মালিক। পরে আমাদের বলা হলো এটা কনভেনশনের প্রস্তাব। লাহোরে প্রস্তাবের পরিবর্তন করা হয় নাই। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ওই প্রস্তাব পেশ করতে জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাহ অনুরোধ করলেন। কারণ, তিনি বাংলার এবং তখন একমাত্র মুসলিম লীগ প্রতিনিধি।"[১২] বাংলার সঙ্গে এই

---

[১১] শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০২০): ১০৯-১১২।

[১২] Ritesh Karmaker, "Bangabandhu Kindling Language Movement." *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* 7 (July 31, 2021): 41-46.

বঞ্চনা শেখ মুজিবুর রহমান মেনে নিতে পারেনি। তিনি লক্ষ্য করেন যে আবুল হাশিম ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো প্রগতিশীল নেতাদের কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে একপ্রকার পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। শহীদ সাহেব ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রবল জনপ্রিয়তার অধিকারী একজন নেতা। এই অপমান ও বঞ্চনা শেখ মুজিবকে মর্মাহত করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পাকিস্তান সরকার বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আক্রমণ শুরু করলে বাংলায় বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এপ্রসঙ্গে মহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড়ো নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন।"[১৩] শেখ মুজিব এই সত্য উপলব্ধি করতে ভুল করেননি। তাই দেখা যায় ভাষা আন্দোলনের প্রথম থেকেই তিনি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং এই আন্দোলনকে তিলে তিলে বিকশিত করে জাতীয় আন্দোলনে উন্নিত করেন।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে জোড়ালো কোন যুক্তি ছিল না। এবিষয়ে তাদের যুক্তি ছিল বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তাই পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থে উর্দুকে সাধারণ রাষ্ট্রভাষা করা প্রয়োজন। পূর্ব বাংলার ছাত্র-যুবক-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা এই যুক্তি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে, এর মাধ্যমে পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসররা পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর শাসন, দমন-পীড়ন বজায় রাখার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের নামে এই ভাওতাবাজি রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে। পাকিস্তানের শাসকবর্গের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি যে ছিল তা এই পরিসংখ্যানটির সাহায্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬. ৪০ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলত ২৮.৫৫ শতাংশ মানুষ। পুলতো ভাষার জনসংখ্যা ছিল ৩.৪৮ শতাংশ। সিন্ধি ভাষায় কথা বলত ৫.৪৭ শতাংশ জনগণ। উর্দু ভাষার জনসংখ্যা ছিল ৩.২৭ শতাংশ। বেলুচি ভাষায় কথা বলতেন ১.২৯ শতাংশ মানুষ। ইংরেজি ভাষার জনসংখ্যা ০.০৩ শতাংশ। অন্যান্য ভাষায় কথা বলতেন ১.৫২ শতাংশ মানুষ। এই পরিসংখ্যান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা ছিল অগনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।

ভাষা আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাত্র ৩.২৭ শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল উর্দু। এই উর্দুকে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। প্রকৃতপ্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তারা পূর্ব বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করত। পূর্ব বাংলার মানুষের আশঙ্কা ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ যেটুকু আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে তা কেরে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তান

---

[১৩] মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮)।

আন্দোলনের একজন সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণে মর্মাহত হন এবং ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করার সক্রিয় উদ্যোগ নেন।[১৪]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূজারী। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তার রাজনৈতিক চিন্তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সারা জীবন তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এই ভেবে যে এর মাধ্যমে বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা দেয় তাতে বিচলিত হন তিনি। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে পূর্ব বাংলায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শহীদ সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেন, "তোমরা একটা কাজ কর দেশে গিয়ে, সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না হয়, তার চেষ্টা কর। পূর্ব বাংলায় গোলমাল হলে আর উপায় থাকবে না। চেষ্টা করো যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমাল করবে, তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ব বাংলায় ছুটবে। যদি পশ্চিম বাংলা, আসাম ও বিহারের মুসলমান একবার পূর্ব বাংলার দিকে রওয়ানা হয়, তবে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব বাংলা রক্ষা করা কষ্টকর হবে। এত লোকের জায়গাটা তোমরা কোথায় দিবা আমার তো জানা আছে। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই দাঙ্গা হতে দিও না।"[১৫]

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। খুব সহজভাবে বলা যায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানের মনে যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করেছিলেন তাকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করতে ভাষা আন্দোলনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দূর্বল করতে চেয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীতে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুসংবদ্ধ করাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার মরিয়া প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে বাঙালি শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা উর্দুওয়ালাদের এই স্বৈরাচারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুবকদের ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা এবং বাঙালি ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমের চেতনায় শানিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৪জানুয়ারি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও স্বাক্ষরে পূর্ব

---

[১৪] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫), ১০৫-১০৭।

[১৫] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ৮২।

পাকিস্তান ছাত্রলীগের নামে ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। এই লিফলেট সম্পর্কে তৎকালীন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে,"I have the honour to report the particulars of the members of the Provisional Organizing Committee of East Pakistan Muslim Students League as follow. They were the signatories the leaflet which advocated Bengali to be the State Language for Pakistan. গোয়েন্দা সংস্থার এই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়,"... Sheikh Mujibur Rahman, who was one of the signatories of the leaflet which advocated Bengali to be the Students League of Pakistan.[১৬]

নবগঠিত মুসলিম লীগ পাকিস্তান সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন কাজকর্মে উর্দু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন।যেমন- ডাক টিকিট, মানি অর্ডার ফর্ম, মুদ্রা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সেনা বিভাগ, নৌ বিভাগ ও বিমান বিভাগের পরীক্ষায় উর্দুর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনুল্লেখ। রেডিও পাকিস্তানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উর্দু ভাষার ব্যবহার শুরু হয়, পাশাপাশি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে জনমত সংগ্রহের প্রয়াস গ্রহণ করে সরকার। এক্ষেত্রে খাজা নাজিমুদ্দিন ও তার অনুগামীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়। সত্যি কথা বলতে খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন উর্দু ভাষি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল খুব সামান্য।[১৭]

ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ বিভাগের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী একদল ছাত্র নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাজী গোলাম মাহবুব, কাজী আহমেদ কামাল, জহিরুদ্দীন ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ যারা ১৫০ নং মোগল টলিতে রাজনৈতিকক্রিয়াকলাপ চালাতেন, তাদের উদ্যোগেই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলিম লীগই ছিল একমাত্র সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। বাংলায় তাদের প্রভাব ছিল আকাশচুম্বী। এই দল যেহেতু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিকরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছেন, এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উন্নিত করার জন্য একটা সুসংবদ্ধ নেতৃত্ব, সংগঠন, কর্মসূচি অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত ছাত্র নেতা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গড়ে তোলেন। এপ্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিমত বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেনঃ "তখন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ ।... আমরা ভাষার ওপর এ আঘাত সহ্য করতে পারলাম না, তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র লীগের জন্ম হয়।"[১৮] ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা অলি আহাদের বক্তব্য এক্ষেত্রে

---

[১৬] মুহম্মদ মনিরুল হক, "বাংলা ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু," News Bangla 24.com., ফেব্রুয়ারি, ২০২১, https://shorturl.at/baZkW।

[১৭] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৪।

[১৮] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৭৭।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেনঃ "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কায়েমের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যতই তীব্র হইতে লাগিল, অর্থপূর্ণ ও সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের অপরিহার্যতা ততই আমাদের কাছে বড় হইয়া দেখা দিল। সাংগঠনিক শক্তি ব্যতিরেকে বৃহত্তর জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলন কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না।"[১৯] ভাষা আন্দোলনে এই সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুগামীদের মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে প্রবল জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয় এই তরুণ ছাত্রনেতারা। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয় যে ভাষা আন্দোলনকে ক্রমবিকশিত করে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য ছাত্র লীগের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণ করার কোন শক্তি ছিল না। আর এই সংগঠনটির অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব এই সংগঠনকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উন্নিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গনপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গনপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখন্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গনপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলা ভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু , অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়। বিতর্কের পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাংলাকে গনপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ব বাংলায় গন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গনপরিষদে দেওয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষনার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় ছাত্র শিক্ষক সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবি শ্রেনি এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকার ছাত্রগন ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলা ভাষার সমর্থনে স্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকায় মিছিল করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শেষ হলে সেখানে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তমুদ্দিন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন- পাকিস্তান গনপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন তা কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাঙলা ভাষাভাষীদের দাবি এই যে উর্দুর

---

[১৯] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪০-৪১।

পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে। বাংলা ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে ২মার্চ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। নবগঠিত এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে এটাই ছিল প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম গ্রেফতার।

১১ই মার্চের ধর্মঘট সফল করতে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, দৌলতপুর, যশোরের মতো কয়েকটি স্থানে জনসভা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ, ১১ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের দিন আন্দোলনের রনকৌশল স্থির করার জন্য রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আপসকামীরা আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। তারা সরকারের সাথে আপোষ রফায় যেতে চায়। এর তীব্র প্রতিবাদ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে গাজিউল হক লিখেছেন, "ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১১ মার্চে (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১১ মার্চে রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি সভা বসল। সভায় আপসকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপোস করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল, সরকার কি আপোস প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। এই বজ্রকণ্ঠ ছিল শেখ মুজিবের। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলির শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপসকামীদের ষড়যন্ত্র ভেসে গেল।"[২০] এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সৈনিক অলি আহাদের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন, তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না।"[২১]

১১ মার্চ সকাল থেকে সেক্রেটারিয়েটের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশি ছাত্রদের উপর পেশি শক্তি প্রয়োগে তৎপর হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এই আন্দোলন দুর্বল করার জন্য পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায়। ব্যবহার করে কাঁদানি গ্যাস। ৪৯ জন ছাত্র জখম হন। গ্রেফতার করা হয় ৬৯ জন ছাত্রকে। কিছু ছাত্রকে ধরে নিয়ে অন্যত্র রেখে আসে নাজিমুদ্দিন প্রশাসন। শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পুলিশের নিক্ষেপ করা কাঁদানি গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সুস্থ হলে তিনি গ্রেফতার হন। এই আন্দোলন নাজিমুদ্দিন সরকারকে ভিত সন্ত্রস্ত করে। কঠোর দমননীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়নি।

ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে জেলে আটক ছাত্রদের উপর দমন পীড়ন চালানোর জন্য এক নতুন পরিকল্পনার ছক কষে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার। জেলে আসামি গননাকে কেন্দ্র করে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারের অভিপ্রায় ছিল শুরুতেই বলপ্রয়োগ ও ভিতি প্রদর্শনের

---

[২০] মাযহারুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। (ঢাকাঃ বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০২২): ২৪-২৫।

[২১] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৪।

মাধ্যমে আন্দোলনকে দূর্বল করা। তাদের এই ইচ্ছা সফল হয়নি, ঘটেছে উল্টোটা। শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে শেখ মুজিবের কোন অসুবিধা হয়নি। দূরদর্শি শেখ মুজিব অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। জেলে বন্দি ছাত্রদের উপর প্রশাসনের বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এই কাজে তাকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন সামসুল হক ও আব্দুল মান্নান। শেখ মুজিব উল্লেখ করেছেন তিনি, সামসুল হক ও আব্দুল মান্নান আন্দোলনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, জেলে থাকাকালীন জমাদারের ইচ্ছে ছিল দরজা খুলে সিপাহিদের নিয়ে ভিতরে ঢুকে আমাদের মারপিট করবে। জেলার, ডেপুটি জেলার বা সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ভিতরে আসবার পূর্বেই আমরা বুঝতে পেরে সকলকে তাড়াতাড়ি যার যার জায়গায় বসতে বলে সামসুল হক সাহেব ও আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের না মেরে ভিতরে যেন কেউ না আসতে পারে এই উদ্দেশ্যে। এ কথাও সকলকে বলে দিলাম যে, আমরা মার না খাওয়া পর্যন্ত কেউ হাত তুলবে না। যদি আমাদের আক্রমণ করে এবং মারপিট করে তখন টেবিল, চেয়ার, থালা, বাটি যা আছে তাই দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।[২২]

আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকলে নাজিমউদ্দীনের সরকার ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। উভয় পক্ষ মিলে একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবসহ বিশিষ্ট ছাত্র নেতারা ১১ মার্চ থেকে ছিলেন কারাগারে। ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুমতি ব্যতীত কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে অলি আহাদ বলেছেন- 'চুক্তিপত্রটি ১১ মার্চ ধৃত বন্দীগণ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ও জনাব কমরুদ্দীন আহমদ কারান্তরালে আমাদের সহিত বৈঠকে মিলিত হলেন। জনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও আমি (অলি আহাদ) বন্দীগণের পক্ষ থেকে খসরা চুক্তির শর্তাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমোদন করলাম।'[২৩]

কারারুদ্ধ শেখ মুজিব, শামসুল হক ও অলি আহাদ রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে যে পত্রের খসড়াটি অনুমোদন করেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে।
২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।
৩. ১৯৪৮- এর প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যে দিন নির্বাচিত হয়েছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং তাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।
৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে, প্রদেশের ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়ে দেওয়া স্বীকৃত হবে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজ গুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হবে।

---

[২২] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ৯৫।

[২৩] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৬।

৫. আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।
৬. সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।
৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে সেখান থেকে তা প্রত্যাহার করতে হবে।
৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।[২৪]

আট দফার চুক্তিপত্রটি সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের কতগুলো দিক লক্ষনীয়। চুক্তিতে বাংলা ভাষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের অপপ্রচার ইত্যাদি বিষয় গুলো পরিষ্কার হয়। যদিও চুক্তিতে নাজিমুদ্দীন স্বাক্ষর করেছিলেন তবু বাংলা ভাষা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিবর্তিত হয়নি চুক্তি পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা স্পষ্ট। তবে চুক্তি মোতাবেক ১৫ মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

দূরদর্শি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব নাজিমুদ্দীন সরকারের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ও চতুরতা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এই আট দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। তাই দেখা যায় কারামুক্ত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার প্রয়াস চালান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পুকুর ধারে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে গাজিউল হক মন্তব্য করেছেন, "পুলিশী জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ছাত্র জনতার যে সমাবেশ কর্মসূচি ছিল , সেটি শুধুমাত্র প্রতিবাদ সমাবেশ হিসেবে শেষ হতে পারত। কিন্তু সমাবেশের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে সমাবেশ সংক্ষিপ্ত হয় এবং অ্যাসেম্বলি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন আরও এগিয়ে যায়।"[২৫]শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত একজন সৈনিক তাজউদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "১৬ মার্চ '৪৮ মঙ্গলবার, ... বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা দেড়টায় সভা শুরু হলো। মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করলেন। সংশোধনীগুলি গৃহীত হলো এবং অলি আহাদের মাধ্যমে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হল। যদিও সংগ্রাম কমিটির কোনো কর্মসূচি ছিল না, তবু অ্যাসেম্বলি হাউস অভিমুখে ছাত্রদের একটা বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হলো এবং সরকারি দলের এম.এল.এ-দের নিন্দা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করল। অনুরোধ সত্ত্বেও ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করা গেল না।"[২৬] ভাষা আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা অলি আহাদ বলেছেন, "আন্দোলনে যাহাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি হতে না পারে, সেই জন্য আমরা ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় পুলিশী জুলুম তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন, চুক্তিনামার ৩ ও ৪ ধারা কার্যকর করিবার জন্য আইন পরিষদ অধিবেশনে নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য ও পাকিস্তান গনপরিষদ সদস্যবর্গের ও পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীসভার

---

[২৪] মাযহারুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। (ঢাকাঃ বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০২২): ১৭।

[২৫] গাজীউল হক, "ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভুমিকা" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। পৃঃ২৫।

[২৬] সিমিন হোসেন রিমি, তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী ১৯৪৭-১৯৪৮। (ঢাকাঃ প্রতিভাস, ১৯৯৯): ১৮০।

পদত্যাগ দাবি জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।... পরিষদ ভবন গেটে আমরা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থান পরিত্যাগ করিতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া পুলিশ বাহিনী হিংস্রমূর্তি ধারণ করে ও আমাদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করিয়া দেয় ... মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া কিছু অংশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের মধ্যেবর্তী মাঠে জমায়েত হয় ।"[২৭] ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শি নেতৃত্ব ১৯৬৬ সালে তাঁকে জাতীয় রাজনৈতিক নেতার শিরোপা এনে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে। ভাষা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁকে প্রবল জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা নাজিমুদ্দীন সরকারের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করার পরও এই আন্দোলন দূর্বল করতে পারলো না। দিশেহারা সরকার এক নতুন পন্থা অবলম্বন করল। সমগ্র পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলায় তখনো মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন একজন প্রবল জনপ্রিয় নেতা। তাঁর প্রতি মানুষ প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রদর্শন করত। মহম্মদ আলি জিন্নাকেই শাসকগোষ্ঠী রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। বাংলার ছাত্র-যুবকদের মধ্যে জিন্নার আগমনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। বাংলার ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবি সমাজ মনে করেন যে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে সংকট তৈরি হয়েছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান মহম্মদ আলি জিন্না প্রদান করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটলো উল্টোটা। মহম্মদ আলি জিন্নার বক্তব্য পূর্ব বাংলার জনগণকে হতাশ করে। ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে একটি জনসভায় মহম্মদ আলি জিন্না স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সভায় উপস্থিত একাংশের জনতা মহম্মদ আলি জিন্নার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। নো,নো আওয়াজ তোলা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিবাদে সামিল হন। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি আবার ঘোষণা করেন পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থে উর্দুকেই করা হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়। তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনীত হয় এই সভায়। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবসহ কয়েকশো ছাত্র এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। মহম্মদ আলি জিন্না ছাত্রদের এই আচরণে বিস্মৃত হন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মহম্মদ আলি জিন্নার সামনে কখনো এই রকম কোনো প্রতিবাদ প্রর্দশিত হয়নি। এরপর যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন কখনোই শোনা যায়নি তাঁর মুখে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা। আন্দোলনকারী ছাত্ররা তাঁকে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর প্রয়াস গ্রহণ করেও ব্যর্থ হন। এপ্রসঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার একগুঁয়েমি মনোভাব হতাশ করে বাংলার ছাত্র সমাজকে। তবে এটা স্বীকার করতেই হয় জিন্নার আগমনের পর ভাষা আন্দোলন সাময়িক ভাবে শিথিল হয়ে পড়ে।[২৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে ভাষা আন্দোলনকে মুক্তি আন্দোলনে ব্যবহার করেছিলেন, সেটি পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। এটি পর্যালোচনা করতে গেলে ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ও নেতৃত্বদান সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনকে দুটি ভাগে

---

[২৭] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৭।

[২৮] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫), ১০৮-১০৯।

ভাগ করা যায়। ১৯৪৮ সালকে ভাষা আন্দোলনের সূচনাকাল ধরা হয়। এই পর্বে শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সাল ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব হিসেবে চিহ্নিত। এই চূড়ান্ত পর্বে শেখ মুজিব ছিলেন কারারুদ্ধ। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও কারারুদ্ধ মুজিব হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। আন্দোলনকারীরা তীব্র সংকটময় পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের সুযোগ্য নেতৃত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করছিলেন। পাশাপাশি দূরদর্শি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিব যদি প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন তাহলে ভাষা আন্দোলন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে পারত। দূর্ভাগ্যের হলেও এটা সত্য শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভাষা আন্দোলনের দিনে তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে। ১৯৫২ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তিনি আরো বলেন পরীক্ষামূলক একুশটি কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ও জনগণ স্বীয় উদ্যোগে নতুন কেন্দ্র খুলছে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে আটদফা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাকে জলাঞ্জলী দিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের এই ঘোষণার ফলে পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য খাজা নাজিমুদ্দিন যে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভাষা আন্দোলনকে দূর্বল করতে ওই আটদফা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন দূরদর্শি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। খাজা নাজিমুদ্দীনের এই জনবিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এই ধর্মঘটকে সাফল্য মন্ডিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে আন্দোলনকারীরা। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রার ডাক দেয়। হাজার হাজার ছাত্র এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের যুবলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোস্তফা রওশন আখতারের প্রস্তাবে যুবলীগ নেতা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২১ শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও একটি বিশাল মিছিল রাজপথ পরিক্রমা করে। ২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় সভা সমিতি ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রশাসন হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠলে আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়।[২৯]

---

[২৯] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ১২৬-১৩২।

ভাষা আন্দোলনে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫২ সালে শেখ মুজিব জাতীয় নেতায় পরিণত হননি। তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতিও খুব বেশি ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালিদের ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেখ মুজিবের প্রথম গ্রেফতার। ভাষা আন্দোলন, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের আপসহীন সংগ্রাম, ১৯৬৬ ও তার পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য রাজনৈতিক চরিত্রে পরিনত করে তোলে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক নেতা। সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে মাসুদুল হকের উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করে শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে সেই বাঙালি জাতীয়তিবাদী চেতনাকে চূড়ান্ত শীর্ষে উপনীত করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন ....।"[৩০] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ আত্মসচেতন বাঙালিদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শেখ মুজিবের পক্ষে কারাগারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমান জেলের ভিতরে থেকে যেভাবে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করতে প্রয়াস চালিয়েছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন দূরদর্শি রাজনীতিবিদের কাছে জাতি এমনটাই আশা করে। ভাষা পাগল বাঙালিরা যখন ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকা জেলে বন্দি। ভাষা আন্দোলনের নেতা মহিউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী, ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তিনি ও শেখ মুজিবুর রহমান দূজনে যুক্তি করলেন যে মুজিব অসুস্থতার ভান করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবেন। ডাক্তারের সাহায্যে শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। শেখ মুজিবের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা। তিনি চিরকুটের সাহায্যে আন্দোলনকারীদের কাছে নির্দেশ পাঠাতেন।

১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমেদ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দুই নেতা মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে জেলের মধ্যেই আমরন অনশন শুরু করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়। শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্ত আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন উদ্যমের সূচনা করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমেদকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়। নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তাদের সাথে দেখা হয় শামসুদ্দোহাসহ কয়েকজন ছাত্র নেতার। শেখ মুজিব অনুরোধ করে গেলেন যেন ২১ ফেব্রুয়ারিতে হরতাল মিছিলের শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন শেখ মুজিবের অনশন শুরু ও অনশন ভাঙার তারিখ নিয়ে লেখকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে শেখ মুজিব যে জেলের অভ্যন্তরে আমরন অনশন শুরু করেছিলেন এ বিষয়ে লেখকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে বঙ্গ আইনসভার সদস্য আনোয়ারা খাতুন শেখ মুজিবের অনশনের বিষয়টি মুলতবি প্রস্তাব হিসেবে

---

[৩০] মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০): ৩৪।

উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যদিও এই প্রস্তাবটি সরকার পক্ষ গুরুত্বহীন বলে মনে করলেও বাঙলার জনগণ ও ভাষা পাগল ছাত্র যুবকদের মধ্যে আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করে।[৩১]

আন্দোলনের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে ভীত সন্ত্রস্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকার ২০ তারিখ বিকালের দিকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করার ঘোষণা করেন। পাকিস্তান রেডিওতে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়। বলা হয় একমাস ঢাকায় কোনো সভা, সমিতি, মিটিং মিছিল করা যাবে না। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কিনা, এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সভায় অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো দাবি জানান। এখানেও আপোষকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আপোষকামীরা এই রকমই ষড়যন্ত্র করেছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের আন্দোলনের ক্ষেত্রে। সেইদিন এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ঠিক হয় ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না। আপোষমুখীদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলো বাঙলা মায়ের দামাল ছেলেরা।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ভাষা পাগল ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমা হতে থাকে। দলবদ্ধহয়ে স্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম.এল.এ. ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে গিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকেন। পুলিশ এসময় বেপরোয়া ভাবে ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালায় । ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল ও অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জ। পুলিশ ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই রফিকউদ্দিন আহমদ, আব্দুল জব্বার শহীদ ও প্রায় ১৭ জন গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে আনা হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম আবুল বরকত রাতে অপারেশন টেবিলে মারা যান।

গুলি চালানোর সাথে সাথেই পরিস্থিতি অচিন্তনীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৪৪ ধারার নাম নিশানাও তখন আর দেখা যায় না। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সচিবালয় ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেড়িয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে।

বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেও এসে লাগে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নূরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর কৈফিয়ৎ দাবি করেন এবং পরিষদ মুলতবি রাখার দাবি জানান। নূরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন- "কয়েকজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদের ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।" পরিষদ কক্ষেই এমন জঘণ্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠল। লীগ পরিষদ দলের সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ বলে উঠলেন- "যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবি নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত, তখন আমরা

---

[৩১] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১)।

আরামে পাখার নীচে বসে হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না"- এই বলে তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।[৩২]

২২ ফেব্রুয়ারি শোক মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। আন্দোলন তীব্রতর হয়। ঢাকা শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে ধর্মঘটের চেহারা নেয়। শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। উত্তেজিত জনতা মর্নিং নিউজের অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। আন্দোলন দমন করতে সরকার এইদিন কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। অনেকেই আহত হন। রিকশা চালক আব্দুল আউয়াল শহীদ হন। আব্দুল আউয়ালের এই মৃত্যু প্রমাণ করে ভাষা আন্দোলন শুধু ছাত্র যুবক ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলন গন আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ঢাকা শহর অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জের রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারি দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ও শহীদদের স্মরণে ২৩শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্ররা শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। দ্রুত এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ এই শহীদ মিনার দর্শনের জন্য ভিড় করতে থাকেন। এই শহীদ মিনার তীর্থস্থানে পরিনত হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই শহীদ মিনারটি জনগণের দেখার কোনো বিষয় ছিল না। প্রকৃতপ্রস্তাবে শহীদ মিনারটি ছিল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই শহীদ মিনারটি পুলিশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলে ঢুকে ছাত্রদের উপর পুলিশ নারকীয় অত্যাচার চালায়। কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেও ভাষা আন্দোলন দমন করা যায়নি। এই আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ভিত নাড়িয়ে দেয়। আন্দোলনের চাপে বাংলার আইনসভা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য গনপরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে।[৩৩]

১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত হওয়ার পর শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে জোরদার প্রয়াস গ্রহণ করেন। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় শেখ মুজিব ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৫২ সালের চীন সফর শেখ মুজিবের বাংলা ভাষার প্রতি এক গভীর প্রেমের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বছরে তিনি চিনা শান্তি কমিটির আহ্বানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। শেখ মুজিব ওই শান্তি সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করেন যে প্রায় সমস্ত বক্তা তাদের মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখেন। নিজ মাতৃভাষার প্রতি প্রত্যেক বক্তার এই গভীর প্রেম শেখ মুজিবকে ব্যাপকভাবে আকর্ষিত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা বক্তব্য রাখার সময় মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজি ও উর্দুতে বক্তব্য রাখতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাই। না পারলেও বারবার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। চীনারা এরকম নয়। তারা নিজেদের মাতৃভাষাকে সম্মান করে। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করার

---

[৩২] বশির আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসঃ কয়েকটি দলিল। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫): ৪৫৫।

[৩৩] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ৯০-৯২।

উদ্দেশ্যে এই সভায় বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তিনি লিখেছেন, "আর আমার বক্তৃতা দেওয়া ছিল এই জন্য যে, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেব।"[৩৪]

মূলত মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে ছিল সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ভাওতাবাজি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি পূর্ব বাংলার জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িকতার স্থলে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শের। শেখ মুজিব ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। ভাষা আন্দোলন সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায় শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করেন। এই দুটি সংগঠন থেকে তিনি মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠন দুটিকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র প্রদান করেন এবং সংগঠন দুটির নামকরণ করেন- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ। এই সংগঠন দুটিতে প্রতিষ্ঠালগ্নে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেখ মুজিব মুসলিম শব্দ যুক্ত করতে বাধ্য হন। কারণ, সেই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগনের মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। এছাড়াও মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে কোন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলে তাদের ভারতের চর ও পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।

১৯৫৫ সালে সরকার পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব। তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পূর্ব বাংলায় যে ভাষা আন্দোলন দেখা দিয়েছে সেই ভাষা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান না হলে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের গনপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, "Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of it's own. You can change it only after the the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them wheather they accept it. So far as the question of One Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite."[৩৫]

---

[৩৪] শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন। (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২০): ৪১-৪৪।

[৩৫] শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন। (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২০): ১৩১।

বাঙালিদের ভাবাবেগ, অনুভূতি পদদলিত করে পাক সরকার ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করে পূর্ব পাকিস্তান। এই ঘটনায় মর্মাহত হন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি দূঃখের সাথে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের মানচিত্র থেকে বাংলার ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি অদৃশ্য করার প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, বঙ্গোপসাগর ছাড়া আমাদের পরিচিতির আর কিছুই রইল না। পাক সরকার বাঙালিদের প্রতি যত বেশি বৈষম্য ও দমন পীড়নের নীতি গ্রহণ করেছে শেখ মুজিবের ভাষা ভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াস তত বেশি জোরদার হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এই বেপরোয়া মনোভাবের জন্য পাকিস্তানকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ১৯৭১ সালে।[৩৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গনপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের শুরুতেই একটি মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, "I beg to move That the house be adjourned today, the 21st February, in the memory of the martyrs who laid down their lives to the cause of getting Bengali as State Language."[৩৭] স্পিকার এই প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শেখ মুজিব।

তীব্র আন্দোলনের চাপে সরকার সংসদের দৈনন্দিন কার্যবিধি ২৯-এর অধীনে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষাকে সংসদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্য করেন যে সংসদের দৈনন্দিন আলোচ্য কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দৈনন্দিন আলোচ্য কর্মসূচি লেখা হচ্ছে উর্দু ও ইংরেজিতে অথচ বাংলাকে সংসদের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পরেও বাংলা ভাষায় সংসদের দৈনন্দিন কর্মসূচি লেখা হচ্ছে না। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে গনপরিষদে সরব হন। বঙ্গবন্ধু বলেন, একটি বিশেষাধিকার প্রশ্নে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহোদয়, পাকিস্তান গনপরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৯-এর অধীনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসদের সরকারি ভাষা হচ্ছে তিনটিঃ ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু। কিন্তু মহোদয়, আপনি জানেন যে দিনের আলোচ্য কর্মসূচি কেবল ইংরেজি ও উর্দুতে বিতরণ করা হয়, বাংলায় করা হয় না। আমি জানি না বিষয়টি আপনি অবগত আছেন কি নাই, কিংবা এটি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছে কিনা। কিন্তু মহোদয়, আমি জানতে চাই সংসদের অফিস থেকে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, কেন এই কাজ করা হচ্ছে এবং কেনই বা বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষাধিকার প্রশ্নে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের কারণ আমার এইটি।...

বিধি ২৯- এর পাঠ নিম্নরূপঃ

"(১) সদস্যগন সংসদে উর্দু, বাংলা অথবা ইংরেজিতে ভাষনদান করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে চেয়ারম্যান এই সমস্ত ভাষায় নিজেদের পর্যাপ্তরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন না এরূপ যে কোন সদস্যকে তাঁহার মাতৃভাষায় সংসদে ভাষন দানের অনুমতিদান করিতে পারিবেন।

---

[৩৬] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৯।

[৩৭] সরকার, মোনায়েম এবং অন্যান্য, *বাঙালির কণ্ঠ।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১৯): ১০৬।

যদি কোন সদস্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, উর্দু বা বাংলা ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার ভাষার ইংরেজি অনুবাদ সংসদে পাঠ করা হউক তাহা হইলে তিনি চেয়ারম্যানের নিকট ইহার একটি কপি সরবরাহ করিবেন যাহা তিনি (চেয়ারম্যান) তাঁহার মর্জিমাফিক সংসদে পাঠ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) সংসদের কার্যবিবরণীর দাপ্তরিক রেকর্ড উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রক্ষা করিতে হইবে।"

এই বিষয়েই আমি বিশেষাধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছি।...

কার্যবিবরণী নিশ্চই বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেহেতু তিনটি ভাষাই সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত সেহেতু তিনটি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। যদি দিনের আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা অবশ্যই বাংলাতেও করতে হবে, কেননা দিনের আলোচ্য কর্মসূচি কার্যবিবরণীরই অংশ বিশেষ।...

আমি জানতে চাই যে, দিনের আলোচ্য কর্মসূচি অফিসিয়াল রেকর্ড কি না। সংসদের দপ্তর থেকে এই কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধি ২৯(২)-এ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে যে সংসদের কার্য বিবরণী উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ কি না সেইটি বিবেচ্য বিষয়। মহোদয়, আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি হল অফিসিয়াল রেকর্ড, কারণ এটি সংসদের অফিস থেকে সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। দিনের আলোচ্য কর্মসূচি যদি দুটো ভাষায় তথা ইংরেজি ও উর্দুতে বিতরণ করা হয় তাহলে বাংলাতে নয় কেন? দিনের আলোচ্য কর্মসূচি এ যাবত ইংরেজিতে বিতরণ করা হতো। কিন্তু এখন যেহেতু তা ইংরেজি ও উর্দুতে করা হচ্ছে, তাহলে বাংলাকে বাদ দেওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমরা জানতে চাই এটি কে করেছেন? এটা কি আপনার আদেশে করা হয়েছে, না কি কোন কর্মকর্তা তা করেছেন? আমি বলতে চাইনা যে এটা উদ্দেশ্যে প্রনোদিত ভাবে করা হয়েছে। আপনি ডেপুটি স্পিকার এবং আপনার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। কিন্তু আমি বলতে চাই যে আমাদের ব্যাখ্যা হলো এটা অফিসিয়াল রেকর্ডের অংশবিশেষ। এবং যেহেতু দিনের আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু তা বাংলাতেও করা উচিত ছিল। কঠোর যুক্তিদ্বারা নির্মিত বঙ্গবন্ধুর এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস গনপরিষদের কোন সদস্যের ছিল না।

১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পাকিস্তানের গনপরিষদে উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটির সপক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গনপরিষদে যে বক্তব্য রাখেন তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বক্তব্য গনপরিষদের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক আলোরণ সৃষ্টি করে। গনপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে আমি খোদ খসড়া শাসনতন্ত্রের ধারার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এতে বলা হয়েছেঃ "একটি জাতীয় ভাষার (National Language) উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দায়িত্ব হইবে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের।"

অন্যত্র আবার বলা হয়েছেঃ

"পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সরকারি ভাষা (official language) হইবে উর্দু ও বাংলা।"

কিন্তু মহোদয়, আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বিবেচনাধীন বর্তমান ধারায় তারা বলছেন যে একটি জাতীয় ভাষার উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করবেন। আমি আপনার দৃষ্টি "একটি জাতীয় ভাষা" এই শব্দনিচয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবো। এবং মহোদয় এটা কিন্তু ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। মহোদয়, যেদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা যান এবং তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে সরকারি ভাষা (Official Language) এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা (State Language)। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজি সরকারি ভাষাও ছিল আবার আমরা বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করতাম। পূর্ব বাংলায় আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রভাষাকে বুঝাই না।...

সে যাই হোক, মহোদয়,"সরকারি ভাষা" এই শব্দ যুগল ব্যবহারের পেছনে কোনো দূরভিসন্ধি ছিল। যদি কোনোরকম দূরভিসন্ধি নাও থাকে এবং তা যদি ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও দেখা যায় যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে, উর্দু ও বাংলা হবে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা এবং খসড়া শাসনতন্ত্রে ঐ মর্মে বিধানও রাখা হয়েছিল।

কোনো রকম সুযোগ গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু তাই যদি আপনার মনোভাব হয় তাহলে আমি বলবো, হ্যাঁ আমি এর সুযোগ নিতে চাই। আপনি ১৯৪৮ সালে যখন পূর্ব বাংলার মন্ত্রী ছিলেন এবং যখন আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করেছিলাম তখন আপনি আপনার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে লাঠিচার্জ করতে এবং এই জন্য এই প্রশ্নের ব্যাপারে আমার অনুভূতি কি আমি তা জানি, কারণ আপনার পুলিশ আমাকে লাঠিপেটা করেছিল এবং আমাকে জেলেও পাঠানো হয়েছিল।...

আমি চেয়ারম্যানের মাধ্যমেই মাননীয় সদস্যকে সম্বোধন করে বলছি। তিনিও হাউসের অন্যতম সদস্য। আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টিতেও বিষয়টি আনতে চাই এবং যুক্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে তা বোঝাতে চাই যাতে করে তাঁরা আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।...

আল্লাহতা'লাই জানেন কখন আবার ঐ আরেকটা ধারা হাউসে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং আগামীকাল এ মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হতে পারে যে এটি রাষ্ট্রভাষা নয়। আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা রাখতে হবে এবং সেই কারণে আমি আমার সংশোধনীতে উল্লেখ করেছি যে, "দুটি রাষ্ট্রভাষা, যথা, বাংলা ও উর্দুর উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব হবে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের।" এই দুই রাষ্ট্রভাষার উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের অবশ্যই অবিলম্বে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মহোদয়, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা এবং আপনি যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আমি এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতেও প্রস্তুত। মহোদয়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, ভাওয়ালপুর ইত্যাদি নিয়ে তৎকালীন গঠিত এলাকায় উর্দু ছিল শিক্ষার মাধ্যম। পূর্ব বাংলায় একমাত্র বাংলা ভাষাতেই জনগণ কথা বলে। অথচ এই পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা দেখতে পাই উর্দু, সিন্ধী, পশতু ও পাঞ্জাবী ভাষাভাষী জনগণ। কিন্তু সেখানে যেখানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ রয়েছে তারা সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। তাই এসব কারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারি না বিতর্কটা কেন? তারা এর অবসান ঘটান না কেন? তাঁরা বিষয়টিকে নিয়ে এতো পেঁচানোর চেষ্টা করছেন কেন? তাঁদের কাজই হল সবকিছুকে পেঁচিয়ে ধোঁয়াটে করে তোলা এবং জনগনকে ধোঁকা দেওয়া। সব ব্যাপারেই তাঁদের রয়েছে দূরভিসন্ধি এবং সব কিছুতেই তাঁরা প্যাঁচ মারার চেষ্টা করেন যা তাঁরা বিগত এই

আট বছর ধরে করে আসছেন এবং আমার গরিব দেশকে ধোঁকা দিয়ে আসছেন। মহোদয়, এই ছিল আমার বক্তব্য বিষয়। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি তাই তাঁরা অবিলম্বে গ্রহণ করছেন না কেন? ...

তাঁরা যদি গনতন্ত্রে বিশ্বাসী হন এবং তাঁরা যদি আন্তরিক হন তাহলে তারা এটা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা গ্রহণ না করে পারবেন না। জনগণের এই দাবিকে তারা গ্রহণ করতে বাধ্য এবং এখন তাঁরা তাঁদের পিঠ বাঁচানোর জন্য বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছেন। তাঁরা এটা করতে বাধ্য কারণ, এর পেছনে রয়েছে জনগণের শক্তি। যদি তাঁরা তা না করেন তাহলে আল্লাহই জানেন তাঁদের পরিনতি কী হবে এবং এমন একটি সময় আসছে যখন তাদেরকে জনগণের প্রতিটি দাবি-দাওয়া মেনে নিতে হবে। এটি জনগনের দাবি, সকলের দাবি, আবালবৃদ্ধবনিতার দাবি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ এই সংশোধন চায় যে আজ থেকে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু হবে।[৩৮]

প্রবল ভাষা আন্দোলনের গতি রোধ করার ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। তাই দেখা যায় আন্দোলনের চাপে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পাক সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সর্বস্তরে এই ভাষা ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, "আমার দল ক্ষমতা দখলের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস, আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে। "১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনা করা হয়। এই সংবিধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের মাতৃভাষা বাংলার দাবি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে ও বাংলা ভাষা তার নিজের সত্ত্বাকে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত করার সুযোগ পায়।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর নবগঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন। এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রথম রাষ্ট্র নেতা যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায়। এই সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'মাননীয় সভাপতি, আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগিদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন'। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক নির্দেশিকায় বলেন যে বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয় যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলা ভাষার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন। পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরও বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও ব্যবহারের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য রাখার ঘটনাকে মাহবুব রেজা ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে, 'বিশ্বের বুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পেয়ে বাংলা ভাষাকে প্রথমবারের মতো মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ

---

[৩৮] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ১৬১-১৬৪।

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষাকে এক গৌরবের আসনে বসিয়ে দেন।"[৩৯]

ভাষা আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যবহার করেছিলেন সেটি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। জন্ম দেন অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দর্শন মুজিববাদের অন্যতম নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম সাংবিধানিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা যায় বাংলাদেশের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা হয় তার বীজ নীহিত ছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৭১ সালে মুক্তি আন্দোলনের সময় ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ প্রতিবেশী আর এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের স্বৈরাচারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দাঁড়ানোর সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাঙালিদের হৃদয় ও মনে। তিনি পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে সুগভীর ঐক্য অনুভূতির জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। বাঙালিরা অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শেখে। সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনের হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, আর শেখ মুজিবুর রহমানের মূল দাবি ছিল বাঙালি জাতির পৃথক রাষ্ট্র চাই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের এই উত্তাল তরঙ্গের ফলশ্রুতিতেই ১৯৭১ সালের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পৌঁছে যায় তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। এই বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্র নেতা যিনি ঔপনিবেশিক উত্তর কালে ভাষা ভিত্তিক একটি জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যত সংখ্যক বাঙালি বসবাস করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় সমসংখ্যক বাঙালি। পরিতাপের বিষয় এই সমস্ত বাঙালিদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র নেই, যেটা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে উপহার পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি পাগল বাঙালি। এই সমস্ত ঘটনাবলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলা যায় যে ভাষা আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

---

[৩৯] মাহবুব রেজা, "ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান।" সচিত্র বাংলাদেশ ৪০, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০২০): ১১।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে।

প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, আত্মত্যাগ ও দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দেওয়া হয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে। মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যে সমস্ত সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ছাত্র-যুবক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতি তত্ত্বকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক রণকৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যেই পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়। তবে এটা অনস্বীকার্য যে দ্বিজাতি তত্ত্ব পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগনের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। "স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস" গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে দেখিয়েছেন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষ মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই দুই লেখক তাঁদের গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ যদি শুধু দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আস্থাশীল থাকতেন তাহলে ১৯৭১ সালে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাঁদের শাসন-শোষণ ও দমন-পীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা সব সময়ই করে এসেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ ধর্মের নামে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ১৯৭১ সালে।[৪০]

পূর্ব বাংলার যে সমস্ত প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান কায়েমের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ড. রওনক জাহান উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন নির্যাতিত নিপীড়িত বাংলার মুসলমান জনগনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে যাবতীয় শোষণের হাত থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি ঘটবে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলনা। পাকিস্তান সৃষ্টি হল ১৯৪৬ সালের দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লিতে মুসলিম লীগের এই convention এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হচ্ছে। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র হবে, কিন্তু দিল্লি কনভেনশনের মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাবকে বাতিল করে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি

---

[৪০] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ৪০-৪৩।

অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। মহম্মদ আলি জিন্না একসময় মন্তব্য করেন, লাহোর প্রস্তাবে দুটি রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি ছিল আসলে ছাপার ভুল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লি কনভেনশন থেকেই উপলব্ধি করেন যে পূর্ব বাংলার মানুষের সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী স্বৈরাচারী এক অংশের মুসলিম লীগ নেতা গভীর ষড়যন্ত্রের ছক কষছে। অধ্যাপক রওনক জাহান লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই ভেবে যে এই নতুন রাষ্ট্রে দরিদ্র মুসলিম কৃষক, জমিদার শ্রেণির নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে। তিনি সব সময় স্বাধীনতার আন্দোলনকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হবার সংগ্রাম হিসেবে দেখেননি, তিনি এটাকে দেখেছেন নির্যাতিত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে। "পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসন শোষনের নগ্ন চেহারা দেখে মর্মাহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৪১]

উপমহাদেশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি বিচিত্রপূর্ন ও হঠকারী। বিশ্ব মানচিত্রে এইরকম রাষ্ট্রের জুড়ি মেলা ভার। রাষ্ট্রটির গঠনপ্রণালি পর্যালোচনা করে জাতীয় কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেছিলেন, পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই রাষ্ট্র ভেঙে পড়বে।[৪২] রাষ্ট্রটির ভৌগলিক অবস্থান ছিল এই রকম যার দুটি অংশ ছিল অন্য একটি রাষ্ট্র ভারতের দুই প্রান্তে। ভারতের পূর্বে ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান-বাংলাদেশ) ও পশ্চিম প্রান্তে ছিল পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান-পাকিস্তান)। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় দুহাজার কিলোমিটার, মাঝখানে ছিল ভারত। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল, সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হল ঠিক তার উলটো, সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল সেনাবাহিনীর সংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুন বেশি।[৪৩] পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক শাসন-শোষণ ব্যথিত করে বঙ্গবন্ধুকে। শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্য করেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার করা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"- তে বঙ্গবন্ধু লিখছেন, "পূর্ব বাংলার

---

৪১ ড. রওনক জাহান, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনৈতিক চিন্তাধারা।" বাংলাদেশ, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, (এপ্রিল, ২০১৯): ৬।

৪২ মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫)।

৪৩ Lieutenant General Nasim, A.S.M. *Bangladesh Fights for Independence.* Columbia Prokashani, (2002): 14-17.

সম্পদ কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায় একদল পশ্চিমা নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারীরা গোপনে সে কাজ করে চলেছিল। শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ যে আশা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোনো নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না।"[৪৪]

১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে ষড়যন্ত্রের সূচনা হয় তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈষম্য নীপিড়ন চালাতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। যত দিন যায় ততই এই বৈষম্য গুলো প্রকট হতে শুরু করে। এই বৈমাতৃশুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। এই ঘটনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৫৩ সালে তিনি বলেন, "ভাইয়েরা আমার, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানিরা আনেনি। এনেছেন বাংলার মুসলমানেরা। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করল, আজ তারাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে।... এ প্রবনতা অব্যাহত থাকলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠবে।"[৪৫] শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন, শাসন-শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এক মন, এক প্রান ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিশালী পাকিস্তান জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য এগিয়ে আসেনি। তারা আকৃষ্ট হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের ওপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সূচনাকাল থেকেই তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ব্যবহার করেননি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। শেখ মুজিবুর রহমান নিপীড়িত, শোষিত, দুঃখি মানুষের দূর্দশা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা বোঝা যায় তাঁর একটি ছোট্ট বক্তব্যের মাধ্যমে, আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কি চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।[৪৬] প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অসাংবিদিত নেতা। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর কঠোর কঠিন আত্মত্যাগের জন্য বাংলার বন্ধু বা বঙ্গবন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

---

[৪৪] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ২৪০-২৪১।

[৪৫] মুনতাসীর মামুন, *ছয় দফা স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু।* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০): ৩৩।

[৪৬] ড. রওনক জাহান, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনৈতিক চিন্তাধারা," বাংলাদেশ, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, (এপ্রিল, ২০১৯)।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ তিনি প্রথমদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই বাংলার মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই বিষয়ে তিনি শাসকগোষ্ঠীর কাছে বহুবার আবেদন নিবেদন জানান। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তাঁর আবেদনে কর্নপাত করেনি। পাশাপাশি তাঁরা বঙ্গবন্ধুর উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্যে জোটে জেল-জুলুম, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লাঠি আর মিথ্যা মামলা। এই অধ্যায়ে প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। এই বৈষম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে তাদের একমাত্র মুক্তিদাতা হিসেবে বেছে নেয়।

পাকিস্তানের সূচনাকাল থেকে শাসকগোষ্ঠী যেমন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন চালাতে থাকে বাঙালিদের মধ্যেও তেমনই প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম জোড়ালো প্রতিবাদ হয়েছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এই প্রতিবাদ শুধু মাঠে ময়দানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আর্থ-সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেয় ব্যালটের মাধ্যমে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে ভরাডুবি ঘটে মুসলিম লীগের। ৩০০ টি আসনের মধ্যে তারা মাত্র ৯ টি আসন পায়। এই নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের ধ্বজাধারী মুসলিম লীগের প্রতি আর জনসমর্থন নেই। যুক্তফ্রন্ট তাঁদের একুশ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে বহুল জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই একুশ দফা কর্মসূচি ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার। এই ইশতেহারটি জনমনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটায়। এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে।

যুক্তফ্রন্টের এই একুশ দফা ছিল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। একুশ দফা কর্মসূচির দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। একুশ দফাগুলি হল -

(১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী;

(২) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সকল খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার দাবী। খাজনার পরিমাণ হ্রাস এবং সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করার ব্যবস্থা;

(৩) পাটব্যবসা জাতীয়করণ করে তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পাট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা;

(৪) কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি অর্থ সাহায্যে কুটির শিল্পের উন্নয়ন সাধন করা;

৫) পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পর্ণূর্ণ করা হবে এবং লবণ কেলেঙ্কারির তদন্তও অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা;

৬) কারিগর শ্রেণির গরিব মজুরদের কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭) খাল খনন ও সেচব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া;

৮) পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্প খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা;

(৯) দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা;

(১০) শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে;

(১১) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল করে সবার জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্যকরা;

(১২) শাসন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা; যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত

(১৩) দূর্নীতি , স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিয়াত বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১৪) জন নিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকাননু বাতিল, বিনা বিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা;

(১৫) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা;

(১৬) বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কমবিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা;

(১৭) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া;

(১৮) একুশে ফেব্রয়ারি কে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা;

(১৯) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে আনয়ন; দেশরক্ষাক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়র্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবহিনীর হেডকোয়র্টার পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন; এবং পূর্বপাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা;

(২০) কোন অজুহাতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইনপরিষদে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;

(২১) যুক্তফ্রন্টের আমলে সৃষ্ট শূন্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফন্ট-প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করা ।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির পূর্বসূরি ছিল একুশ দফা কর্মসূচি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৯৭% মানুষের ভোটে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। পরিতাপের বিষয় হল তিন মাসের মধ্যে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু নেতাকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করায় মর্মাহত হন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেছিলেন, এই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হয়।[৪৭]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য নবগঠিত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই আক্রমণ শুরু করে বাঙলা ভাষার উপর। এর মাধ্যমে তারা বাঙলার মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলি খর্ব করার চেষ্টা করে। পাক সরকার ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে ভাষা আন্দোলন। সমগ্র পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭ শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল উর্দু। অন্যদিকে সমগ্র পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। এই অবস্থায় তারা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা করলে বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ড.শহিদুল্লাহ বলেন, যদি একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া গনতন্ত্রসম্মত। শহীদুল্লাহের এই বক্তব্য ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সম্পদশালীরা ছিল উর্দুভাষী। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও উর্দুকেই তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়।[৪৮]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ কোনো অবস্থাতেই যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য বাঙালি জাতির চিরাচরিত সংস্কৃতির উপর কুঠারাঘাত করেন। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিষিদ্ধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা হয় হিন্দুদের কবি ও হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষক হিসেবে। পাকিস্তান রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক,

---

৪৭ Alam, Azmir. "United Front Election of 1954: The Struggle for Democracy." ResearchGate, June 2023. https://www.researchgate.net/publication/371731848_United_Front_election_of_1954_The_Struggle_for_Democracy. https://doi.org/10.5281/zenodo.8179355.

৪৮ Ritesh Karmaker, "Bangabandhu Kindling Language Movement." *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* 7 (July 31, 2021): 41-46.

কবিতা ও রবীন্দ্র সাহিত্য পরিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাঙালির প্রাণের উৎসব ১লা বৈশাখ উদযাপনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৪৯]

বাঙালি সংস্কৃতির উপর শাসকগোষ্ঠীর এই আক্রমনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী ও সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তাঁরা স্পষ্ট ঘোষণা করেন, শাসকগোষ্ঠীর এই নিষেধাজ্ঞা তারা কোনোমতেই মেনে নেবেননা। প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলার মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের প্রানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতিই হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য। খুব সহজভাবে বলা যায় বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হিন্দুদের সংস্কৃতি হিসেবে চালিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দূর্বল ও ইসলামের নামে পূর্ব পাকিস্তানের উপর শাসন, শোষন, বৈষম্য ও নিপীড়ন অব্যাহত রাখা ছিল পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য।[৫০]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যঃ

সারনী -১: ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতি।[৫১]

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্বপাকিস্তান		
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি
প্রাইমারি স্কুল	৮৪১৩	৩৯,৪১৮	+৩৬৯%	২৯৬৬৩	২৮৩০৮	-৪.৬%
সেকেন্ডারি স্কুল	২৫৯৮	৪৪৭২	+১৭৬%	৩৪৮১	৩৯৬৪	+১১.৪%
বিভিন্ন শ্রেণীর কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+৩২%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	২	৬		১	৪	
	৬৫৪ জন শিক্ষার্থী	১৮২০ জন শিক্ষার্থী		১৬২০ জন শিক্ষার্থী	৮৮৩ জন শিক্ষার্থী	

উৎসঃ মুনতাসীর মামুন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস,পৃঃ৬৯

[৪৯] Ahmed, Feroz. "The Struggle in Bangladesh." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 4, no. 1 (1972): 8. https://doi.org/10.1080/14672715.1972.10406271.

[৫০] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ৪০-৪৩।

[৫১] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ৬৯।

সারনী- ২: Literacy rates in Pakistan (for population aged 5 years and older), 1951-1961[৫২]

	1951	1961
Pakistan	14.0	17.5
East Pakistan	18.8	19.9
West Pakistan	7.6	14.4

Source: The literacy data for Census 1951 was adjusted for intercensal differences in the definition of literacy. For datails, see Akther (1963)।

সারনী -৩: Percentage distribution of literates by Educational level, 1961[৫৩]

	East Pakistan	West Pakistan
No Education	15.8	11.6
Primary Education	63.5	47.1
Secondary Education	16.9	29.9
Matriculation	2.8	9.0
Intermediate	0.6	1.9
Graduate	0.4	0.5

Source: Population Census of Pakistan, 1961, Census Bulletin No.4, Literacy and Education(1962)

টেবিল ওয়ানের পরিসংখ্যান গুলির দিকে তাকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যের একটি সার্বিক চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একইভাবে এই বৈষম্য টেবিল- ২ প্রদত্ত পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও পরিলক্ষিত হয়। টেবিল- ৩ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যের একটি ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে শিক্ষাগত বৈষম্য দেখা দেয় এটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষিত কোনো নীতি ছিল না। শাসকগোষ্ঠী শিয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে সুকৌশলে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু সার্বিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হতো পূর্ব পাকিস্তানকে সেই অর্থ প্রদান করা হতো না। পাক সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে

[৫২] Jamila Akhtar, "Review: Literacy and Education: Fifth Release From the 1961 Census of Pakistan." *The Pakistan Development Review* 3, no. 3 (September 1962): 424-442.

[৫৩] Population Census of Pakistan, 1961, Census Bulletin No.4, Literacy and Education(1962).

শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানকে অনেক বেশি অর্থ প্রদান করা হতো। পাক সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সাধারণ বাজেট গুলির দিকে তাকালে তাই সহজ ভাবেই বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সার্বিক শিক্ষার অধিকার প্রদান করা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান না করার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে।[৫৪]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যঃ যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য ছিল প্রবল তাই সরকারি চাকরি করার অধিকারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই দেখা যায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সরকারি চাকরি জীবির সংখ্যার ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল চোখে পরার মতন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই বৈষম্য পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসচেতন শিক্ষিত সমাজ এই বৈষম্য মেনে নিতে পারেননি। তাদের মনে শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণ প্রবল হতাশার সৃষ্টি করে। পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। তাঁরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন যে শাসকগোষ্ঠী দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলে ভাবতে পারেনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে চীন সফরে যান। এই সময়ে তিনি পাকিস্তান ও চীন এই দুটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি চীনের শাসনব্যবস্থার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেখানে তার নাগরিকবর্গের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করে চীনের শাসক গোষ্ঠী নাগরিকবর্গের সঙ্গে কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"- তে লিখছেন, তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ ও এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগন বুঝতে আরম্ভ করল জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন। বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যাবতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছিল বৈষম্যমূলক আচরণের পৃষ্ঠপোষক। এই কারনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৭১ সালে এই দ্বন্দ্ব ভয়াবহ আকার নেয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ভয়ানক বৈষম্য কয়েকটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

[৫৪] Asadullah, Mohammad Niaz. "Educational Disparity in East and West Pakistan, 1947-1971: Was East Pakistan Discriminated Against?" *Bangladesh Institute of Development Studies* 33, no. 3 (September 2010): 2-7.

সারনী- ১: ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব.[৫৫]

পদ	১৯৫৫ সালে			১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার	১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
	মোট সংখ্যা	পশ্চিমপাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী		
সেক্রেটারি	১৯	১৯	×	০.০	১৪.০
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৪১	৩৮	৩	৭.৩	৬.০
ডেপুটি সেক্রেটারি	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫	১৮.০
আন্ডার সেক্রেটারি	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০	২০.০
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯	?

উৎসঃ Safar A. Akanda, "*East Pakistan and Politics of Regionalism".* Unpublished Ph.D. thesis, University of Denver, 1970.

সারনী- ২: ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থান।[৫৬]

পদের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১.সচিব(১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
২. অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সকল সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৩.চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যানবৃন্দ পরিকল্পনা কর্ম কমিশন	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৪. চেয়ারম্যানবৃন্দ : পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ১৯৬২ পর্যন্ত	কেউ না	সকল পদ সবসময়

[৫৫] Safar A. Akanda, "*East Pakistan and Politics of Regionalism".* Unpublished Ph.D. thesis, University of Denver, 1970.

[৫৬] Safar A. Akanda, East Pakistan and Politics of Regionalism, unpublished Ph.D.Thesis. University of Denver. 1970 P.116.footnote-23.

৫. চেয়ারম্যান ও প্রশাসকবৃন্দ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৬. ১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৭. পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীবৃন্দ	কেউ না	সবসময়

উৎসঃSafar A. Akanda, East Pakistan and Politics of Regionalism, unpublished Ph.D.Thesis. University of Denver. 1970 P.116.footnote- 23.

সারনী- ৩: ফরেন সার্ভিস ও স্টেট ব্যাংকের চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য।[৫৭]

চাকুরির ক্ষেত্র	সাল	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩	৩১%
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮%
স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫	১৯.৯%
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪%

উৎসঃ Safar A. Akanda, East Pakistan and Politics of Regionalism, unpublished Ph.D.Thesis. University of Denver. 1970 P.116.footnote-23.

উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যানগুলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসকগোষ্ঠী এই শক্তিশালী আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় কতগুলো ধনী পরিবারের স্বার্থ সুরক্ষিত করত। ফলস্বরূপ জনগনের কল্যান দারুনভাবে ব্যহত হত। স্থায়ি দক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ না থাকায় পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা এই আমলাতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আধিপত্য বিস্তার করে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। এই অর্থনীতিই যে কোনো রাষ্ট্রের

[৫৭] Safar A. Akanda, East Pakistan and Politics of Regionalism, unpublished Ph.D.Thesis. University of Denver. 1970 P.116.footnote-23.

অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত ছিল ব্রিটিশের উপনিবেশ। তাই ইউরোপের মতো ভারতে শিল্পায়ন হয়নি। তবে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে শিল্পায়নের সূচনা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আধিপত্য বজায় ছিল। ভারত বিভাগের পর হিন্দু ব্যবসায়ি শিল্পপতিরা পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে চলে যায়। স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়ী শিল্পপতি যারা ছিলেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেই তাদের নিরাপদ স্থান বলে মনে করেন। ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলার অর্থনীতি একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন হাতে গোনা যে কয়েকটি শিল্প কলকারখানা পূর্ব বাংলায় ছিল তার মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৮ সালে পাক সরকার একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর। যেমন- আয়কর, বিক্রয়কর, রপ্তানি কর, কৃষিভূমির উপর কর ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার কর ও পূর্ব বাংলা থেকে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও কৃষিজাত সম্পদ, চামড়া, পাট ইত্যাদি শিল্পজাত কাঁচামাল সংগ্রহ করে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। মাত্র ২২ টি পরিবারের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য। পাক সরকারের এই বেপরোয়া জনবিরোধী নীতির ফলেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে।[৫৮]

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সূচনাকাল থেকেই তীব্র প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি কমিউনিস্ট না হলেও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি চাইতেন সামাজিক সম্পদের সমবন্টন। দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁর আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখছেনঃ "আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করিনা। একে আমি শোষনের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষন বন্ধ হতে পারে না। "পাক সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি প্রত্যক্ষ করে তীব্র খেদ প্রকাশ করে "কারাগারর রোজনামচা"-য় বঙ্গবন্ধু লিখছেন, কারাগারে তিনি যেমন সকলের সাথে খেতেন, বাড়িতেও তিনি সকলের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষায়, "আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম।...আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখন জমিদার, তালুকদারের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ সামন্ততান্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বানিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের শোষনের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।" বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি সাম্যবাদী আদর্শকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

---

[৫৮] Feroz Ahmed, "The Struggle in Bangladesh." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 4, no. 1 (1972): 2–5. https://doi.org/10.1080/14672715.1972.10406271.

সাধনের হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন না। এই সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্ক ছিল গভীর ও আত্মিক।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই অবগত হওয়া যায়।

Table-1: Per Capita Income in East and West Pakistan(1959-60 Prices, in Rupees)[৫৯]

	1949-50	1959-60	1969-70
Pakistan	311	318	424
West Pakistan	338	366	537
East Pakistan	287	278	331
East-West gap	51	88	206

Source:Third Five Year Plan of Pakistan, p.11, and Report of the Panel of Economists on the Fourth Year Plan (1970-75),p.132.

Table-2: Gross Domestic Product in 1959-60 Constant Prices (in million rupees)[৬০]

	East	West
1949-50	13130	11830
1954-55	14320	14310
1959-60	15550	16790
1964-65	18014	21788
1968-69	20670	27744

Sources: Gustav Papanek, Pakistan Development, Harvard, 1967, p.317; and A.R.Khan, "A New Look at Disparity", Forum, January 3, 1970.

---

৫৯ Third Five Year Plan of Pakistan, p.11, and Report of the Panel of Economists on the Fourth Year Plan (1970-75), p.132.

৬০ Papanek, Gustav. *Pakistan Development: Social Goals and Private Incentives*. Harvard University Press, 1967, p. 317.

Table- 3: Inter-regional trade (exports)[৬১]

Year	East Pakistan	West Pakistan
(in millions of rupees)		
1948-49	18.8	137.6
1950-51	46.0	210.8
1955-56	220.7	318.9
1960-61	355.9	800.5
1965-66	649.7	1189.8
1969-70	915.7	1656.2

Sources: Pakistan Economic Survey 1967-68 and Pakistan Times, June 14, 1971.

এই তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে দেয়। তারা 1966 সাল ও তার পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। 1966 সাল থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি হয়ে ওঠেন জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতা। এপ্রসঙ্গে আমির হোসেন আমুর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, চার অক্ষরের একটি শব্দ 'স্বাধীনতা'। রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর সব সম্প্রদায় কিংবা সব অংশের জনগণের প্রতি ন্যায় ভিত্তিক সমান আচরণ ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নেয়। শাসকগোষ্ঠী এই ক্ষোভ ও হতাশার কারণ অনসুন্ধান ও সমাধানে ব্যর্থ হলে মানষু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে নামে। সরকারের আচরণে , বিশেষ করে জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে এর সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট জাতি তথা জনগোষ্ঠী অনিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এ পথে একবার অগ্রসর হলে প্রায় ক্ষেত্রে শেষ সমাধান হয় পৃথক রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।[৬২] 1971 সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা সমভাবে প্রযোজ্য।অন্যভাবে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লড়াই আন্দোলন করেছেন, জেলবন্দী হয়েছেন, পুলিশের লাঠি গুলি সহ্য করেছেন, তবুও 1971 সালের 25 শে মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরু না করা পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেননি।তবে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গবন্ধুর 7 ই মার্চের বক্তব্য স্বাধীনতার ঘোষণার মতই কাজ করেছিল। বিভিন্ন মহল থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে 7ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানানো হলেও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থন ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় "আমার দেখা নয়া চীন" গ্রন্থে। 1952 সালে শেখ মুজিবুর রহমান চীনা শান্তি কমিটির ডাকে

[৬১] Pakistan Economic Survey 1967-68 and Pakistan Times, June 14, 1971.

[৬২] মো.শাহেনুর মিয়া। *মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু।* Dhaka-1000: Press Information Department (PID), Ministry of Information and Broadcasting, Bangladesh Secretariat, মে ২০২২।

চীন সফরে যান। চীনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষ করেন যে একনায়কতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী বলে সমালোচিত নয়া চীন সরকার চীনের জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটিয়েছে। চীনে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ নেই। খুব সহজভাবে বলতে গেলে নয়াচীন সরকার এক শোষণ মুক্ত সমাজ গড়তে সফল হয়েছে। চীনে শ্রমিক মালিকের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করে বঙ্গবন্ধু লিখছেন....আমরা শ্রমিক ও মালিক পাশাপাশি দেশের জন্য কাজ করছি । মিলটা শুধু মালিকের নয়, শ্রমিক ও জনসাধারণেরও। আজ আর আমাদের মধ্যে কোনো গোলমাল নাই। আমরা উভয়েই লভ্যাংশ ভাগ করে নেই। শ্রমিকের স্বার্থও আজ রক্ষিত হয়েছে, মালিকের স্বার্থও রক্ষিত হয়েছে।[৬৩]

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা করে "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুকে সরব হতে দেখা যায়। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, বন্যার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পাক সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। যেগুলি নয়াচীন সরকার করেছে পাক সরকার এগুলো না করে জনগনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি লক্ষ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়- "ভয়াবহ বন্যায় পূর্ব বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর এরকম হলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এখনই দেশের অবস্থা খারাপ। তারপর আছে ট্যাক্স বা কর। আবার বন্যায় ফসল নষ্ট। এই দেশের হতভাগা লোকগুলো খোদাকে দোষ দিয়ে চুপ করে থাকে। ফসল নষ্ট হয়েছে, বলে আল্লা দেয় নাই, না খেয়ে আছে, বলে কিসমতে নাই। ছেলেমেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, বলে সময় হয়ে গেছে বাঁচবে কেমন করে! আল্লা মানুষকে এত দিয়েও বদনাম নিয়ে চলেছে। বন্না তো বন্ধ করা যায়, দুনিয়ায় বহু দেশে করেছে। চীন দেশে বৎসরে বৎসরে বন্যায় লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হত। সে বন্যা তারা বন্ধ করে দিয়েছে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে ক্রগ মিশনের মহা পরিকল্পনা কার্যকর করলে বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি বন্যা হলেও, ফসল নষ্ট করতে পারবে না। একথা কি করে এদের বোঝাবো! ডাক্তারের অভাবে, ওষুধের অভাবে, মানুষ অকালে মরে যায়, তবুও বলবে সময় হয়ে গেছে। আল্লা তো অল্প বয়সে মরবার জন্য জন্ম দেয় নাই। শোষক শ্রেণী এদের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়ে এদের পথের ভিখারি করে, না খাওয়াইয়া মারিতেছে। না খেতে খেতে শুকায়ে মরছে, শেষ পর্যন্ত না খাওয়ার ফলে বা অখাদ্য খাওয়ার ফলে কোনো একটি ব্যারাম হয়ে মরছে, বলে কিনা আল্লা ডাক দিয়েছে আর রাখবে কে?

কই গ্রেট বৃটেনে তো কেউ না খেয়ে মরতে পারে না। রাশিয়ায় তো বেকার নাই, সেখানে তো কেহ না খেয়ে থাকে না, বা জার্মানি বা আমেরিকা, জাপান এই সকল দেশে তো কেহ শোনে নাই- কলেরা হয়ে কেউ মারা গেছে? কলেরা তো এসব দেশে হয় না। আমার দেশে কলেরায় এতো লোক মারা মায় কেন? ওসব দেশে তো মুসলমান নাই বললেই চলে। সেখানে আল্লার নাম লইবার লোক নাই একজনও; সেখানে আল্লার গজব পড়ে না। কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বরও হয় না। আর আমার রোজ আল্লার পথে আজান দিই, নামাজ পড়ি, আমাদের ওপর গজব আসে কেন? একটা লোক না খেয়ে থাকলে ওই সকল দেশের সরকারকে

[৬৩] শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন। (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২০): ৭০।

দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। আর আমার দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দিনের পর দিন না খেয়ে পরে আছে, সরকারের কোনো কর্তব্য আছে বলে মনেই করে না।

তাই আমাদের দেশের সরকার বন্যা এলেই বলে 'আল্লার গজব'। কিছু টাকা দান করে। কিছু খয়রাতি সাহায্য ও ঋণ দিয়ে খবরের কাগজে ছেপে ধন্য হয়ে যায়। মানুষ এভাবে কতকাল চলতে পারবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। বড়লোকদের রক্ষা করার জন্যই যেন আইন, বড়লোকদের আরো বড় করার জন্যই মনে হয় সিপাহী বাহিনী। এই দেশের গরীবের ট্যাক্সের টাকা দিয়েই আজ বড় বড় প্রাসাদ হচ্ছে, আর তারা দুবেলা ভাত পায় না। লেখাপড়া, চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা ছেড়েই দিলাম। বন্যায় শত শত কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়ে যাইতেছে প্রত্যেক বৎসর। সেদিকে কারো কোনো কর্তব্য আছে বলে মনে হয় না।[৬৪]

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান গণপরিষদে বলেন.... "পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য প্রদেশের গভর্নরদের বেতন সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমেদ কর্তৃক আনীত সংশোধনী আমি সমর্থন করতে চাই।

সংশোধনীতে গভর্নরগনের মাসে 3000 টাকা করে পাওয়া উচিৎ বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহোদয়, আপনি জানেন যে গভর্নরগন প্রত্যেকে মাসে 6000টাকা করে পাচ্ছেন এবং পেতে থাকবেন। এছাড়াও তাঁরা পাচ্ছেন বিনা ভাড়ায় আসবাবসজ্জিত বাংলো এবং আরো নানা রকম সুবিধা। মহোদয়, আমরা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছি যে, আমরা ইসলামী দেশ এবং আমারা ইসলামী রাজনীতির অনুসারী। তাহলে এটাকে কি ইসলামী আদর্শ বলব যখন আমরা গভর্নরদের 6000 টাকা করে বেতন দিচ্ছি আর দেশের গরীব লোকজন অনাহারে এবং ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে? মহোদয়, আমার দেশের লোকজনের মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। তারা অন্ন পায়না, বস্ত্র পায়না এবং কখনো কখনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের অন্ন বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ইজ্জত খোয়াতে হয়। তাহলে বলুন,আমরা কাদের অর্থ ব্যয় করতে যাচ্ছি? এটা হচ্ছে এদেশের গরীব চাষীদের অর্থ, পাট ও তুলা চাষীদের অর্থ এবং তা হচ্ছে করদাতা সাধারণ মানুষের অর্থ এবং ওই করের অর্থ থেকে আমরা গভর্নরদের মাসে ৬০০০টাকা করে দিতে যাচ্ছি। মহোদয়, আমরা ভান করি যে, আমরা ইসলামী দেশ, কিন্তু এখানে একজন পিয়নের মাসিক বেতন ৫০ টাকা, আর্দালির বেতন ৭০ টাকা আর কেরানির ১০০ বা ১৫০ টাকা, আর কিনা এই ইসলামী দেশে ইসলামের ধ্বজাধারী এসব নেতা পাবেন মাসে ৬০০০ টাকা করে। তাহলে এটাই কি ইসলামের নমূনা, যা নিয়ে আমরা এতো বড়াই করছি এবং যা আমরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করছি?

৬০ কোটি মানুষের দেশের চেয়ারম্যান সেই মহান চীনা নেতা মাও সে তুং পর্যন্ত মাসে মাত্র ৫০০ টাকা পান। অবশ্য তিনি আমাদের গভর্নর জেনারেল এবং গভর্নরদের মতো বিনা ভাড়ায় আসবাবসজ্জিত বাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশে যেখানে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ নানা ধরনের রোগে ভুগছে এবং ওষুধ ও মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না সেখানে আমরা গভর্নর সাহেবদের জন্য মাসে ৬০০০ টাকা করে দিতে যাচ্ছি। তাহলে, মহোদয় শুনুন, আমি যখন রাতের বেলায় এই করাচি নগরীর পথ দিয়ে যাই তখন দেখি পাকিস্তানের নাগরিকেরা খোলা আকাশের নীচে ফুটপাতে

[৬৪] শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১৭): ১০৯-১১১।

শুয়ে আছে এবং তারই পাশে দেখি প্রাসাদোপম দালানকোঠা আয চমৎকার সব মোটর গাড়ি। এটাই হল ইসলামী দেশের চেহারা! ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূতের মাসিক বেতনের পরিমাণ ৯০০০ টাকা অথচ ওই ধনী দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এ থেকে কম বেতন পান। মহোদয়, পরিস্থিতি আপনার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমি আমার বন্ধুদের বলবো তারা যেন ইসলামের আর অবমাননা না করেন। আপনারা যখন গভর্নরদের ৬০০০ টাকা করে বেতন দিতে চলেছেন তখন ইসলাম নিয়ে আপনাদের কোনো কথা বলার অধিকার নেই।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে পাঞ্জাবে শ্রমিকদের জন্য ৫৭ টি পদ শূন্য ছিল, আর ওই ৫৭ টি পদের জন্য ৫০০০ জন প্রার্থী আসে। কিন্তু আমরা তাদের সবাইকে চাকরি দিতে পারিনি, আমরা তাদের অন্ন-বস্ত্র দিতে পারিনি। অথচ আমরা আমাদের বড় বড় নেতাকে মোটা অংকের বেতন দিচ্ছি। তাঁদের অনেকেই বড়লোক এবং দেশের স্বার্থে তাঁরা ওই অর্থ উৎসর্গ করতে পারেন। তাঁরা সরকারের নিকট থেকে কোনোকিছু না নিয়ে এমনকি এক কপর্দকও গ্রহণ না করে কাজ করতে পারেন, প্রশাসন অব্যাহত রাখতে পারেন। ব্যাঙ্কে তাঁদের অনেক টাকা-পয়সা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা গরীব মানুষের দেওয়া টাকা গ্রহণ করবেন। এটা কাদের পাকিস্তান? এটা গরীব মানুষের। আমার বন্ধুরা শরনার্থীদের কথা বলে থাকেন। আমাদের ওখানে আসাম, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত প্রায় ৩ লাখ শরনার্থী আছে। এদের কোনো জায়গা জমি নাই, নাই আশ্রয় স্থান। এমনকি, মহোদয় খোদ করাচিতেও এদের দেখতে পাবেন, কারণ এই শহরে আপনি অবশ্যই ঘোরাফেরা করে থাকেন। নাজিমাবাদ, লালুতে এবং কায়েদে আজম এর মাজার সংলগ্ন এলাকায় যান আপনি আশ্রয়হীন মানুষ দেখবেন। এমনকি কায়েদে আজম এর আত্মাও পরিপূর্ণ শান্তি পাবে না যখন তিনি দেখবেন যে পাকিস্তানের এইসব লোক যাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এবং যারা নিজেদের ঘড়-বাড়ি সব কিছু ফেলে ভারত থেকে চলে এসেছে তারা এখন আশ্রয়হীন, সম্বলহীন। বৃষ্টি হলে তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়ে পড়ে। তাদের আশ্রয়ের জন্য এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এবং সরকার তখন তাদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার ব্রিগেড পাঠায়। মহোদয়, সাম্প্রতিক বর্ষনের সময় ড্রিগ রোডের এইসব গরীব, অসহায় মানুষের কাছ থেকে আমরা টেলিফোন পাই। আমি শরনার্থী বিষয়ক মন্ত্রী সরদার আমির আজম খানকে টেলিফোন করি তাদের রক্ষার জন্য। তিনি এদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফায়ার ব্রিগেড পাঠান। এরপরে, মহোদয়, শিক্ষা প্রসঙ্গে আসি। আমাদের দেশে ন্যূনতম শিক্ষা লাভেরও সুযোগ নাই। সিংহলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত প্রত্যেকেই এম.এ. ডিগ্রি লাভ পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। অথচ আমাদের দেশে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ নাই। মহোদয়, আপনি জানেন যে, এইসব গভর্নর, মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত কি পাচ্ছেন। এখানে আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি এবং তা আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর সামনে বলতে পারি। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাজও করেছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমি তাঁর সময় কিছুদিন মন্ত্রী ছিলাম এবং আমরা ১০০০ টাকা করে বেতন নিতাম। আমি বুঝতে পারিনা আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কেন মাসে ১০০০ টাকা করে বেতন নিবেন না, কেনই বা তাঁরা ৩০০০ টাকা করে নিবেন। জনগনের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তাঁরা এই ত্যাগ স্বীকার করুন। আমাদের দেশের মানুষদের রয়েছে খাদ্যাভাব, তারা আশ্রয়হীন এবং

যখন তারা খাদ্যাভাবে মারা যান তখন সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে কলেরা বা ম্যালেরিয়া হচ্ছে তাদের মৃত্যুর কারণ।

আপনার অর্থ আছে, আছে খাদ্য, কিন্তু এইসব গরীব মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, কারণ এদের না আছে খাদ্য, না আছে আশ্রয়স্থল।

পাকিস্তান দিবসে আমরা গরীব জনগণের মাঝে চাল বিতরণ করেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় যে সরকারি কর্মকর্তারা পাকিস্তানের গরীব মানুষদের মাঝে চাল বিতরণ করছে। মহোদয়, এটা কি পাকিস্তানের জনগনকে অপমান করার সামিল নয়? আমরা পাকিস্তানের স্বার্থে তাঁদের কাছে আবেদন জানাই অনুগ্রহ করে স্বার্থ ত্যাগ করুন, আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট রয়েছে, তাই জনাব আবুল মনসুর কর্তৃক আনীত সংশোধনী মেনে নিয়ে দেখান যে, আপনারা পাকিস্তানের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য, দেশের জন্য স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন এবং আপনাদের গভর্নরদের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকার বেশি বরাদ্দ করবেন না। তাঁরা যে কেবল মাসিক ৩০০০ টাকা করে বেতন পাবেন তাই নয়। তাঁরা তো তাঁদের পরিবারের জন্য, চাকরবাকরদের জন্য আসবাবপত্রসজ্জিত বাসাবাড়িও পাবেন। তাই, দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এই সংশোধনী মেনে নিন এবং সহায় সম্বলহীন, বুভুক্ষু ও মৃত্যু পথযাত্রী পাকিস্তানের এইসব গরীব মানুষের প্রতি আপনাদের যে সহানুভূতি, সহমর্মিতা রয়েছে তার পরিচয় দিন"।[৬৫]

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত শোষিত মানুষের কথা ভাবতেন না, পশ্চিম পাকিস্তান তথা বিশ্বের শোষিত মানুষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তি চাইতেন। ১৯৭৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর এক বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত- ১) শোষক ও ২) শোষিত। তিনি শোষিত মানুষের পক্ষে। তাই দেখা যায় বিভিন্ন বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন।[৬৬]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। মার্শাল আইন জারি করে তিনি নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেন। এই সময় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায়। ষাটের দশকে একদল বাঙালি অর্থনীতিবিদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে প্রবন্ধ, সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন করতে থাকে। যেহেতু আয়ুব খান রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন তাই এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের ক্রিয়াকলাপ জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ হলেন মুশাররফ হোসেন, আখলাকুর রহমান, রেহমান সোবহান প্রমুখ। এই সমস্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকগুলো অ্যাকাডেমিক স্তরে আলোচনা করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয় পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে এই বৈষম্য অবসানের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের তৎপরতা যথেষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা প্রনয়নের ক্ষেত্রে এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে কার্জন হলে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতি- এর উপর

---

[৬৫] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ১৫৪-১৫৬।

[৬৬] গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, "বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠান," Bangladesh Bank, ০৩ আগস্ট ২০১৫, https://www.bb.org.bd/governor/speech/aug032015gsb671.pdf.

একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে দুই অর্থনীতি বিষয়ে রেহমান সোবহান একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই প্রবন্ধটি ব্যাপক প্রচার পায় ও জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাকিস্তান অবজারভারে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় রেহমান সোবহান বলেছেন, "পাকিস্তানে বর্তমানে দুই অর্থনীতি বিদ্যমান।" পাশাপাশি রেহমান সেহবানের মন্তব্যের পাশেই আইয়ূব খানের প্রতিক্রিয়াও প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছেপে অবজারভার লেখে- "আইয়ূব খান বলেছেন , পাকিস্তানের একটাই অর্থনীতি।" বাঙালী অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য গুরুত্ব না দিলেও শাসকগোষ্ঠী তাঁদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এই সমস্ত লেখকদের চাপে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ১৯৬১ সালে অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করতে আয়ূব খান বাধ্য হন। শুধু তাই নয় এই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানেও আয়ূব খান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাম্য বজায় রাখার প্রয়াস গ্রহণ করে। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এইগুলি ছিল লোক দেখানো ও প্রচার সর্বস্ব। একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা যায় যে মাত্র ৩% শিল্প সম্পদের মালিকানা রয়েছে বাঙালিদের হাতে। বাকি সব শিল্প সম্পদের মালিকানা ছিল অবাঙালিদের হাতে, যারা স্বাধীনতার পর বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যায়।[৬৭]

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিঃ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ১৯৬৬ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এই বছরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে পাকিস্তানের জনপ্রিয় জাতীয় নেতায় পরিণত হন। শুধু তাই নয় তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়। এমন এক সময় এই ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয় যখন পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে আকাশ ছোঁয়া দ্রব্য মূল্য, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার ভিতী ও আয়ূব খানের স্বৈরাচারী শাসন শোষনে পূর্ব পাকিস্তানে এক হতাশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর কনভেনশনে বাঙালিদের মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর এই দাবি বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কনভেনশনের সভাপতি চৌধুরী মহম্মদ আলি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি কনভেনশনে গৃহীত না হওয়ায় তিনি তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ কনভেনশন মৌলানা মহম্মদ ভাসানী ছয় দফা দাবিকে বিচ্ছন্নতাবাদী বলে আখ্যা দেন। ভাসানী স্পষ্ট মন্তব্য করেন ছয় দফার পেছনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর হাত রয়েছে। তাদের বক্তব্য এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন এটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল। ছয় দফা দাবি মেনে নিলে পাকিস্তানই শক্তিশালী হবে।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি আরেকটি কারণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেটা হল, এর রচয়িতা কে বা কারা? এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক

---

[৬৭] সোবহান, রেহমান। *উত্তল রোমন্থনঃ পূর্ণতার সেই বছরগুলো।* (SAGE Publications Pvt. Ltd., ২০১৮): ৩১-৩৮।

আওয়ামী লীগের যে সমস্ত প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাহোরে বিরোধী দলগুলোর কনভেনশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তারা কেউই জানতেন না বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি উত্থাপন করবেন। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগেও কোন আলোচনা হয়নি। কনভেনশনের আয়োজন কর্তৃপক্ষকেও কিছু জানানো হয়নি। তাই বিতর্কিত ছয় দফা দাবি উত্থাপনকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধে।

১১ ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই অঞ্চলের নিরাপত্তার দিকে কোনো নজর দেওয়াই হয়নি। ছয় দফা বাঙালিদের একমাত্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। তিনি বলেন, এটা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে বিরোধী দল ও রাজনৈতিক নেতারা যে সমালোচনা করে চলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে বলেন এই ধরনের সমালোচনা লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছুই না।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবিগুলো হলো -

প্রস্তাব- ১: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি:

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

প্রস্তাব- ২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব- ৩: মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারেঃ-

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দু'টি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব- ৪: রাজস্ব, কর, বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:

ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি

অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব- ৫: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোন রকম বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব - ৬ : আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা: আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

পাকিস্তানের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির কঠোর সমালোচক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, প্রকাশ্য জনসভায় তিনি ভুট্টোর সঙ্গে ছয় দফা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চান। ভুট্টো সাহেবের সৎ সাহস থাকলে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেন, এই সভা কোনো রুদ্ধদ্বার কক্ষে হওয়া চলবে না। এটি হতে হবে প্রকাশ্য জনসভাতে যার সভাপতি হবেন হাইকোর্টের কোন একজন বিচারপতি। দেখা গেল জুলফিকার আলী ভুট্টো এই বিতর্ক সভায় যোগ দেওয়ার সাহস প্রর্দশন করতে পারলেন না। ভুট্টো এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ছয় দফার পেছনে রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অকুণ্ঠ জনসমর্থন।

যে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতা কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্বশাসনের কথা বলছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেন যে, রাজনীতিতে মধ্যপন্থার কোন স্থান নেই। কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত্বশাসন অসম্ভব। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

বিষয়টা এমন নয় যে, শুধু সরকার ও বিরোধী দলগুলো ছয় দফার বিরোধীতা করেছিল, শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের দল আওয়ামী লীগের এক অংশের নেতাও ছিল ছয় দফার চরম বিরোধী। তবে এই সমস্ত নেতারা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার কাছে ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তাই দেখা গেল ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে বঙ্গবন্ধু সহজেই তাঁর ছয় দফা কর্মসূচী অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হন। ছয় দফা দাবি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় অনুমোদন

করা ছিল শেখ মুজিবের কাছে বাধ্যতামূলক। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচীকে গনভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা করতে শুরু করেন। বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ ছয় দফা ঘোষণার পর জনমত সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধু তাঁর সফরসঙ্গীসহ ১৯৬৬- এর ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের জনসভায় 'ছয় দফা'কে 'নতূন দিগন্তের নতূন মুক্তি সনদ' হিসেবে উল্লেখ করে চট্টগ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'একদিন সমগ্র পাক-ভারতের মধ্যে বৃটিশ সরকারের জবরদস্ত শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলের বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে ছিলেন। আমি চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ে সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসীরা চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করুন।' ছয় দফা কর্মসূচি প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি মদতপ্রাপ্ত গনমাধ্যম প্রবল বিরোধিতা করলেও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাটি ছয় দফার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মানিক মিয়ার ছয় দফা দাবি সম্পর্কে জমকালো প্রতিবেদন জনমনে প্রবল রেখাপাত করে। "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পত্রিকাটির সাহস ও যুক্তিপূর্ণ লেখার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে দেখা যায়।

১৯৬৬ সালের মার্চের ১৭-২০ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করিয়ে নেন। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে কাউন্সিল সভার শেষে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ছয় দফা দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এইদিন তিনি স্পষ্ট বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো নেতার দল নয়, এটা কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ছয় দফা বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের কঠোর কঠিন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই সভায় বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফার সঙ্গে কোনো আপোষ চলবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন, ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ একাই রাজপথে লড়াই করবে। পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন, আমাদের ধৈর্য্য হারানো চলবে না। আন্দোলন পরিচালিত হবে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এরপর বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচির প্রচারে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়ান। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনসভার মধ্যে খুলনা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট প্রভৃতি জনসভায় হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। খুব দ্রুত ছয় দফা কর্মসূচি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভিত সন্ত্রস্ত আয়ূব খান সরকার বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেফতার করতে শুরু করে। তিন মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে আটবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ই মে মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে দেশরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ওপরেও চলে অত্যাচার ও গ্রেফতার।

বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ থাকলেও ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রবল গনআন্দোলন গড়ে তোলে আওয়ামী লীগ। প্রচুর জনসভা, মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে ছয় দফা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায় আওয়ামী লীগ। এই আন্দোলন দমন করতে সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করে। আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ইত্যাদি কঠোর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে সরকার। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফা দিবস উদযাপনের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ।

শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল রাজবন্দীদের মুক্তি ও ছয় দফার বাস্তবায়ন ছিল এই দিবসের উদ্দেশ্য। এইদিন পুলিশ কঠোরভাবে আন্দোলন দমন করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মনু মিয়া ও মুজিবুল্লাহসহ অসংখ্য শহীদের রক্তে প্লাবিত হয় রাজপথ। বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। আহত হন অসংখ্য মানুষ।[৬৮]

আগরতলা মামলা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলাটি একটি মাইলফলক। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। এর জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ছিল এই প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সে জন্যই একে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আগরতলা মামলা নামে।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন এটি প্রমাণিত যে, এই মামলার ভিত্তি ছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য দেখে, স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার বা কুশীলবরা যেভাবে বিষয়টি সাজিয়েছিল আসলে সেটি তেমন কিছু ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য ভেবেছিলেন, একটি পরিকল্পনা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্যই জাতীয় বীর।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এ ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পাকিস্তান সরকার মামলা সাজিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত নৌ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন ১৯৬২-৬৩ থেকে এবং অধিকাংশই ছিলেন নিম্ন পর্যায়ের অফিসার। ক্যাপ্টেন শওকতরা প্রধানত একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূল বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। সিভিল সার্ভিসের রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল; কারণ এরা সবাই ছিলেন বাঙালি প্রেমী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি। শওকত আলীদের কাছে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করছেন এবং গোপনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সজাগ নন। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। প্রশ্রয় হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি যে মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা তো সত্য; স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও

[৬৮] মুনতাসীর মামুন। *ছয় দফা স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু।* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০): ২৫-৩৯।

তো সত্য। গোয়েন্দা দফতর তা জানত। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এ মামলা করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা প্রচার করতে চেয়েছিল- শেখ মুজিব ভারত বা হিন্দুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছেন।[৬৯]

এই মামলার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হল যে শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়ছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু তো ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে। এই সময় আইয়ুব খানবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। এখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রধান হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে 'ড্যাক'।

ইতোমধ্যে মামলার শুনানি শুরু হলে পত্রিকাগুলি ফলাও করে প্রচার করতে থাকে অভিযুক্তদের প্রতি কী অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা শুধু প্রত্যাহার নয়, বিনা শর্তে সকল অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয়। এই মামলার ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ এলএফসিডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল আবদুস সামাদ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী), বিধানকৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, অবসরপ্রাপ্ত ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সিএসপি, একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এম নুরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ, আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলার চার্জশিটে ছিল ১০০ অনুচ্ছেদ। সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে

---

[৬৯] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫)।

অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদের দল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌসুলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি এইচ খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কিছু ছিলনা।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা হাতবদল হয়। এইদিন জেনারেল আয়ূব খানের কাছ থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, খুব শীঘ্রই পাকিস্তানে প্রপ্তবয়স্ক জনগণের দ্বারা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তানের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।

সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যায় এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। বহু মানুষ আহত হন, গবাদিপশু ও প্রচুর বাড়িঘর ধুলিসাৎ করে দেয় এই ঝড়। এর কিছুদিন পূর্বেই বাংলা একটা ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য শাসকগোষ্ঠী কোনোপ্রকার সহায়তা করেনি। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

বাঙালিদের এই সংকটের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ দল ছয় দফাকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে জনগনের কাছে উপস্থিত করে। বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর এই ইশতেহারের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভা ও সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন দল আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের এই ফল চোখের ঘুম কেড়ে নেয় শাসকগোষ্ঠীর।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিতে তালবাহানা শুরু করে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। তিনি সংখ্যালঘু দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা সত্ত্বেও কোনো সমাধান পাওয়া গেল না। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, মার্চের ৩ তারিখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভা জাতীয় সভার বৈঠক বসবে। দেখা গেল ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান তাঁর একটি ঘোষণায় বলেন, জাতীয় সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হবে। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে।

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বলেন, আমরা কেউ সরকারের সঙ্গে কোনোপ্রকার সহযোগিতা করবো না। রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার প্রতিবাদে বেড়িয়ে আসে। সরকার এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করে। পুলিশ, সেনাবাহিনীর গুলি, জেল-জুলুম ও নিজের জীবন তুচ্ছ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসন তখন চলছিল বঙ্গবন্ধুর কথায়। ইয়াহিয়া খানের কোন কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের উপর ছিল না।

এই উত্তক্ত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ জনগনের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই ভাষনে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেন, ছয় দফার সঙ্গে আপোষ করার কোন অধিকার জনগন আমাকে দেয়নি। তিনি বলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সভায় বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক, শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

২৫ মার্চ ইতিহাসে একটি কালো দিন। এইদিন রাতে পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালিদের ওপর। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি ঘাতক পাক বাহিনীর হাত থেকে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়। বিশেষ করে তাদের আক্রমনের মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই গনহত্যাকে তারা নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট '।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা মুক্তি বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বাঙালিদের এই দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারতীয় সেনার সহায়তায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হয়।[৭০]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আল্লাহর নামে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন চালাতো। তারা প্রচার করত যে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থেই এগুলো অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাউতাবাজি রাজনীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সচেতন করেন। তিনি এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থে ইসলামের নামে শাসকগোষ্ঠী নির্মমভাবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। তাই দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানী সরকারের বৈষম্যমূলক জাতীয়তাবাদী আদর্শকে। শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। তাই দেখা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

---

[৭০] মুহম্মদ জাফর ইকবাল। *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮): ৩-৯।

ডাকে নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ১৯৭১ সালে বাঙালিরা মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান দাবিদার মুসলিম লীগের কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল না। এই রাজনৈতিক দলটি ইসলাম ধর্মকেই একমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। পাকিস্তানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল এই রাজনৈতিক দলটির প্রধান ইশতেহার। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ দলের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনোই ধর্মকে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতি ছিলেন না। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও এই দলটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কোনো সুসংবদ্ধ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় যে সমস্ত সামরিক শাসকরা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারাও এক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি। তাঁর ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গুলি তিনি জনগনের কাছে প্রচার করতে থাকেন এবং স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেগুলি আদায় করার জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গুলি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে হতদরিদ্র মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর কঠোর কঠিন আত্মত্যাগ মানুষের মনে প্রবল রেখাপাত করে। এই ভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কাছে হয়ে ওঠেন আদর্শ জাতীয় রাজনৈতিক নেতা। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গুলির জন্য হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুক্তিদাতা। অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি না থাকার জন্য ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির বিভাজন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ছিল এই সমস্ত দাবি দাওয়ার নির্যাস। ছয় দফা দাবির মাধ্যমে বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই ছয় দফা দাবি সহজেই মানুষের বোধগম্য হয়। তারা দ্রুত ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। বিষয়টি আরও সহজভাবে বলা যায়, ১৯৬৬ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করে সেগুলি সমাধানের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের হাতেই আর্থ-সামাজিক ও স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অধিকার ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে আর্থ-সামাজিক ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব তার একটা সুন্দর স্বচ্ছ রূপরেখা প্রদান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালিদের মুক্তির দলিল হিসেবে মনে করেন। এই ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৭১ সালে এক দফায় পরিনত হয় অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর যে আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, এর সমাধানের জন্য এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল। এই সংগ্রাম করতে গেলে যে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক দৃঢ়তা প্রয়োজন সেগুলি বিকশিত করা অপরিহার্য। অন্যভাবে বলা যায়, মুক্তি আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত চলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন সেটি না হলে মুক্তি আন্দোলন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য। তাই দেখা যায় ১৯৬৬ সাল থেকে মুক্তি যুদ্ধের জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন সেটি প্রস্তুত করার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ দৃষ্টি দেন। ১৯৬৬ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন বক্তৃতায় জয় বাঙলা, সোনার বাংলা, বাংলাদেশ ইত্যাদি শব্দ সমূহ প্রবলভাবে ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার চেষ্টা চালান। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ থেকে ৭১ সালের মধ্যে মুক্তি যুদ্ধের জন্য বাঙালিদের প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এত অল্পদিনে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের হৃদয়ে মুক্তি যুদ্ধের চেতনার বীজ রোপণ করেছিলেন। এটা করতে পেরেছিলেন বলেই দেখা যায়, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সশস্ত্র পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। তীব্র প্রতিকূলতা অতিক্রম করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয় পূর্ব বাংলার জনগণ।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল এই অধ্যায়ে সেটি পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান দাবিদার ছিল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে এর জন্ম। এই অধিকারগুলি আদায় করার জন্য বিভিন্ন সময়ে জাতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এই দল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র গঠন হয়ে দাঁড়ায় মুসলিম লীগের প্রধান রাজনৈতিক ইস্তেহার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের এই পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনগনের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা।[৭১]

ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর রাজনৈতিক নিপীড়নের সূচনা করে বিষয়টি এমন নয়। বাংলার মানুষের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনার সূচনা হয় মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯০৬ সালে ঢাকায় এই দলের জন্ম হলেও দ্রুত লীগের নেতৃত্ব চলে যায় উত্তর ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের হাতে। তবে বাংলাকে উপেক্ষা করার সাহস ছিল না মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কারণ, বাংলায় এই দলের প্রবল জনপ্রিয়তা ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম প্রমূখের সৌজন্যে। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশন ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য দূর্ভাগ্যজনক। এই কনভেনশনেই সুচতুর এক অংশের মুসলিম লীগ নেতা লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করেন। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। দিল্লি কনভেনশনে এটা পরিবর্তন করা হয়। States এর বদলে state করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ মুসলিম লীগের প্রগতিশীল গোষ্ঠী এটা মেনে নিতে পারেননি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একবার (১৯৪৭-৫১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ। এই সময় এই পদটি ছিল প্রভূত ক্ষমতাশালী। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি খাজা নাজিমউদ্দীন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গভর্নর জেনারেল হিসেবে মহম্মদ আলি জিন্নাহ সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করলেও খাজা নাজিমউদ্দীনের সময়ে গভর্নর পদটি হয়ে পরে দুর্বল প্রকৃতির। এই সময় লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। লিয়াকত আলী খান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি হওয়ার কারনেই খাজা নাজিমুদ্দীনকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। এ দেখেই বোঝা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি বিদ্বেষ কতটা প্রবল ছিল।[৭২]

---

[৭১] Parveen, Usmani. "Role of the All India Muslim League." *Journal of Education, Arts, Law and Multidisciplinary* 2 (2012): 28-30.

[৭২] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ৬২।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই কারণে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। লাহোর প্রস্তাবটি ছিল এই রকম,

"THE LAHORE RESOLUTION"

Resolved at the Lahore Session of All-India Muslim League held on 22nd-24th March, 1940.

(1) While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All Indian Muslim League as indicated in their resolutions dated the 10th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October, 1939, and 3rd February 1940 on the constitutional issues, this Session of the All-Indian Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

(2) Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute “Independent States” in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

(3) That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in these regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them; and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

(4) This Session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption

finally by the respective regions of all powers such as defense, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary."

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান গঠন না হওয়ায় মর্মাহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকেই। ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।[৭৩]

শেখ মেহেদী হোসেন তাঁর "Bangabandhu, Bengaliness and Bengali Identity" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতোই বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পরেন। পাকিস্তান গঠন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।[৭৪]

একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় অধ্যাপক হারান উর রশীদ এর লেখায়। তিনিও লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। অধ্যাপক রশিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু ভারত বিভক্ত করে তিনটি রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করতেন। একটি হল ভারত, আর অন্য দুটি হলো ভারতের পশ্চিম ও পূর্বে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত দুটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক দুটি রাষ্ট্র। অধ্যাপক হারুন অর রশিদ আরো উল্লেখ করেছেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রবল ভালোবাসা থাকার জন্যই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখনই বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর শাসকগোষ্ঠী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তখনই বঙ্গবন্ধু প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পৃথক ভৌগলিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।[৭৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"-তে লিখেছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সূচনা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের একদল মুসলিম লীগ নেতা পূর্ব বাংলার

---

[৭৩] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ৪৪-৪৫।

[৭৪] Sheikh Mehedi Hasan. "Bangabandhu, Bengaliness and Bengali Identity." In *Tungipara: A Memorial Book on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, edited by Sheikh Mehedi, 169-183. Bangladesh: Bangabandhu Teachers' Forum, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, 2015.

[৭৫] Harun-or-Rashid. "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-75): His Political Thoughts and Ideals." *South Asia Institute Papers Beiträge Des Südasien-Institutes Heidelberg*, issue 1 (2022).

এক অংশের মুসলিম লীগ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য একজন নেতা ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। ক্ষমতার লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে খাজা নাজিমউদ্দীন নির্লজ্জের মতো এই ষড়যন্ত্রে সামিল হন। ষড়যন্ত্রকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তিনি বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি চায়তেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা ছিলেন বাঙালি বিদ্বেষী, তারা কখনোই বাঙালি জাতির মুক্তির কথা চিন্তা করতেন না। বাঙালিদের উপর শাসন শোষন কায়েম করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলা গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠার ঘটনা মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তারা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিপদ জনক বলে মনে করতে শুরু করেন। এই সমস্ত নেতাদের ষড়যন্ত্রের কারণেই প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচিবাসী হতে বাধ্য হন।

বঙ্গ রাজনীতিতে বিধায়ক কেনা-বেচা, ভিতি প্রর্দশন, মন্ত্রীত্বের লোভ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকে কলুষিত করে। এই সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদার মনোভাব পোষণ করেন। তিনি কোন প্রকার ছল চাতুরী ও দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন, শহীদ সাহেবের এই উদারতা তাঁকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি কয়েক গুণ শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেয়। তিনি আরও বলেছেন, ১৯৪৭ সালে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সাহেব। তিনি চাইলে কার্ফূ জারি করে ষড়যন্ত্রকারীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"-তে লিখেছেন, সিলেট গণভোটে জয়লাভ করে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। দেখি, মুসলিম লীগের এক দল ঠিক করেছেন নাজিমুদ্দীন সাহেবকে শহীদ সাহেবের সাথে নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাবেন। কেন্দ্রীয় লীগ দিল্লি থেকে হুকুম দিয়েছেন ইলেকশন করতে। জনাব আই আই চুন্দ্রিগড় কেন্দ্রীয় লীগের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে সভাপতিত্ব করবেন। এদিকে দু'দেশের সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে যে গোলমাল চলেছে, সেদিকে কারো খেয়াল নাই। নেতা নির্বাচন নিয়ে সকলেই ব্যস্ত। নাজিমুদ্দীন সাহেব নির্বাচনের সময় নমিনেশন দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন লন্ডন ও দিল্লিতে। শহীদ সাহেব সমস্ত নির্বাচনটা নিজে চালিয়েছিলেন, টাকা পয়সার বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম পান নাই। কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারের দাঙ্গা বিধ্বস্তদের সহায়তা দান, মুসলিম লীগের সংগঠন, দিল্লি, কলকাতা দৌড়াদৌড়ি সকল কিছুই তাঁকে করতে হয়েছিল। আর যখন পাকিস্তান কায়েম হয়েছে তখন নেতা হবার জন্য আর একজনকে আমদানি করা যে কত বড় অন্যায় সেকথা ভবিষ্যৎ বিচার করবে। শহীদ সাহেবের বিরোধীদের প্রপাগান্ডা হল তিনি পশ্চিম বাংলার লোক; তিনি কেন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন? শহীদ সাহেব তো কোনোদিন দুই গ্রুপ চিন্তা করেন নাই, তাই নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকদেরও নমিনেশন দিয়েছিলেন, মন্ত্রী করেছিলেন, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি, চিফ হুইপ, স্পিকার অনেক পদই দিয়েছিলেন। এরা সকলেই তলে তলে শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। অন্যদিকে, পশ্চিম বাংলার মুসলিম লীগ এম.এল.এ.-রা ভোট দিতে পারবেন না, কারণ তারা হিন্দুস্তানে পড়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের দল হাশিম সাহেবের নেতৃত্বে ঘরে বসে আছেন, শহীদ সাহেবকে সমর্থন করবেন না। হাশিম সাহেব কোনো কর্মীকে নির্দেশ দিলেন না। অনেককেই নিষেধ করে দিলেন এবং তলে তলে বলে দিলেন, শহীদ সাহেবকে সমর্থন না করতে। শহীদ সাহেবের

এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন চেষ্টাই করছেন না। কাউকেই অনুরোধ করছেন না, ভোট দিতে। তাঁকে বললে, তিনি বলতেন, "ইচ্ছা হয় দিবে, না হয় না দিবে, আমি কি করব?"

শহীদ সাহেবের পক্ষে মোহাম্মদ আলী, জনাব তোফাজ্জল আলী, ডা. মালেক, মিস্টার সবুর খান, আনোয়ারা খাতুন, ফরিদপুরের বাদশা মিয়া, রংপুরের খয়রাত হোসেন কাজ করছিলেন। শহীদ সাহেবের দলের চিফ হুইপ মফিজউদ্দিন আহমেদ সাহেব গোপনে গোপনে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলে কাজ করছিলেন। মন্ত্রী জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (কুষ্টিয়া) চেষ্টা করছিলেন শহীদ সাহেবের বিপক্ষে। একমাত্র ফজলুর রহমান সাহেব, তখন মন্ত্রী ছিলেন, শহীদ সাহেবকে বলেছিলেন, তার পক্ষে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ভোট দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমার কথাটা ভাল লেগেছিল। যা হোক, এর পরেও শহীদ সাহেবের পক্ষে ভোট বেশি ছিল। শেষ পর্যন্ত সিলেট জেলার সতেরজন এম.এল.এ. কলকাতা পৌঁছাল, তারাও ভোট দিবেন। ডা. মালেক সিলেট গিয়েছিলেন, শহীদ সাহেবের পক্ষে কাজ করতে। তাকে সিলেটের এমএলএরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন শহীদ সাহেবের প্রোগ্রাম কি?

ডা. মালেক বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। ফল হল উল্টা, তিনজন এম.এল.এ. ছাড়া আর সকলেই ছিলেন সিলেটের জমিদার। তাঁরা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল বিল্টমোরে তাঁদের রাখা হয়েছিল। আমরা এদের শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধরে এনেছিলাম। শহীদ সাহেবের কাছে সিলেটের এম.এল.এ.-রা দাবি করলেন, তিনটি মন্ত্রিত্ব দিতে হবে সিলেটে। শহীদ সাহেব বললেন, "আমি কোন ওয়াদা করি না। তাদের যা প্রাপ্য তাই পাবেন। অন্যদিকে নাজিমুদ্দীনের পক্ষে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। দু'একজন ছাড়া সিলেটের এম.এল.এ.-রা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ভোট দিলেন, তাতে শহীদ সাহেব পরাজিত হলেন। যেদিন নির্বাচন হবে তার পূর্বের দিন রাত দুইটার সময়—আমি তখন শহীদ সাহেবের বাড়িতে, শহীদ সাহেব বারান্দায় শুয়ে আছেন। ডা. মালেক এসে বললেন, "আমাদের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, কিছু টাকা খরচ করলে বোধহয় অবস্থা পরিবর্তন করা যেত।" শহীদ সাহেব মালেক সাহেবকে বললেন, "মালেক,পাকিস্তান হয়েছে, এর পাক ভূমিকে নাপাক করতে চাই না। আমার কাজ আমি করেছি।"[৭৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। সেগুলি হল- রাজনৈতিক দৃঢ়তা, নিরপেক্ষতা , ন্যায়পরায়নতা, উদারতা ইত্যাদি। সোহরাওয়ার্দীর এই উচ্চ রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলো সবথেকে বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যিনি, তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের মনে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন। তাকেই বৃক্ষে রূপান্তরিত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে। বর্তমানে বিশ্বের মানচিত্রে এই রাষ্ট্রটি বটবৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার উপর রাজনৈতিক নিপীড়ন ও বঞ্চনা স্থায়ি ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি নগ্ন পরিকল্পনা কার্যকর করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণাকে পঙ্গু করে দেওয়া। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির প্রধান পরিচয়। তাই তারা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠী ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য

[৭৬] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ৭৬-৭৭।

কোনো ভাষা নয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, ছাত্র-যুবক রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছাত্রনেতা শেখ মুজিব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে আন্তরিক প্রয়াস চালান।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় যে প্রবল ভাষা আন্দোলন দেখা দেয় শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। শেখ মুজিবুর রহমান এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে সেই আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই সময় তিনি ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে। কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে শেখ মুজিব অনশন আন্দোলনে সামিল হন।[৭৭]

দেশবিভাগের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিম গোষ্ঠীর একদল ছাত্র যারা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত তারা ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে এসে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। এই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগের এই প্রগতিশীল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কার্যালয় ছিল ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে। ১৯৪৪ সাল থেকেই আবুল হাসিম ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটান। কুচক্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক চর্চা আবুল হাসিমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আরো নতুন নতুন ছাত্র যুবক ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে আসার ফলে ১৫০ নম্বর মোগলটলি হয়ে ওঠে প্রগতিশীল চিন্তার পীঠস্থান। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল চিন্তার প্রসার বিচলিত করে তোলে খাজা নাজিমুদ্দিনকে। খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল গোষ্ঠীকে শক্ত হাতে দমন করার প্রয়াস চালান। ভয় ভীতি ও শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভন উপেক্ষা করে বহু ছাত্র যুবক ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে এসে জড়ো হতে থাকে। মুসলিম লীগ ও শাসকগোষ্ঠীর জনবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে নব প্রজন্মের কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই ১৫০ নম্বর মোগলটলি থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে কমরুদ্দীন আহমদের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "১৯৪৮ সালের শুরু থেকে ধীরে ধীরে ওয়ার্কাস ক্যাম্পের ছাত্রকর্মীরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এর কারণ বিশ্লেষণে কমরুদ্দীন আহমদ বলেন "শেখ সাহেব শামসুল হকের তুলনায় সে যুগে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ছিলেন- তিনি প্লেটোর মতো আকাশে তাকিয়ে থাকার প্রতিমূর্তি ছিলেন না। তিনি সেই যুবক বয়সেও অ্যারিস্টটলের মাটির দিকে বাঁকিয়ে থাকা প্রতিমূর্তির মতো ছিলেন। আদর্শের চাইতে দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। শেখ সাহেব তত্ত্বের বা মতবাদ প্রচারের চেয়ে বাস্তবজীবনের সংগ্রামে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তাত্ত্বিক আলোচনায় সময় ব্যয় না করে কর্মরত থাকায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর চোখে মুখে একটা দীপ্তি ছিল। কর্মীদের মধ্যে, ভবিষ্যৎ যে তাঁর মুঠোয় আসতে বাধ্য সে বিশ্বাস জন্মাবার ক্ষমতা

---

[৭৭] লিপি, নাসরীন জাহান, "ভাষা সৈনিক বঙ্গবন্ধু," তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), (ফেব্রুয়ারি, ২০২১): ১৭৮-১৭৯। https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pressinform.portal.gov.bd/page/a0eebc05_2c78_49cd_baf2_d7d7fbf783dc/2021-02-22-12-28-562c946da9d5bc8bf82369cde7fdcbfe.pdf।

তাঁর ছিল, যেসব কর্মী তাঁর সান্নিধ্যে যেত তাঁদের সঙ্গে একটা কল্পনার সুখী সমাজের স্বপ্ন সৃষ্টি করার শক্তি ছিল।"[৭৮]

১৫০ নম্বর মোগলটলির আবুল হাসিম ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মীরা গনতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা কালে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সংগঠনটি "তৎকালীন পূর্ববাংলায় আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তনের" সূচনা করে, ছাত্রযুব কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে এবং যা গঠনে শেখ মুজিব তাঁর সমমনা তরুণদের সঙ্গে মিলে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা হলো গণতান্ত্রিক যুবলীগ। প্রকৃতপক্ষে, এই সংগঠনটির বীজ রোপিত হয় ১৯৪২ সালে কলকাতার সিরাজদ্দৌলা হলে। শেখ মুজিব, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লা কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রমুখ তৎকালীন ছাত্র ও যুবকর্মীরা পাকিস্তানে এবং বিশেষ করে পূর্ববাংলায় তাদের রাজনীতির ধারা ঠিক করার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। "পূর্ববঙ্গ ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বৈঠকটি ছিল ঐতিহাসিক। কারণ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার উপযুক্ত সংগঠন গড়ার জন্য এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।" শেখ মুজিবসহ এই ছাত্রনেতারা ঢাকায় এসে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে ছাত্রযুব নেতা কমরুদ্দীন আহমদ,.শামসুল হক, তাজউদ্দীন আহমদ, নূরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। "আলোচনায় সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববাংলায় নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করা ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা একমত হন।"[৭৯]

গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের উদ্যোগকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এবং সরকার সমর্থক শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ব্যর্থ করতে সক্রিয় ছিল। যুবলীগের অন্যতম উদ্যোক্তা অলি আহাদ বলেন, ট্রাকে ট্রাকে মুসলিম লীগ বাহিনীর সম্মেলন বিরোধী অসৌজন্যমূলক শ্লোগানসহ ঢাকা নগর প্রদক্ষিণ ও সম্মেলন সম্পর্কে ঢাকাবাসীর মনোভাব ভুলিবার নহে। আমরা সেদিন ঢাকাবাসীদের দৃষ্টিতে ভারত কর্তৃক নিবেদিত পাকিস্তান বিধ্বংসী ভারতীয় চর বিশেষ ছিলাম।"[৮০] উপরে উল্লেখিত সম্মেলন থেকেই গণতান্ত্রিক যুবলীগের ৫-দফা ঘোষণা দেওয়া হয়। শেখ মুজিব এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তার ভবিষ্যৎ আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য এদেশের ছাত্র-যুব কর্মীদের সংগঠিত এবং উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আন্দোলনের দুটি দিক পরিদৃষ্ট হয়। এক: পূর্ববাংলার ছাত্র, যুবসমাজ ১৯৪০-৪৭ সালে ভারতের মুসলমানরা এক জাতি, অতএব তাদের জন্য এক রাষ্ট্র চাই- এই রাজনীতি তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মোহান্ধ ছিল। এই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা থেকে থেকে মুক্তির শুভসূচনা কলকাতার মুসলিম লীগ পার্টি অফিসে সৃষ্ট প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক ও বাহক ছাত্রযুব রাজনীতিকরা ঢাকায় এসে একটা গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের এবং সারা দেশে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করলেন। দুই: গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের মধ্য দিয়ে এদেশে একটা প্রগতিশীল

---

[৭৮] আহমদ, কামরুদ্দীন। *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ।* দ্বিতীয় খণ্ড। (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০২০): ১০৭।

[৭৯] হাননান, মোহাম্মদ। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)। প্রথম খণ্ড।

[৮০] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ২৯।

প্রতিবাদী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতির ধারার সূচনা হলো। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য বাঙালি জাতির একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পন করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য রাজনৈতিক ছাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর। তাই দেখা গেল পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই গুরুদায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। গনতান্ত্রিক যুব লীগের কোনো পরিপক্ক রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। প্রধানত এটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক একটি মঞ্চ। এই অবস্থায় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে একটি গনভিত্তিক পরিপক্ক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। তাই দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু ছাড়াও যারা এই প্রতিষ্ঠান গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুর রহমান চৌধুরী, জহিরুদ্দীন, নুরুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, কাজী আহমেদ কামাল, অলি আহাদ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের ফলে রক্ষনশীল মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে একটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার জন্ম হয়। এই সংগঠনটির ক্রিয়াকলাপ বাংলার রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনে। এই সংগঠনটির গুরুত্ব অনুভব করা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে একটি উক্তির মাধ্যমে, "তখন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ ।...আমরা ভাষার উপর এ আঘাত সহ্য করতে পারলাম না, তারই ফলশ্রুতিতে '৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র লীগের জন্ম হয়।"[৮১]

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ১৫০ নম্বর মোগলটলির কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে মিলিত হন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন নাজমুল করিম। এ সভাতেই পুরাতন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নাম থেকে 'নিখিল' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বিদ্রোহী গ্রুপটি "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ" নামে আত্মপ্রকাশ করে। নইমুদ্দীন আহমেদ ছিলেন এই সংগঠনটির অস্থায়ী আহ্বায়ক। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ কর্মীদের আত্মত্যাগ ছিল অবিস্মরণীয়।

বাংলার রাজনীতিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংগঠন শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগের জনবিরোধী কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে। কোনো অবস্থাতেই যাতে এই সংগঠনটি মাথা চাড়া দিতে না পারে তার জন্য লীগ কর্মীদের উপর নামিয়ে আনা হয় কঠোর নির্যাতন। জেল-জুলুম, সর্বক্ষণ গোয়েন্দা নজরদারি ও দুষ্কৃতীদের দ্বারা এদের কর্মসূচী গুলিকে বানচাল করে দেওয়া।

১৯৪৭ সালে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে ১৫০ নম্বর মোগলটলির কর্মী শিবিরে যোগদান, গন আজাদি লীগের কর্মসূচির প্রতি স্বতস্ফূর্ত সমর্থন, গনতান্ত্রিক যুব লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠনে

---

[৮১] বদরুদ্দীন উমর। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।* (শ্রাবন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯): ১৯৩।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন ও ধর্মঘট, কারাবরণ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গোপাল গঞ্জের টুঙ্গী পাড়ার শেখ পরিবারের এই ছেলেটি দ্রুত হয়ে উঠলেন জনপ্রিয় জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতা। বাঙালি জাতির উপর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নিপীড়ন ও বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে পরেন। তিনি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ১৯৪৯ সালের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫০ নম্বর মোগলটলির একদল প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও আদর্শের বিরুদ্ধে একটা বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই দলের কর্মসূচি হবে অসাম্প্রদায়িক, বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির দিশারী। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কর্মী সম্মেলনের জন্য খুব তোড়জোড় চলছিল। আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অফিস হয়েছে। শওকত মিয়া সকলের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করত। সে ছাড়া ঢাকা শহরে কেইবা করবে? আর একজন ঢাকার পুরান লীগকর্মী ইয়ার মোহাম্মদ খান সহযোগিতা করছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ খানের অর্থবল ও জনবল দুইই ছিল। এডভোকেট আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান এবং আনোয়ারা খাতুন এমএলএ সহযোগিতা করছিলেন। আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে। উল্লেখিত সম্মেলনে মুসলিম লীগ সম্পাদক চৌধুরী খালিকুজ্জামান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দের একাংশকে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনে বক্তব্য রাখেন। বোঝাই যাচ্ছিল তিনি এবং পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার প্রগতিশীল অংশকে 'বিদ্রোহী', পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রকারী' বলে মনে করতেন। এই সম্মেলনের প্রতিক্রিয়ায় ২৩ জুন টিকাটুলির কে এম দাশ লেনে অবস্থিত রোজ গার্ডেন হলরুমে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সম্মেলনে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনে নির্বাচিত তরুণ এম এল এ শামসুল হক 'মূল দাবি' নামক একটি লিখিত পুস্তিকায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত, জনগণের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেন। সারা দেশ থেকে শ'তিনেক প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। ঐ দিনই গঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। মওলানা ভাসানী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন দলের সভাপতি; তারপর সকলের

সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটির নাম ঘোষণা করেন। কমিটিটি নিম্নরূপ:[৮২]

মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী)- সভাপতি; আতাউর রহমান খান, এডভোকেট- সহ-সভাপতি; সাখাওয়াত হোসেন, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স, সহ-সভাপতি; আলী আহমদ খান, এম. এল.এ- সহ-সভাপতি; আলী আমজাদ খান, এডভোকেট- সহ-সভাপতি; আবদুস সালাম খান, এডভোকেট, সহ-সভাপতি; শামসুল হক- সাধারণ সম্পাদক; শেখ মুজিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক; খন্দকার মোশতাক আহমদ- সহ-সম্পাদক; এ, কে, এম, রফিকুল হোসেন- সহ-সম্পাদক; ইয়ার মোহাম্মদ খান- কোষাধ্যক্ষ। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু উক্ত কমিটি সম্পর্কে বলেন, "১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমি যখন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারগারে বন্দি তখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আমাকে যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন।"[৮৩] নূতন সংগঠনের নামকরণে 'মুসলিম' শব্দটি রাখা হবে কিনা তা নিয়ে কিছু মতভেদ ছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যতম প্রতিনিধি অলি আহাদ এ সম্পর্কে লিখেছেন: "সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে আমি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার দিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন করিবার প্রস্তাব করি। দেখা গেল আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত আর সকলেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের ঘোর পক্ষপাতী।"[৮৪] এ সম্পর্কে দলের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের বক্তব্য নিম্নরূপ: এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখন আমাদের সংগঠনটিকে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের রূপ দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি জনগণের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ইসলামকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে। এ ছাড়া মুসলিম লীগ যে-বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে তা থেকে জনগণ তখনও সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে যদিও আমাদের সংগঠনটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ দেওয়া সম্ভব ছিলো তথাপি তা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হতো।[৮৫]

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠনকালে "শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে আটক থাকিবার দরুণ ২৩ জুন (১৯৪৯) রোজগার্ডেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। আমরা জনকয়েক সদ্য কারামুক্ত ছাত্রের প্রস্তাবেই তাঁহাকে একমাত্র যুগ্ম সম্পাদক করা হইয়াছিল।"[৮৬] ১৯৪৯ সালের ২৭ জুলাই শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক অসুস্থ হবার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অজ্ঞতা ছিল সীমাহীন। জেল থেকে মুক্তির পর থেকে শেখ মুজিব মুসলিম আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা

---

৮২ মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৮০।

৮৩ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫।* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪):৭৩।

৮৪ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫।* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪):৭৩।

৮৫ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫।* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৮০।

৮৬ Afzal, Rafique. *Political Parties in Pakistan: 1947-1958.* Islamabad: National Commission on Historical and Cultural Research, 1976. P.49.

জোরদার করেন। শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জ, পুরাতন ঢাকা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি এবং ফরিদপুরে সংগঠন গড়ে তুলতে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগ- এর ১১টি জেলা এবং ১৮টি মহকুমা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিবাদে বেশ কিছু বড় ও মাঝারি ধরনের জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে। ১৯৪৯- এর ১৫ আগস্ট থেকে আওয়ামী লীগ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশ করতে শুরু করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আরমানিটোলা ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে জনসভা আর ১১ অক্টোবর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আরমানিটোলা ময়দানে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবিতে জনসভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভূখা মিছিল বের করা হয়। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান মিছিলে নেতৃত্ব দান করেন। এরপর মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে দুই মাস সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ঢাকায় ফেরার পর ১ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুই বছরের অধিক সময় কারাবরণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে তিনি মুক্তি পান। আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে পরিস্থিতির বর্ণনা করে শেখ মুজিব বলেছেন: ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয়। আওয়ামী লীগের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীদের পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এভাবেই আমাদের দিন কাটতে থাকে।[৮৭]

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কার্যত শেখ মুজিবুর রহমানই আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে সমগ্র প্রদেশ সফর করে সংগঠনের শাখা বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের অসুস্থতার কারণে তাকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয় ১৯৪৯ সালে দল প্রতিষ্ঠার পর। জেল-জুলুম, নির্যাতনের কারণে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব এই অবস্থায় দলকে সংগঠিত করে নতুন কাউন্সিল অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে প্রতিষ্ঠার চার বছর পর কাউন্সিল অধিবেশন বসে।[৮৮]

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলে সাংগঠনিক প্রতিবেদনে বলেন: "১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই দল গঠনের বিষয়টি ছিল নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের এক সমন্বিত প্রচেষ্টা। আমরা এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করি যে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব হবে সরকার-বিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গ্রহণ করা। আমরা যাতে ফ্রান্সের কনভেনশনপন্থীদের ন্যায় বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মতো কোনো পরিস্থিতির শিকার না হয়ে পড়ি

[৮৭] সাঈদ, আবু আল। *আওয়ামী লীগের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬): ১৫।

[৮৮] আহমদ, কামরুদ্দীন। *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*। (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ১৯৭৯): ৪।

সেদিকে যেন সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখি।"[৮৯] প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, উৎসাহী কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছাত্র ও কৃষকদের জন্য সাংগঠনিক সুযোগ-সুবিধার কথা দল বিবেচনা করবে।[৯০]

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ মুজিবের নিযুক্তি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না। "অসামান্য কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণেই মুজিব ভাসানীর সস্নেহ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পান। তাই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও খ্যাতনামা নেতার উপস্থিতিতে যুবক মুজিব দলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদের একটিতে অধিষ্ঠিত হন স্বীয় যোগ্যতায়।[৯১] বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

মৌলানা হামিদ খান ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রগতিশীল ছাত্র নেতাদের প্রচেষ্টায় দ্রুত আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে এই নির্বাচনের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার উদ্ভব ঘটে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মানুষ প্রথম মুসলিম লীগ ও শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ও জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি আওয়ামী মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা চালায়। মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে Left Democratic Party, Awami Muslim League, Nezam -e- Islami এবং Labour Party নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।

মৌলানা হামিদ খান ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেয় তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। এই ২১ দফার মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র-যুবক, হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের কথাও বলা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার। পূর্ব বাংলায় তৃণমূল স্তরের জনগনের কাছে ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যুক্তফ্রন্ট নেতারা সক্ষম হন।

---

[৮৯] আহমদ, কামরুদ্দীন। *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*। (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ১৯৭৯): ৪।

[৯০] ঘোষ, শ্যামলী। *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*। (ঢাকাঃ ইউপিএল, ২০০৭): ১৩।

[৯১] আবু আল সাঈদ। *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*। (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬): ৩২।

২১ দফার বিপরীতে কোনো শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করতে ব্যর্থ হয় মুসলিম লীগ। তাদের একমাত্র ইশতেহার ছিল, ইসলাম ধর্ম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি। তাই এই নির্বাচনে দেখা গেল মুসলিম লীগের কর্মসূচির প্রতি জনগণের কোনো আস্থা ছিল না। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির দিশা, তাই পূর্ব বাংলার মানুষ এই কর্মসূচিকে সাদরে গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, শোচনীয় পরাজয় ঘটে মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগ নির্বাচনে পেশি শক্তি প্রয়োগ, প্রশাসনের অপব্যবহার, অর্থ, মিথ্যা মামলা, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করেও নির্বাচনে জয়ী হতে পারলো না।

৮ই মার্চ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল যুক্তফ্রন্ট ৩০১ টি আসনের মধ্যে ২২৪ টি আসনে জয়লাভ করেছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ একাই পেয়েছিল ১৩৪ টি আসন এবং মুসলিম লীগের ভাগ্যে জোটে মাত্র ৯ টি আসন। প্রদত্ত ভোটের ৬১ শতাংশই আওয়ামী মুসলিম লীগের অনুকূলে আসে এবং মুসলিম লীগ পায় প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৪ শতাংশ।[৯২]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের টিকিটে গোপালগঞ্জ মহকুমার কুঠারিপাড়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই নির্বাচনে শেখ মুজিবের প্রতিপক্ষ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সম্পদশালী নেতা পাকিস্তান বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জুমান ঠান্ডামিয়া। ঠান্ডামিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবের জয় সহজ ছিল না। ঠান্ডা মিয়া অর্থবল, পেশিশক্তি, প্রশাসনের সহযোগিতা ইত্যাদি ব্যবহার করার পরও এই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করতে ব্যর্থ হন। প্রবল প্রভাবশালী এই নেতার বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের গনসমর্থন এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কিছুই ছিল না। মৌলানা ভাসানীর নির্দেশে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিকে পাথেয় করে শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিয়েছেন কুঠারিপাড়া কেন্দ্রের ভোটাররা। শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল ভোটে এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। ১০ হাজার বেশি ভোট পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর পান ১৯ হাজার ৩৬২, ওয়াহিদুজ্জুমান ১ হাজার ৫৬৯ ভোট। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আন্দোলনের লড়াইয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আত্মনিয়োগ করেন।[৯৩]

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে। এ.কে ফজলুল হক হন প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবুর রহমানও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য হন। যুক্তফ্রন্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই ২১ দফা কর্মসূচি ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করার দিকে অগ্রসর হয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় মুসলিম লীগকে

---

[৯২] Alam, Azmir. "United Front Election of 1954: The Struggle for Democracy." ResearchGate, June 2023. https://www.researchgate.net/publication/371731848_United_Front_election_of_1954_The_Struggle_for_Democracy. https://doi.org/10.5281/zenodo.8179355.

[৯৩] জয়েনউদদীন, খালেক বিন। "চুয়ান্নর নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিজয়।" নীরিক্ষা ২২৪, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ- এর গণমাধ্যম সাময়িকী (আগস্ট ২০১৯): ৩৭-৩৮।

হতাস করে এবং ২১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ঘটনায় এই দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। মুসলিম লীগ নেতারা শুরু করে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। যেন তেন প্রকারে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দেওয়াই এই দলের মূল কর্মসূচিতে পরিনত হয়। এই অবস্থায় সংবাদপত্রে একটি গুজব রটে যে এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তবে এর স্বপক্ষে তাঁরা কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রর্দশন করতে ব্যর্থ হন। এ.কে. ফজলুল হক এটা বোঝাতে ব্যর্থ হন যে তিনি বাঙলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। এই ভুয়ো খবরটিকে ব্যবহার করে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯২(ক) ধারা জারি করে তিন মাসের মধ্যেই ভেঙে দেয়। গৃহবন্দি করা হয় এ.কে.ফজলুল হককে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বহু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর ব্যাপক ধরপাকড় চলে। তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।[৯৪]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাসিমুখে গ্রেফতার বরন করেন। জেলে যাওয়ার পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে এই রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগনকে রুখে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান রেখে যান। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন, রেণুকে বললাম, "আবার আসলে বলে দিও শীঘ্র আমি বাড়িতে পৌঁছাব।" বিদায় নেওয়ার সময় অনেককে বললাম, "আমি তো জেলে চললাম, তবে একটা কথা বলে যাই, আপনারা এই অন্যায় আদেশ নীরবে মাথা পেতে মেনে নেবেন না। প্রকাশ্যে এর বাধা দেওয়া উচিত। দেশবাসী প্রস্তুত আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করে জেল খাটাই উচিত।"[৯৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার কারণে জীবনের এক চতুর্থাংশ দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল শাসকবর্গের কারাগারে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ১৮ বার কারারুদ্ধ করে এবং দুবার তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাঁকে তাঁর ৫৪ বছরের জীবনের ৪৬৮২ দিন কাটাতে হয়েছিল জেলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ৪৬৮২ দিন নয়, যখন তিনি কারামুক্ত অবস্থায় থাকতেন তখনও শাসকগোষ্ঠী তার গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি চালাতেন। ১৯৪৭ সালের পর বঙ্গবন্ধুকে শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত বিপদজনক বলে মনে করতেন। তার জন্যই ছিল গোয়েন্দা বিভাগের কঠোর নজরদারি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বস্তুগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৯৫৮ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনার এক নগ্ন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে ছিটেফোঁটা যে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, ধ্যানধারনা ছিল তার উপর কুঠারাঘাত করে সামরিক শাসক আইয়ুব খান স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আইয়ুব খান আর্থ-

---

[৯৪] Alam, Azmir. "United Front Election of 1954: The Struggle for Democracy." ResearchGate, June 2023. https://www.researchgate.net/publication/371731848_United_Front_election_of_1954_The_Struggle_for_Democracy. https://doi.org/10.5281/zenodo.8179355.

[৯৫] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী। (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২): ২৭১।

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মানবাধিকার গুলি কেরে নেন।

দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের অজুহাত দেখিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা এক অধ্যাদেশ বলে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ বরখাস্ত এবং অবৈধভাবে দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন।

ইস্কান্দর মীর্জা যে অধ্যাদেশ বলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানকে সামরিক বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার এবং সমগ্র দেশের চীফ মার্শাল 'ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয়। ফলে দেশে প্রকৃতপক্ষে কোনো আইনসভা, রাজনৈতিক দলের বৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা, শাসনতন্ত্র, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা রইলো না। সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক আইয়ুব খানের হাতে ন্যস্ত হয়।

পরিস্থিতি সম্পর্কে সোহ্রাওয়াদী উল্লেখ করেন, "রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবৃতিতে পাকিস্তানে বিদ্যমান সামগ্রিক সংকটের জন্য রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে পুরোপুরি দায়ী করেন এবং ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানে গণতন্ত্র তার অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সত্যিকারভাবে বলতে গেলে পাকিস্তানে কখনো গণতন্ত্র বিকাশের কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি।" পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপকভাবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বৈর-মানসিকতা দ্বারা চালিত ও তাড়িত পাকিস্তানি নেতৃত্ব দ্রুত শাসন, নেতৃত্ব ও মত পরিবর্তনে দ্বিধা করতেন না; এর পূর্বাপর বা ভবিষ্যৎ পরিণতির কথাও ভাবতেন না।

সামরিক শাসক আইয়ুব খান রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করে প্রচার করতে থাকেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দল ও এক অংশের আমলা কিছু ব্যবসায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত। তারা সজন পোষণে বিশ্বাসী, তাই পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইয়ূব খান পাকিস্তানের সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করেন। সোহরাওয়ার্দীর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আইয়ূব- এর হাত থেকে নিস্তার পাননি ব্যবসায়িরাও। বহু আমলাকে বরখাস্ত করা হয়। আইয়ূব খান ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র সেনাবাহিনী।

মহম্মদ আয়ূব খান একজন সামরিক শাসক থেকে বৈধ কর্তৃত্বমূলক শাসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান। এই উদ্দেশ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনার একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন ১৯৬১ সালের মে মাসে পাকিস্তানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করলেও আয়ূব খান তা গ্রহণ করেননি। তিনি তার স্বেচ্ছাচারি ক্ষমতাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি। এইভাবে আয়ূব খান পাকিস্তানের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন।[৯৬]

---

[৯৬] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ১৮৩।

আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ব্যবস্থা করা। নিচের দিক থেকে এই স্তরগুলি ছিল: (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) বা তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল: কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত। ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ সংখ্যক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বনিম্ন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত। তার মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১২০০ থেকে ১৫০০ জন ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দই মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democracy Member) বা সংক্ষেপে B.D. Member নামে পরিচিত হন। উভয় দেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী Electoral College হিসেবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৩ ভাগের ১ ভাগ সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত। তবে এই মনোনয়নের বিধান ১৯৬২ সালের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় বিলুপ্ত হয়। নির্বাচিত অধিক গণতন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ইউনিয়নের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ছাত্র-পুলিশের সহায়তায় তা ইউনিয়নে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ Conciliation Court- এর মাধ্যমে ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তির অধিকারী হয়। নিজস্ব কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য এটা জনসাধারণের ওপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপের ও তা আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে।

২. থানা কাউন্সিল: ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরবর্তী ধাপ ছিল থানা কাউন্সিল। থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের (পশ্চিম পাকিস্তানে তহশিল কাউন্সিল) চেয়ারম্যানবৃন্দ ও সমসংখ্যক থানা/তহশিল পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে থানা/তহশিল কাউন্সিল গঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। থানার সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি হন। তিনি মহকুমার প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন করাই ছিল থানা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

৩. জেলা কাউন্সিল : থানা কাউন্সিলের উপরে ছিল জেলা কাউন্সিল। এর জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৪০। তার অর্ধেক সদস্য ছিল জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বাকি অর্ধেক ছিলেন বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধেক জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে

থেকে মনোনীত করতেন। ডেপুটি কমিশনার জেলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। জেলা কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক- এই দুই ধরনের দায়িত্ব ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র অর্ডার- এর চতুর্থ তফশিলের প্রথম অংশে বাধ্যতামূলক কার্য এবং ২য় অংশে ঐচ্ছিক কার্যাবলির বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে । বাধ্যতামূলক দায়িত্বসমূহের মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪. বিভাগীয় কাউন্সিল: বিভাগীয় কাউন্সিল মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপ। এর মোট সদস্যসংখ্যা ৪৫ জন। মোট সদস্যের অর্ধেক ছিলেন সরকারি সদস্য। বিভাগের অন্তর্গত জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন সরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যের অন্তত অর্ধেক বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে মনোনীত। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা কাউন্সিলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।[৯৭]

জেনারেল আইয়ুব খান স্বৈরাচারী কায়দায় পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার কোনো গনভিত্তি ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, জনগন আইয়ুব খানের প্রতি ভিতসন্ত্রস্ত হয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করতো। তাই তিনি পাকিস্তানের জনগণের কাছে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য মৌলিক গনতন্ত্র চালু করার প্রয়াস নেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌলিক গনতন্ত্রের মাধ্যমে আইয়ুব খান তার স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। মৌলিক গনতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার কেড়ে নেন। তিনি মৌলিক গনতন্ত্রীদের নির্বাচক মন্ডলী হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভা (জাতীয় সভা)- র সদস্য নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন মৌলিক গনতন্ত্রীদের হাতে। কোনো জনসমর্থন না থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গনতন্ত্রীদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান জনগনকে ভয় পেতেন। তাই তিনি স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত গনতন্ত্রীদের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থিত করার প্রচেষ্টা নেন। তাই দেখা যায় আইয়ুব খানের স্বজন-পোষন ও উষ্কানির ফলে মৌলিক গনতন্ত্রীরা নিজেদের বিশেষ এক শ্রেণির মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে থাকেন। আইয়ুব খানও মৌলিক গনতন্ত্রীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তার হীন স্বার্থ সিদ্ধি করতেন।[৯৮]

আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কণ্ঠ রোধ করেছিলেন। গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ নামে পরিচিত সংবাদ মাধ্যমেরও কণ্ঠরোধ করেন। আইয়ুব খানের এই রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষের মতামত, বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপে ব্যথিত হয়ে ১৯৬৬ সালে কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কারাগারের রোজনামচা"- তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ইত্তেফাক দেখে মনে হলো ৭ই জুনের হরতাল সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ছাপাতে পারবে না বলে সরকার হুকুম দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আরও হুকুম দিয়েছিল, 'এক অংশ অন্য

---

[৯৭] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ১৫০-১৫২।

[৯৮] Jabeen, Mussarat. "Local Government System of Pakistan: An Analysis of Explained Goals of Basic Democracies of Ayub's Era." *Research Journal of Social Sciences* 19 (2021): 49-67.

অংশকে শোষণ করেছে এটা লিখতে পারবা না। ছাত্রদের কোনো নিউজ ছাপাতে পারবা না। আবার এই যে হুকুম দিলাম সে খবরও ছাপাতে পারবা না।' ইত্তেফাকের উপর এই হুকুম দিয়েছিল। এটাই হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! আমরা তো লজ্জায় মরে যাই। দুনিয়া বোধ হয় হাসে আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেখে! যে দেশে মানুষের মতামত বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে কেমন করে? যারা আজও বুঝছে না, জীবনেও বুঝবে না।

আমার ভয় হচ্ছে এরা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতেছে। আমরা এপথে বিশ্বাস করি না। আর এ পথে দেশে মুক্তিও আসতে পারে না। কিন্তু সরকারের এই নির্যাতনমূলক পন্থার জন্য এদেশের রাজনীতি 'মাটির তলে' চলে যাবে। আমরা যারা গণতন্ত্রের পথে দেশের মঙ্গল করতে চাই, আমাদের পথ বন্ধ হতে চলেছে। এর ফল যে দেশের পক্ষে কি অশুভ হবে তা ভাবলেও শিহরিয়া উঠতে হয়! কথায় আছে, 'অন্যের জন্য গর্ত করলে, নিজেই সেই গর্তে পড়ে মরতে হয়'।[৯৯]

পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বছরে সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তীব্র গন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই রকম গনবিষ্ফোরন পাকিস্তানে আর কখনো হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন, আয়ূব বিরোধী আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পূর্ব বাংলার মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তৃনমূল স্তরের জনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাই ১৯৬৯ সালের এই গন আন্দোলনকে ৬৯-এর গনঅভ্যুথান বলা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরো কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহবান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচী' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী। ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। এগারো দফার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেয়া হলো-

১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র-বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-

[৯৯] শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১৭): ৬২।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহি:বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহি:বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারের আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি; গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।[১০০]

ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী কাউন্সিল, মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক'ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে "(ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার.... দাবি করেন। মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন "জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।"

শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও রাজনৈতিক দলের ৮ দফা বাঙালিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ৬ দফা ও ৮ দফা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১১ দফার মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ছাত্ররা ছিলেন চালিকাশক্তি। তাই আমরা দেখি আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের শুরু করে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই দেখা যায় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশী নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারী ছাত্রদল এনএসএফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।[১০১]

আসাদের শহীদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল। লিখলেন কবি শামসুর রাহমান-

---

[১০০] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ১৮১।

[১০১] আহমেদ, সিরাজউদ্দীন। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০১): ২৩৫।

"আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা

সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;

আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন "এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি। পরদিনও ইপিআর পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খাঁরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস.এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফু।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফু ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানেও। লান্ডিকোটাল থেকে কিছু ছাত্র চোরাপথে আনীত কিছু পণ্য কিনে ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে জুলফিকার আলী ভুট্টো দৃশ্যপটে আসেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে, তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌঁছেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনসত্তরের ঘটনাবলী যা উনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিলো পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা গ্রহণ করেছিলো সহিংস রূপ।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিলো, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মত এর বিপক্ষে ছিল। মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সম্মত হলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এবং 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেননি। অন্তিমে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকা ফিরে এসে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ৬ দফা আদায় করে আসতে পারতেন। তা পারেননি বলেই বৈঠক ত্যাগ করেছেন। অসহযোগী যে কজন নেতাকে তিনি কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন- হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, ফরিদ আহমদ ও মাহমুদ আলী।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে হরতাল আহ্বান করা হয়। ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগে রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।[১০২]

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের সফল উত্থান হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয়নি। প্রাথমিক কারকরা প্রথম পর্যায়ে দোদুল্যমানতা, ভয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বে মনপ্রাণ দিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি। কিন্তু বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে যা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস মধ্যবর্তী কারকদের অগ্রসরমান অংশ সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যা সব সময় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটেনি। গোটা উনসত্তরের আন্দোলন ছাত্ররাই সংগঠিত করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে। অন্তিমে, মধ্যবর্তী কারক ও প্রান্তি কারকদের চাপে পড়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা বা বাংলাদেশ গঠনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে

---

[১০২] এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।* (ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৭): ৫১।

যাওয়ার ভার যাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিলো তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠলেন বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' নামে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি।

আয়ূব খানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শাসনব্যবস্থায় একগুচ্ছ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটায়। বাংলার মানুষ মনে করেছিলেন ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের উপরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাজনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটাবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আইয়ূব খানের তুলনায় ইয়াহিয়া খান কম স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাঁর আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবথেকে বেশি রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রুখে দাঁড়ান ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা সহ বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্কিত কর্মসূচির সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী ইশতেহার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে এলে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে দুহাত তুলে আশির্বাদ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই দল। এই ফলাফল হতবাক করে দেয় ইয়াহিয়া খান পরিচালিত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে। শাসকগোষ্ঠী একপ্রকার নিশ্চিত ছিল যে, এই নির্বাচনে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা এই নির্বাচনে কোনো দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেনি। শান্তিপূর্ণ ভাবেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তান ও সমগ্র পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ।

এই নির্বাচনে দেখা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০ আসন লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্স পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।[১০৩]

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড়ো সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ুব খানের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্স পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় 'পাখি শিকার' করতে আমন্ত্রণ জানালেন। 'পাখি শিকার' করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিলেন পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরি হয়েছিল।

---

[১০৩] Chaudhry, Sardar Muhammad. *The Ultimate Crime: Eyewitness to Power Games*. Lahore: Quami Publishers, 1997.

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেটি বাইরে বোঝাতে চাইলেন না। তাই তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসা এবং মমতার শহীদ দিবস উদযাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মাদনায়। শহীদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের সেই উন্মাদনা দেখে পাকিস্তান সেনাশাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন সংখ্যালঘু দলে, তার ক্ষমতার অংশ পাবার কথা নয়, কিন্তু তিনি ক্ষমতার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়েছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার স্লোগান: 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে মিলিয়ে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনির্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কারফিউ দেয়া হলো, ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙে পথে নেমে এল। চারিদিকে মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এল।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হলো।

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। মাওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে। ঠিক এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠালেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হলেন না। ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকেন, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে। যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, কিন্তু জনগণের বাধার কারণে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিল না। ২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো যোগ দিলন, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে তিনি আলোচনার ভান করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের থামানোর জন্যে ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউজ ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন 'আমার সোনার বাংলা' গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।

পরদিন ২৪ মার্চ, সারাদেশে একটি থমথমে পরিবেশ মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে ছিল।[১০৪]

গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে তিনি সন্ধেবেলা পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে বলেছিলেন, তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে![১০৫] গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা আছে সেই নীল নকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট[১০৬],সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে বাঙালি সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

---

[১০৪] মুহম্মদ জাফর ইকবাল। *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮): ৪-৭।

[১০৫] Robert Payne. *Massacre: The Tragedy at Bangla Desh and the Phenomenon of Mass Slaughter throughout History*. Bangladesh: Macmillan Company, 1973. P. 50.

[১০৬] Mir Shawkat Ali. *The Evidence.* Vol. 1. Somoy Prakashan, 2008. P. 196.

শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিল। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশী সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন।[১০৭]

ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাকিস্তান মিলিটারি সব বাঙালি অফিসারকে হয় হত্যা না হয় গ্রেপ্তার করে নেয়, সাধারণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রাখে। পিলখানায় ই.পি.আরদেরকেও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তারপরেও তাদের যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটি নিয়ে সারারাত যুদ্ধ করেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি এবং এই পুলিশবাহিনীই সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সত্যিকার একটি যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে গিয়ে ট্যাংক, মর্টার, ভারী অস্ত্র, মেশিনগান নিয়ে পালটা আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নিয়ন্ত্রণ নেয়।[১০৮]

২৫ মার্চের বিভীষিকার কোনো শেষ নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল। হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের নয়, সাধারণ কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশেপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে। এরপর তারা পুরানো ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে। ২৫ মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন।[১০৯] তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে

---

[১০৭] Lieutenant General Nasim, A.S.M. *Bangladesh Fights for Independence.* Columbia Prokashani, 2002.p. 557.

[১০৮] Safiullah, Kazi Mohammed. *Bangladesh at War.* Agamee Prakashani, 2015. P. 27.

[১০৯] Salik, Siddiq. *Witness to Surrender.* Oxford University Press, 1997. P. 75.

সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই বাংলাদেশর স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল, জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ তখনো ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর। তার মাটিতে তখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দানবেরা।

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়ার্ত নারী-পুরুষ-শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল তিনি যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছেন, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের মাঝে দখল করে নেবেন। কিন্তু বাস্তবে সেটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড়ো অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শোনান। এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নূতন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময়ে পাকিস্তান থেকে দুইটি ডিভিশন বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।[১১০]

---

[১১০] Lieutenant General Nasim, A.S.M. *Bangladesh Fights for Independence.* Columbia Prokashani, 2002.p.35-37.

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিক্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ.এ.কে.নিয়াজীকে সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি, যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।[১১১]

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কলেরা ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মানুষ মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই!

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নূতন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।[১১২] তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

---

[১১১] Azad, Salam. *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh.* Bookwell Publications, 2006. P. 180.

[১১২] ইমাম, এইচ.টি। *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী): ৬৩।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অবঃ) এম. আতাউল গণি ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে. এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর সি. আর. দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ. মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. এ. জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্যে, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না, নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং শফিউল্লাহ্ নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের অদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইলে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।[১১৩]

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলাযোদ্ধার একটি দল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক যুদ্ধে যোগ দেয়, যুদ্ধে যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো

---

[১১৩] ইমাম, এইচ.টি। *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী): ১৫৩।

কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না- এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্যে গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলাবাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে- তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের নিজেদের লেখা বইয়ে একটি ছোট কাহিনি এরকম: ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজশাহীর রোহনপুর এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। শত অত্যাচারেও সে মুখ খুলছে না। তখন পাকিস্তানি মেজর তাঁর বুকে স্টেনগান ধরে বললেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। নির্ভীক সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিকে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন করবে! এই হচ্ছে দেশপ্রেম, এই হচ্ছে বীরত্ব এবং এই হচ্ছে সাহস। এঁদের দেখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এই দেশটিকে তারা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না, আগে হোক পরে হোক, পরাজয় স্বীকার করে তাদের এই দেশ ছেড়ে যেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

জুলাই মাসের দিকে নূতন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার

সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয়, এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী, নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল, তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল!

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না!

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা 'মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।[১১৪]

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

---

[১১৪] Alam, Habibul. *Brave of Heart.* Academic Press & Publishers Library, 2006.

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করলেন। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিদার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ বাংলার উপর রাজনৈতিক বঞ্চনার সূত্রপাত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা-কর্মী, ছাত্র-যুবক, পূর্ব পাকিস্তানের উপর মুসলিম লীগ ও শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি পৃথক রাজনৈতিক মঞ্চ ও মতাদর্শ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক বঞ্চনার হাত থেকে সুরক্ষিত করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে বাংলার মানুষ একটি সুসংবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এই ভাবনা থেকেই গঠন করা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। মৌলানা হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রানপুরুষ বলা যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের কঠোর কঠিন আত্মত্যাগ, অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ দ্রুত একটি গনভিত্তিক সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্থানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয় এই দল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক দিক থেকে এতো গভীরভাবে আত্মসচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যা পূর্ব বাংলায় কখনো দেখা যায়নি। ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনতা মরনাপন্ন লড়াই করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে নয়, বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি পাগল মানুষ ব্যক্তি শেখ মুজিবকে নয়, বঙ্গবন্ধুকে তাঁরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। একে Mujibism হিসেবে গন্য করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান রনাঙ্গনে না থাকলেও বাঙালি জাতি শেখ মুজিবের নামেই যুদ্ধ চালিয়ে যান। এবং শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী পাক বাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন।

পাকিস্তান বিভক্ত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনার বিশেষ ভূমিকা থাকলেও প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বঞ্চনার কথাই বলা যায়। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের Assembly- র অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়ার ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাঙালি জাতি সার্বিক রাজনৈতিক মুক্তির জন্য নয় মাস ব্যাপী সংগ্রাম করে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গড়ে তুললো।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসনব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কঠিন এক আত্মত্যাগের ইতিহাস। অবিশ্বাস্য বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এত কম সময়ে মৃত্যু বরন করেছেন এত সংখ্যক মানুষ, যে নজির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। কার্ফূ অমান্য করে সেনাবাহিনীর গুলিতে অকাতরে প্রাণ হারায় বাংলা মায়ের মুক্তিপাগল অসংখ্য সন্তান। এই যুদ্ধে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান কোনো দিনই জানা যাবে না। তবে কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে গনহত্যার একটা সার্বিক চিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকে সংখ্যাটি ১০ লক্ষ, নিউ ইয়র্ক টাইমস (২২ ডিসেম্বর ১৯৭২) অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ লক্ষ, কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ।[১১৫] তবে বাংলাদেশে সরকারের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ন, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ দুপুর বেলা ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনতা সংকীর্ণ স্বার্থ ও মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, মানবাধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে রুখে দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর ভাষায়, ১মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় গভর্নর এ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে বরখাস্ত করা হয়। প্রাদেশিক সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খান বেসামরিক গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। জনতা বিমানবন্দর সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। বিক্ষুব্ধ জনতার বাঁধভাঙ্গা জলরাশির ন্যায় চারিদিক থেকে শ্লোগান দিতে দিতে হোটেল পূর্বানীর সামনে জমায়েত হয়। পল্টন ময়দানে জনসভায় জনতা যোগ দেয়।[১১৬] ২ মার্চ দৈনিক আজাদী পত্রিকার দুটি শিরোনামের দিকে তাকালে স্বতঃস্ফূর্ত গনবিক্ষোভের আঁচ সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শিরোনাম দুটি হলো-গতকাল বেতারে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র এবং গ্রামে গঞ্জে বিস্ফোরণ ঘটে। মিছিলে মিছিলে অগণিত ছাত্র-যুবক জনতার কণ্ঠে ক্রোধের দাবানল আবার উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের উত্তাপ ফিরাইয়া আনে। কোন দিক হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের মিছিল ছুটিয়া আসে তাহা খেয়াল রাখাই মুসিবত হইয়া পড়ে।"

-অপর সংবাদ (৩ কলাম) "জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত / গণ বিক্ষোভের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রাজধানী ঢাকা প্রকম্পিত।"

৭১-এর মুক্তি আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে বাঙালি অংশগ্রহণ করেছিল তার একটি উজ্জ্বল চিত্র ধরা পড়েছে জাহানারা ইমামের লেখায়। ইমামের ছেলে রুমির সঙ্গে কথোপকথনের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো, ...আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এখন আবার হেঁটে হেঁটে অদ্দূর যাবার দরকারটা কি? তুই তো

[১১৫] মুহম্মদ জাফর ইকবাল। মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস। (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮): ১৮-১৯।

[১১৬] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। ৭১-এর দশ মাস। (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭): ৯।

কোনো দলের মেম্বার নস। তোর এত সব মিটিংয়ে যাওয়া কেন?' রুমী বলল, 'এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা? এখন তো-এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে।'[১১৭]

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে,সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সকলেই মুক্তি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তবে যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে তারা অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বাঙালি উপহার পায়, সেই কৃতিত্ব কোনো দল কোনো নেতা একক ভাবে দাবি করতে পারে না। এই কৃতিত্ব সাড়ে সাত কোটি বাঙালির। যদি এই কৃতিত্ব কাউকে প্রদান করতেই হয়, সেটা হলো পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র শক্তির। ছাত্র শক্তির চাপেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে মুক্তি পাগল ছাত্রসমাজ মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছাত্র সমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কোনো নেতা ও কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল না। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুচ্ছ করে সেনাবাহিনীর গুলির সামনে বুক পেতে দেয় মুক্তিকামী ছাত্ররা। মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না, থাকলেও জনমনে সেই দলের প্রভাব ছিল খুব সামান্য। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সবথেকে প্রভাবশালী জনপ্রিয় দল ছিল আওয়ামী লীগ। নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। আওয়ামী লীগ নিজেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে এই দলটি জাতীয়তাবাদী ছিল না। এটা ধরা পড়েছে ভাষা সৈনিক আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা লগ্নের নেতা অলি আহাদের লেখায়। তিনি লিখেছেন, " আগরতলায় লক্ষ্য করি, আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও সমর্থক ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তবে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলগুলির সংকট চরম ও বর্ণনাতীত ছিল। আওয়ামী লীগ প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল ছিল না, ইহা ছিল বরং ক্ষমতা লিপ্সু, নীতি বিবর্জিত রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ মাত্র। তাই বলিয়া আওয়ামী লীগে যে কিছুসংখ্যক আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন না, তাহা নহে, তবে তাঁহারা ছিলেন ব্যতিক্রম"।[১১৮]

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ছাত্র সমাজের হৃদয়ে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ ইয়াহিয়ার জাতীয় সভার অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরে তা গনবিস্ফোরনের আকার নেয়। ছাত্ররা সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিভক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উন্মাদ হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট ও ৩ রা মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতালের ডাক দেন। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটা হলো শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের কর্মসূচির পাশাপাশি আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ

---

[১১৭] জাহানারা ইমাম। *একাত্তরের দিনগুলি।* (ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬): ১২।

[১১৮] অলি আহাদ। *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫।* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪০৫।

করে ছাত্র সমাজ। তারা ৩ রা মার্চ পল্টন ময়দানে সভা করেন। এই সভাতেই তারা স্বাধীনতার ইস্তেহার প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাও কি হবে তা নির্ধারণ করা হয়। মুহূর্তে এই পতাকা ছড়িয়ে পড়ে সারা ঢাকায়। শেখ মুজিবের বাসভবনেও পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই আন্দোলন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের চরমপন্থী অংশ এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন না। তিনি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুক্তি পাগল ছাত্র সমাজ ও তার নিজের সংগঠন ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ প্রসঙ্গে মাসুদুল হকের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করে শেখ মুজিবর রহমান ধাপে ধাপে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে চূড়ান্ত শীর্ষে উপনীত করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু ছয় দফার ফাঁদেও আটকে যান। তারই নেতৃত্বের ছায়ায় নিখাদ জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা স্বাধীনতাকামী এক দফা পন্থীদের সরাসরি মুখোমুখি হন তিনি যখন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সংক্রান্ত বার্তাটি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পাবার পর শেখ মুজিবকে জানানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর এস এম আহসান ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাকে গভর্নমেন্ট হাউজে ডেকে পাঠান। গভর্নমেন্ট হাউজে গভর্নর আহসান শেখ মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডির বার্তাটি জানিয়ে দেন। আলাপ আলোচনা শেষে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে আসার আগ মুহূর্তে শেখ মুজিব গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেন: "আমার অবস্থা দুপাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসব।"

শেখ মুজিব যাদেরকে চরমপন্থী বলেছেন তারাই এক দফাপন্থী, তার দলেরই ভেতরকার দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপক অংশ-জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শোষণহীণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপক তরুণ সমাজ। এরাই নেয় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠনের প্রস্তুতি। তাই আজ এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা উচ্চকণ্ঠে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব একাত্তরের সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেই উচ্চকণ্ঠ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা, আওয়ামী লীগের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই তাকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনে। মূলত আওয়ামী লীগ ছিল তৎকালীন উদীয়মান বাঙালি ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর ছয় দফা ছিল সেই উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর বিকাশের সনদ। তাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনীতি ছিল ছয় দফার মাধ্যমে ভোট যুদ্ধে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া।[১১৯]

ছাত্রদের প্রবল চাপে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠন গুলির মধ্যে স্বাধীনতা সম্পর্কিত দ্বিধা দ্বন্দ্ব দুরে সরিয়ে রেখে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো স্বাধীনতাকে তাঁদের মূল রাজনৈতিক ইস্তেহার হিসেবে গ্রহণ

---

[১১৯] মাসুদুল হক। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০): ৩৪-৩৫।

করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১-র মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর বাঙালি কার্যত মানসিকভাবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বিভিন্ন মহল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। জনতা আশা করেছিল রেসকোর্স ময়দানে ৭ ই মার্চ এর বক্তৃতায় শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। কিন্তু দেখা গেল লক্ষ লক্ষ মানুষের এই সভায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না। শেখ সাহেবের এটা অজানা ছিল না যে, পাক সেনা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির উপর আক্রমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শেখ সাহেব ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র যুবকরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনো রকম আপোষ করতে রাজি ছিলেন না। তাদের মূল দাবি হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানকে বিভক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপরেশন সার্চলাইট নামক গনহত্যার খবর পেয়ে শেখ সাহেব সকল নেতাকর্মীকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেন অথচ নিজে আত্মগোপন করেননি। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে প্রায় বিনা বাক্যে শেখ সাহেব পাক বাহিনীর হাতে ধরা দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এইরূপ আচরণে হতবাক হয়ে যায় জনতা। বঙ্গবন্ধুর এক সময়ের সহযোদ্ধা অলি আহাদ উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস ছাড়া সব সময়ই শেখ সাহেব বিভিন্ন আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে আন্দোলন পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে হিংস্র পাক বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শেখ সাহেব সেনাপতি সুলভ দৃষ্টান্ত দেখালেন না। তিনি নিরবে ধরা দিলেন পাক বাহিনীর হাতে। অথচ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। অলি আহাদ আরো উল্লেখ করেছেন যে, শেখ সাহেব পূর্বেই তাঁর জীবনের পূর্ন নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছিলেন মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে। তাই হয়তো শেখ সাহেব পাক বাহিনীর কারাগারকেই নিরাপদ বলে মনে করতে পেরেছিলেন। অলি আহাদের অভিমত অনুযায়ী তাই হয়তো পাক সরকার বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে প্রতি মাসে ১৫০০ করে টাকা পাঠাতেন। কারণ, পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চটাতে চায়তেন না।[১২০]

এটা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। এই দলটির প্রতি মানুষের প্রবল আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন শেখ সাহেব। তাই মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর আক্রমনের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা। প্রায় সকল আওয়ামী লীগ নেতারাই ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো প্রায় কোনো আওয়ামী লীগ নেতাই ছিলেন না। দেশের অভ্যন্তরে থেকে নরপিশাচ পাক বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নয় মাস যুদ্ধ চালিয়েছে মুক্তি পাগল বাঙালি। বাঙলার দামাল ছেলেদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গেরিলা যুদ্ধ পাক বাহিনীর পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয়। রাজাকার আলবাদর ও পাক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়েও মুক্তি আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়নি বাঙালি জাতি। এটাই তো খাঁটি দেশপ্রেম। মুক্তি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এতটাই দুর্বল করে দিয়েছিল যে, মাত্র আট ডিভিশন সেনা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত করতে সক্ষম হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী।

---

[১২০] অলি আহাদ। *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৩৯৩।

পাকিস্তানের ছিল পাঁচ ডিভিশন সেনা। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এর তিনগুণ বেশি সেনা নিয়ে রনাঙ্গনে উপস্থিত হতে হতো ভারতকে। কিন্তু যেহেতু গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে পাক বাহিনীকে পূর্বেই দুর্বল করে দিয়েছে তাই আট ডিভিশন সেনা নিয়ে যুদ্ধে সামিল হওয়ার সাহস পায় ভারত।[১২১]

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদি উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তার পেছনে দুটি পরাশক্তি তাৎপর্য পূর্ন ভূমিকা গ্রহণ করে। একটি হল প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত আরেকটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দুটি রাষ্ট্র তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থিত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণাকে মদত দিতে থাকে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করে সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষপাতি ছিল না। অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত চায়ছিল পাকিস্তানের বিভক্তি। এই দুটি রাষ্ট্র নিজ স্বার্থেই এই অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভার মতো রাজনৈতিক দল ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নিতে পারেনি। তাই পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই সে চাইছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। এটি করার উদ্দেশ্যে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারত সরকার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর উপর বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করে। RAW লেগে পরে তার কাজে। পূর্ব পাকিস্তানে RAW-এর মদতেই গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। এই সংগঠনটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে। এবং সে সক্ষম হয় বহু ছাত্র যুবককে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এটা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারলে বাঙালি জাতির আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর চীনাপন্থী হয়ে ওঠেন। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে শুরু করেন। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত লাগে। এই অবস্থায় USA আইয়ুব খানকে উৎখাত করার প্রয়াস গ্রহণ করে এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মার্কিন প্রশাসন এক্ষেত্রে দুটি নীতি গ্রহণ করে, একটি হলো সামরিক চাপ আরেকটি হল রাজনৈতিক চাপ। সামরিক চাপ নীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানকে যুদ্ধের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ CIA-এর সামরিক তৎপরতা নীতির ফসল বলা যায়। CIA-এর সামরিক চাপের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে CIA-দ্বারস্থ হয় রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের। মাসুদুল হকের মতে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল CIA-র রাজনৈতিক চাপের ফসল।

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রচার করত যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তার উপর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান সুরক্ষিত হলে পূর্ব পাকিস্তানও সুরক্ষিত থাকবে। অথচ পাক ভারত

---

[১২১] মুহম্মদ জাফর ইকবাল। *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮): ১৫।

যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাসকগোষ্ঠী। এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম নেয়। এই অবস্থায় তাসখন্দ চুক্তি পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। যুদ্ধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তার উপর আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সহজভাবে বলা যায় বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রকট আকার নেয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কুক্ষিগত করেন আইয়ুব খান।এই জটিল পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু উত্থাপন করলেন বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। দেখা দেয় ১৯৬৯ সালে জনগনের শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তীব্র গন আন্দোলন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় না। এর প্রতিবাদেই মহম্মদ আলি জিন্নাহর স্বপ্নের পাকিস্তানের মৃত্যু ঘন্টা বাজে। এ বিষয়ে, মাসুদুল হক তার বিখ্যাত " বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ RAW ও CIA"-গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১২২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি আরো সহজভাবে বলা যায় ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার পেছনে ছিল অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির সংমিশ্রণ। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল দাবিদার বলে যে আত্মপ্রচার করেন তার সামনে প্রশ্নচিহ্ন এসে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোধ হয় আওয়ামী লীগের সবথেকে বেশি অবদান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যারা স্বাধীনতার জন্য মরনাপন্ন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের কিছুটা স্বস্তি প্রদান করা। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ভারত সরকারের সহায়তায় আওয়ামী লীগ একাত্তরের এপ্রিল মাসে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, বিশ্বজনমত নিজেদের অনুকূলে সংগঠিত করেছে, মুক্তি যোদ্ধাদের রসদ জুগিয়েছে সর্বোপরি প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের হাত ধরেই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সেনা পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এরফলে পাক সেনা দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তায়যুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকার সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে এক হাতে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, অন্য হাতটির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাইযদ্দীন আহমদ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা কেড়েও নিয়েছিলেন। মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে গোপন সাত দফা চুক্তি এই সাক্ষই বহন করে। ভারত ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে গোপন সাত দফা চুক্তি গুলির দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। চুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ–

১. প্রশাসনিক বিষয়ক: যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে শুধু তাঁরাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের শুন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

---

[১২২] মাসুদুল হক। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০): ১১-৩৮।

২. সামরিক বিষয়ক: বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

৩. বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী বিষয়ক: বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৪. ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক: সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

৫. বাণিজ্য বিষয়ক: খোলা বাজার ভিত্তিতে (open market) চলবে দু'দেশের বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের পরিমাণের হিসাব নিকাশ হবে বছর ওয়ারী এবং যার যা প্রাপ্য সেটা স্টার্লিং এ পরিশোধ করা হবে।

৬. পররাষ্ট্র বিষয়ক : বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদুর পারে ভারত বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সহায়তা দেবে।

৭. প্রতিরক্ষা বিষয়ক : বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারত।

এই সাত দফা চুক্তির দিকে তাকালে যে বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায় সেটি হল ভীরু দুর্বল চিত্তের মুজিবনগর সরকার ভারতের কাছে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন। মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাইজুদ্দীন আহমেদ আওয়ামী লীগের কপালে সাত দফা চুক্তির মাধ্যমে যে কলঙ্ক লেপন করেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তবে তিনি এ বিষয়ে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। এই গোপন সাত দফা চুক্তি প্রকাশ্যে এলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।[১২৩]

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের কম্যান্ডার লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী পরিপূর্ণ সামরিক কায়দায় ঢাকা বিমান বন্দরে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর জি ও সি-ইন-চীফ লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানালেন।[১২৪] সেখান থেকে এক সাথে গাড়ীতে করে তারা গেলেন রমনা রেসকোর্স' উদ্যানে। পাকিস্তানী বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল সেখানে ভারতীয় সেনাপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। বিকেল ৪টায় দুই জেনারেল পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঘটলো অবসান, আর সূচিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়।

পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ী বাহিনী বিজিত বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। একই সময় থেকে নিজ সীমানায় সরকারবিহীনভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের অভিযাত্রা। অরোরা সম্মিলিত

---

[১২৩] অলি আহাদ। *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৩৩-৪৩৪।

[১২৪] Salik Siddiq. *Witness to Surrender.* (Oxford University Press, 1997): 211.

বাহিনীর অধিনায়ক থাকা সত্বেও আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত মুহুর্তে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শেষ মুহূর্তে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার (পরবর্তীকালে এয়ার ভাইস মার্শাল) ভারতীয় কম্যান্ডারের সহগামী হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা সচিব সকলেই সেদিন ছিলেন কোলকাতায়। আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হবার পর জেনারেল অরোরা এবং এ, কে, খোন্দকার সেখান থেকে চলে যান এবং বাংলাদেশের প্রশাসনভার তখন চলে গেল পুরোপুরিভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হাতে।

এসময় বিরাজ করছিলো এক সংকটজনক অবস্থা। বাংলাদেশের পক্ষে যে সমস্ত নেতা সশস্ত্র সংগ্রামে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে তাদের যোগসূত্র ছিলো সামান্যই। দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণাও তাদের ছিলো না। দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে যেসমস্ত শত সহস্র যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সরকারের অনুপস্থিতিতে তারা নিজ নিজ এলাকায় বিস্তার করছিলেন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব। কাদের সিদ্দিকী, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ইতিমধ্যেই ঢাকায় পৌঁছে আউটার স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু সংখ্যক অবাঙালী নিধনের মধ্যে দিয়ে প্রতিহিংসার এক প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই একদল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাও রাজধানীর রাজপথে নেমে আসে ও রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে নিজেদের বিজয়ী দলের অঙ্গীভূত করে রাখার প্রচেষ্টায় রত হয়। কোলকাতায় অবস্থানরত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ সহ কেউই তখন দেশের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন না।

তবে আর যাই হোক, পাকবাহিনীর পরাজয়ের সাথে সাথে সারাদেশ বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরে উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কমপক্ষে ১০ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ রাজপথে নেমে আসেন। পাকবাহিনীর সুদীর্ঘ ৯ মাসের অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আনন্দে তারা ছিলেন উদ্বেলিত। একারণেই বিজয়ী সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি তাদের অভিনন্দন ছিলো পুরোপুরিভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত ।

সরকারী আমলা ও কারিগরী বিশেষজ্ঞে সুসজ্জিত একটি ভারতীয় উপদেষ্টা মহলকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য কয়েকজন বাংলাদেশী আমলা একই সপ্তাহে ঢাকায় আসেন ও ভারতীয় আমলাতন্ত্রের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র ধীরে ধীরে তার কাজ শুরু করে। ভারতে অবস্থানকারী নেতাদের এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের উপর বাংলাদেশ থেকে অব্যাহত চাপ দেয়া হচ্ছিলো, যেন তারা অবিলম্বে ঢাকা গিয়ে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি এ ধরনের চাপ দেয়া শুরু হয়েছিলো পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার আগেই। কিন্তু ভীরু মানসিকতা এবং সংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষ সংসর্গবর্জিত বলে নেতারা সমস্যাসংকুল এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। কেউই নতুন সরকারের দায়িত্ব নিতে উৎসাহ অনুভব করছিলেন না। শেষাবধি আত্মসমর্পণের প্রায় সাত দিন পরে কয়েক জন নেতা স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য কোলকাতা থেকে স্বদেশাভিমুখে ঢাকায় রওয়ানা হন।

বিতর্কিত এই সময়টিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক সদস্যদের প্রতি জনগণের আন্তরিকতার কোন অভাব দেখা দেয়নি। কিন্তু যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন তারা ভারতীয় আধিপত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না রেখে যারা কোলকাতায়

অবস্থান করছিলেন নতুন সরকারে তাদের অন্তর্ভুক্তি মুক্তিযোদ্ধারা মনে প্রাণে গ্রহণ করেননি। নয়মাসব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের সময়েই মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। যদিও চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সশস্ত্র সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা যায় না, এবং এর ছিলো না কোন স্পষ্ট আদর্শগত এবং দার্শনিক ভিত্তি, তথাপি এটাই ছিলো স্বাভাবিক যে, সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় এই মুক্তি- সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এমন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নতুন আদর্শ ও চেতনা বিস্তৃত হবে। কারণ তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ছিলো একটি মুক্ত ও স্বাধীন জন্মভূমির। নিজেদের প্রত্যাশা সম্পর্কে তারা ছিলেন সচেতন, কিন্তু কিভাবে তা অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাদের ছিলো না। আওয়ামী লীগ স্বয়ং সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণের অভিলাষ নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সমন্বয়ে মুজিববাহিনী গঠন করেছিলো। শেখ মনির ন্যায় নেতৃত্বর্গ প্রত্যক্ষভাবে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বের বিরোধিতা করে আসছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে স্বাধীনতা অর্জনের দিন থেকেই বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিলো এক প্রতিবিপ্লবের শিকার। এটা এই অর্থে যে, দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করেননি, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এর ফলাফলও হয়েছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

শেখ মুজিববিহীন অবস্থায় এবং কার্যকর একটি রাজনৈতিক সরকারের অনুপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশকারী 'ষোড়শ ডিভিশন' তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং প্রশাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকে। কেবলমাত্র ঢাকা শহর ব্যতীত কয়েক সপ্তাহব্যাপী দেশে প্রকৃতপক্ষে সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী রক্ষা না করলে এই সময়ে খুব সহজেই তাজউদ্দিন সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব ছিলো।[১২৫]

দীর্ঘ নয় মাস কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাক হানাদার মুক্ত যুদ্ধবিদ্ধস্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন বঙ্গবন্ধু। দীর্ঘ ২৪ বছরের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নীপিড়ন থেকে পূর্ব বাংলার মানুষ মুক্তির প্রত্যাশা করেছিল। সংকটময় এই পরিস্থিতিতে শেখ সাহেবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটায়। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ উপরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭১সালের ২৫ মার্চের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়া ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় সভার সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ অনুমোদন করে। শেখ মুজিবুর রহমান এই স্বাধীনতার সনদের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। স্বাধীনতার সনদটি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অনুমোদিত হলেও এটা বলবৎ করা হয় পেছনের তারিখ থেকে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গনপ্রজাতন্ত্রী সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। এই সনদ অনুসরণ করেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। মুজিব নগর সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎসও ছিল এই সনদ।

মুজিবনগর সরকার ঘোষিত স্বাধীনতার সনদটির গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ মনোনীত নির্বাচিত সদস্যরা অনুমোদন

---

[১২৫] মওদুদ আহমদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল।* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১-৪।

করেছিলেন এই সনদ। লক্ষনীয় বিষয় যেটি সেটি হল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জনতা ভোট প্রদান করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকেই বাঙালি জাতির আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবে আওয়ামী লীগ সরকার। অন্যভাবে বলা যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসন করার ক্ষমতা জনগন বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগকে দেয়নি। অথচ দেখা গেল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগ এককভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগকে এই আত্মপ্রচার করতে হয় যে তারাই ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তি।পাক হানাদার বাহিনী মুক্ত হওয়ার পর কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি অন্তর্বর্তী সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

শেখ মুজিব স্বাধীনতার সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রাপ্ত আইনগত ক্ষমতাবলে দেশের শাসনপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তদনুসারে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী একটি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। এভাবে বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ ১৯৭২-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের পেছনে যুক্তি দেখানো হয় যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিলো বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই উক্ত আদেশ জারী করা হয়েছে।

উক্ত আদেশের ৫নং ধারাবলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় এবং সনদে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির সমস্ত ক্ষমতা সংকুচিত করে তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয় নামমাত্র ক্ষমতা। আদেশের ৬নং ধারায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করবেন। এই পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ৭নং ধারায় বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা অর্জনকারী সদস্যদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন।

এই আদেশবলে শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। আদেশের ৮নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের কোন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবে। সাংবিধানিক পরিষদ (গণপরিষদ) সংবিধানের ভিত্তিতে এই স্থান পূরণ না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধারার আকর্ষণীয় একটি বিষয় ছিল এই যে, এখানে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির অধিকার ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত, শুধু সংসদ অথবা গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো না এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নিযুক্তি সহজ করে নেয়া হয়। সাময়িক আদেশের ৯নং ধারায় বাংলাদেশের জন্য একটি হাইকোর্ট গঠন করা হয় এবং ১০ নং ধারায় বলা হয় যে, বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং মন্ত্রিপরিষদ এই শপথনামা প্রণয়ন করবে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়াও সাময়িক সংবিধানে এমন কিছুসংখ্যক ধারার অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে যেগুলোর ফলে সাংবিধানিক শূণ্যতা অব্যাহত থাকে। গণপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে সনদ নীরব ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু সাময়িক আদেশ শুধুমাত্র গণ পরিষদের সংজ্ঞাই নিরূপণ করেনি, বরং এতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, গণপরিষদ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। অন্যভাবে বলা যায়, এর অর্থ ছিলো এই যে, জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের যেসকল সদস্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারী এবং মার্চ মাসের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাই সংবিধান রচনা করার জন্য গণপরিষদ গঠন করবেন। সনদের মাধ্যমে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো যে সময়ান্তরে গঠিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করানো হবে। সনদে যে কোন বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একধরনের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের কথা বলা হয়েছিলো এবং তাতে মন্ত্রিসভার কোন ধারণা উপস্থাপিত করা হয়নি। কিন্তু সাময়িক আদেশের মাধ্যমে গঠন করা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা।

যাই হোক, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পরিবর্তন করে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিবর রহমান প্রথমে বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েমকে সাময়িক সংবিধান আদেশের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারী সকালে তাঁর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করে সাথে সাথেই তিনি তারপদত্যাগ ঘোষণা করেন। পদত্যাগ ঘোষণার পর সাময়িক আদেশের ৮ নং ধারাবলে মন্ত্রিপরিষদ বিচারপতি আব্বু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধান বিচারপতি তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অতঃপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ সহ মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সামায়িক আদেশের ৭ নং ধারাবলে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। এ সময় শেখ মুজিব তার ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং ১০ নং ধারা বলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করান।[১২৬]

কিন্তু মুজিব রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? এর প্রথম কারণটি ছিলো রীতিমতো ঐতিহাসিক। বাংলাদেশের জনগণ ছিলো দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসিত হতে অভ্যস্ত এবং এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতের যে কোন স্থানাপেক্ষা বাংলাদেশে সূচিত হয়েছিলো অনেক আগে। নির্বাচিত আইনসভা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিলো প্রায় ৫০ বছর যাবত।[১২৭] দ্বিতীয়ত ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্নের পর থেকেই আওয়ামী লীগ ছিলো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৫৪ সালের ২১ দফা থেকে শুরু করে ১৯৬৮- ৬৯ সালের ৬ ও ১১ দফা পর্যন্ত প্রতিটি প্রধান আন্দোলনে এবং চূড়ান্তভাবে ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিব জনগণের কাছে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং দেশে প্রবর্তন করা হবে একটি সংসদীয় পদ্ধতি। সাময়িক সংবিধান আদেশ প্রণয়ন করে শেখ মুজিব এই ভেবে গর্ব অনুভব করেছিলেন যে, তিনি জনগণের কাছে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপদানে সফলকাম হয়েছিলেন, সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে

---

[১২৬] মওদুদ আহমদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল।* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৩।

[১২৭] Dr. Kamal Hossain, Bangabandhu and Bangladesh, London Radical Asia Books, (1977): 18.

জনগণের দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে। তৃতীয়ত যুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্বে অবস্থান করে তাজউদ্দিন আহমদ রীতিমতো ভারতপন্থী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কৌশলগত ও আন্তর্জাতিক কারণেই প্রচলিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ধরনের সরকার গঠন অধিকতর উত্তম হবে বলে শেখ মুজিব মনে করেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাময়িক সংবিধান আদেশের অন্য একটি দিকও ছিলো। যদিও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই এই আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তথাপি এর প্রকৃত ফলশ্রুতি ছিলো এই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিলো এক ব্যক্তির হাতেই। এটা ছিলো পদ্ধতির এমন একটা পরিবর্তন যা শেখ মুজিবকে তাঁর পদমর্যাদা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্জনে সক্ষম করেছিল। আইন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা তখন পর্যন্ত ন্যস্ত ছিলো প্রশাসন অর্থাৎ শেখ মুজিবের হাতে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও বাস্তবে সংসদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। সেখানে অবস্থিতি ছিলো এমন একটি মন্ত্রিপরিষদের যার সদস্যরা নিজের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ছিলেন না এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের কোন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিলো না। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহসহ সকল অধিকার ছিলো স্থগিত, হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় রীট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ, উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতের উপর হুকুমনামা জারী করা, নিষিদ্ধকরণ, ক্যুও ওয়ারেন্টো, নিম্ন আদালতে বিচারিত মকদ্দমার নথিপত্র প্রেরণার্থে উচ্চতর আদালতের তলবপত্র জারী ইত্যাকার কার্য সম্পাদনে হাইকোর্টের ক্ষমতা রহিত করে রাখা হয়।[১২৮]

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ, সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো হলোঃ (১) প্রশাসন সুষমকরণ; (২) ভারত প্রত্যাগত প্রায় এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন; (৩) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকদের নিয়ন্ত্রণ; (৪) যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং রেলসড়কের মেরামত; এবং (৫) জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প এবং অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করে তোলা। এছাড়াও বেশ কয়েকটি কারণে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানযোগ্য যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো সেগুলো হলো: (ক) বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থিতি; (খ) সীমান্তে চোরাচালান; (গ) যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিলো এমন দালালদের উপস্থিতি; এবং (ঘ) যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারী অবাঙালী এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের পাশাপাশি, সংগ্রামে সফলতা আসার পর দেশের জনগণের আচার আচরণে গগনচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছিলো। স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবের দায়িত্ব ছিলো দেশের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ন। এটা কোন একটি সহজসাধ্য ব্যপার ছিলো না।

এসমস্ত বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হবার পর তৎকালীন সরকার কোন আইনের মাধ্যমে বা কিভাবে তা সমাধান করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এবং তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কি হয়েছিলো, তা বিবেচনা করা একটা আলাদা গুরুত্ব বহন করে। নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচারের জন্য এসমস্ত আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কার্য'ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহার প্রণালী অবশ্যই

---

[১২৮] The High Court of Bangladesh Order, 1972 (CPO no. 5, 1972).

একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। দেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবেও এই ইস্যুগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবিধান ভালোভাবে অনুধাবন এবং নিরীক্ষণ করতে গেলে অবশ্যই এসমস্ত পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের সময় প্রণীত নির্বাচনী ইশতেহার ছাড়া আওয়ামী লীগের বিশেষ কোন সংজ্ঞায়িত সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিলো না। এমনকি নয়মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে যখন অধিকাংশ নেতা কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন, তখনো তারা দেশ স্বাধীন হবার পর উদ্ভুত পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করবেন, কিংবা দেশের অর্থনীতির পুণর্গঠন বা উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবেন, তার কোন রূপরেখা প্রণয়ন করেননি। কাজেই জাতীয় নীতি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষতা ছাড়াই, এবং সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়াই আওয়ামী লীগ নতুন একটি জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় রত হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রায় দেড়শত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিলো মৌলিক আইনের পর্যায়ভুক্ত। এদের মধ্যে ২৬টি আইন এবং পাকিস্তান আমল থেকে প্রচলিত অপর একটি আইন সংবিধানের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়, এবং সংবিধানের সাথে তাদের কোন অসামঞ্জস্যতা নেই বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এসমস্ত আইনের মৌলিক প্রকৃতি, এদের প্রেক্ষাপট এবং এগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া যথাযোগ্য নিরীক্ষণের দাবী রাখে। অন্যান্য আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসনব্যবস্থা অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য এক ধরনের রুটিন মাফিক, এবং এগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও ছিলো যৎসামান্যই।[১২৯]

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আদেশ, নির্দেশ,প্রকল্প ও আইন প্রনয়ন করেছিলেন সেগুলি কতটা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিল এর পেছনে আওয়ামী লীগ ও সরকারের উদ্দেশ্য কি ছিল এর সাফল্য ব্যর্থতা ও জনমনে এর প্রভাব কতটা ছিল এই সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সমকালীন সময়ের বিভিন্ন আইন, প্রকল্প ও আদেশ নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী উদ্যোগ নিম্নে আলোচনা করা হলো-স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সমস্ত আইন প্রনয়ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আইন হল পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন-১৯৭২। এই আইনে বলা হয়েছিল–

(১) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালকমন্ডলী অথবা ব্যবস্থাপকবৃন্দ কিংবা তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করছেন কিংবা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য উপস্থিত নেই, সরকার সে সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন;

(২) এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার এবং এগুলোর হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব সরকার মনোনীত ব্যবস্থাপকমণ্ডলী অথবা প্রশাসকদের হাতে কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

---

[১২৯] মওদুদ আহমদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল।* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৭-১৮।

(৩) ১৯৭২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১৬ নং-আদেশ (PO 16)-এর মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু দখল নয়, তার বিক্রয়ের অধিকারও সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়;

(৪) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কাছে কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাওনা থাকলে সে বিষয়ে সরকারের হিসাব চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(৫) PO 16-এর মাধ্যমে সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর সম্পাদিত সম্পত্তির যেকোন ইজারা বা চুক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত করতে পারতেন;

(৬) সরকারের হাতে কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখলিস্বত্ব যাওয়ার পর আদালত এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না;

(৭) সরকার ভুলক্রমে কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা PO 16 তে রাখা হয়।

(৮) PO 16-এর মাধ্যমে 'শুধুমাত্র পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপরই নয়, দেশের নাগরিকদের যে কোন সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারেও সরকারকে অনন্য সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়'।[১৩০]

এই আইনের অধীনে বিভিন্ন মামলার শুনানি চলাকালীন আইনটি সম্পর্কে আদালত বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে। দেখা যায় দ্রুত এই আইনটি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে সেই সঙ্গে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

পরবর্তী সময়ে সরকার তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ APO-১ এর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ১৬ নম্বর আদেশ অর্থাৎ PO-১৬ যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে পরিচিত সম্পদ গুলির ওপর সরকারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে নেমে আসে এক অশনি সংকেত। বিচার বিভাগের সীমিত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা দিয়ে আদালত চেষ্টা করেছে মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আদালতকে রীট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় ১৯৭৩ সালে। এছাড়াও বিচার বিভাগের জটিলতার কারনে অনেক মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়েছে। পাশাপাশি বহু ক্ষেত্রে মানুষ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ভয়ে আদালতে যাবার সাহস পাননি।

যখনই যুদ্ধকালীন অবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং তা একটি নতুন জাতির অভ্যুদয়ের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন জনগণের অভিবাসন ও স্থানচ্যুতি সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে কমবেশী বিঘ্নিত করে এবং পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তখন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটা ধরে নেয়া হয় যে, প্রতিটি আইন জনগণের মঙ্গলার্থেই প্রণয়ন করা হয় এবং এক্ষেত্রে পিও ১৬-র একটি অর্থবহ উদ্দেশ্য ছিলো বলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে। তবে একটি আইন কতটুকু মঙ্গলজনক হবে, তা সেই আইন বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। পি ও ১৬-র ন্যায় আইনগুলোর মাধ্যমে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হলে পক্ষান্তরে তা জনগণের আর্থ সামাজিক

---

[১৩০] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৬৮।

জীবনযাত্রার উপর নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য এর প্রতিক্রিয়া ছিলো আরো ভয়াবহ।

আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার না থাকায় এর প্রয়োগবিধি ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একশ্রেণীর লোকের জন্য লুটপাটের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এই আইন বেপরোয়াভাবে ব্যব-হারের সুযোগ থাকায়, যারা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তিই নয়, এমনকি যারা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এমন অনেক মালিকের সম্পত্তিও দখল করে নেয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আইন এক ধরনের লোকের জন্য সম্পত্তি অর্জনের উৎস হিসেবে বিরাজ করতে থাকে।

পিও-১৬ বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকারী আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা এবং উচ্ছৃংখলতার সুযোগে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন হিসেবে আওয়ামী লীগ কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই আইন অপরের সম্পত্তি আইনের আবরণে লুট করার সুযোগ এনে দিয়েছিলো। ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা-কর্মীরা সরকারের ভীতসন্ত্রস্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন এবং পক্ষান্তরে তাদেরই সাহায্য নিয়ে সরকারের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা তাদের লুটের অংশীদারে পরিণত হন। এমনও দেখা গেছে যে, নিছক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক শত্রুতাবশে মালিক উপস্থিত জেনেও একজনের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে নেয়া হয়েছে। যে সমস্ত অবাঙালী ভারতীয় বা বিহারী বহুবছর আগে বাংলাদেশে মাইগ্রেশন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেননি, ভীতি প্রদর্শন করে এমন প্রায় সকল অবাঙালীর সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে নেয়া হয়। রাজনৈতিক প্রতারকেরা তাদের বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।[১৩১]

প্রাথমিকভাবে কোন বিধান জারী করা হয়নি বলে ছোট বড় সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক, প্রশাসক এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে ঢালাওভাবে দলীয় নেতা-কর্মীদের অথবা রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত লোকদের নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়োগ করা হতে থাকে। অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী জ্ঞানবিহীন দলীয় নেতা-কর্মী অথবা প্রতিষ্ঠানের অধঃস্তন কর্মচারীদের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানী ব্যবসায়ী অথবা তাদের বিশ্বস্ত ব্যবস্হাপকদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য পাটকল, বস্ত্রকল এবং শত শত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ম্যানেজারের করায়ত্ত হয়। গোলযোগ, দুর্নীতি, লুট হয়ে দাঁড়ায় এর অনিবার্য ফল। সংঘবদ্ধ চোরাচালানীদের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দামী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, উৎপাদন দ্রুত নেমে আসে নীচের দিকে, যে কোন সুবিধাজনক মূল্যে এই সম্পত্তি বিক্রি বা বিনিময় করা হতে থাকে। প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ বা তার নামে ব্যাংকে রক্ষিত টাকা হিসাব-বিহীনভাবে চলে আসে ব্যক্তিবিশেষের হাতে। ফলে অচিরেই এ ধরনের অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিংবা সেগুলো বন্ধ বা বিক্রি করে দেয়া হয়। সম্ভবত এটা ছিলো এমনি একটি ক্ষেত্র, যেখানে

---

[১৩১] মওদুদ আহমদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল।* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ২৫।

মন্ত্রী, সরকারী কর্মকর্তা, ষোড়শ বাহিনীর সদস্য যাই হন না কেন, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ছিটেফোঁটাও ছিল কিনা সন্দেহ-তাদের আত্মীয়স্বজন, সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শেখ সাহেবের সরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটি হল ব্যাংক , বীমা সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তা বলে দাবী করতে থাকে। কাজেই শুধুমাত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণ দূর করার লক্ষ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশ প্রণয়নের মাত্র একমাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ২৫ শে মার্চ দেশের স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীর দিনে একটি দুঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপের ভিত্তিতে পাট, চিনিকল সমূহ, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করে আইন পাশ করা হয় এবং এর মাধ্যমে দেশের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ শিল্প, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এসমস্ত ব্যবসায়ের মালিকানার অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানীদের এবং ইতিমধ্যেই এগুলোর দখল পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের মাধ্যমে সরকারের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিলো। কাজেই এসমস্ত শিল্প বা সংস্থার দখলীস্বত্ব আর পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। শুধুমাত্র 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি' না বলে তখন থেকে এগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ব খাত বলে আখ্যায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি (পিও ১৬) আদেশের আওতায় সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর সামান্য হলেও অবকাশ ছিলো, এবং সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক সুবিচার প্রাপ্তিরও নিশ্চয়তা ছিলো। এছাড়া উচ্চতর আদালতগুলোও তাদের রীট জুরিসডিকশনের ভিত্তিতে সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতে পারতো। কিন্তু জাতীয়করণ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আবেদন পেশ করার অবকাশ ছিলো না, এবং এই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সরকারেরও কোন ক্ষমতা ছিলো না। সরকার কর্তৃক একবার কোন সম্পদ জাতীয়করণ করা হলে আর তা বিজাতীয়করণের কোন অবকাশ ছিলো না। শেখ মুজিবের ভাষায়, "যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো ছিলো সরকারের বিপ্লবী পদক্ষেপ" এবং নতুন গৃহীত এই নীতি "শ্রম ও মূলধনকে দ্বিধাবিভক্তকারী সকল চিরায়ত প্রথার" বিলুপ্তি ঘটানোর পথে এগিয়ে যাবে। সেদিন শেখ মুজিব জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সরকার আভ্যন্তরীণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করেন এবং সরকার ও তাঁর দল ছিলো দেশে একটি "বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠায় ওয়াদাবদ্ধ। শোষণ এবং অবিচারমুক্ত একটি সমাজ গঠনের প্রয়োজনে এবং একটি নতুন সমাজের গোড়াপত্তনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন যে, তার সরকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিগুলো ধাপভিত্তিকভাবে জাতীয়করণ করার নীতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১৩২]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে নির্মম আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালাতো তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্ক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যভাবে বলা যায় রাজনৈতিক দলগুলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য

---

[১৩২] মওদুদ আহমদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল।* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ২৬-২৭।

মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষনের অবসান ঘটানোর কথা বলে। তারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উপর জোর দেয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের দৌড়ে আওয়ামী লীগ ছিল শীর্ষে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর আওয়ামী লীগ সহজেই পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে পারত। কারণ শোষনের মূল উৎস ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করার পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালিদের শাসন। বোধয় আওয়ামী লীগ সকলের থেকে বেশি দেশপ্রেমিক ও নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এটা প্রমাণ করতে গিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সময় বিভিন্ন বামপন্থী দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জোরদার তৎপরতা শুরু করে। এদের প্রতিহত করা ছিল আওয়ামী লীগের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আওয়ামী লীগ সরকারের এই উদ্যোগ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশকে চরম আর্থ সামাজিক সংকটের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় ।

সরকার তার জাতীয়করণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাতে থাকে। দেখা যায়, বিভিন্ন মামলায় আদালত এই আইনটির দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে। বাংলাদেশ ইস্পাত সংস্থার চেয়ারম্যান বনাম জনাব মাসুদ রেজার একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট' উল্লেখ করেন যে, সরকার এত সহজে দেশের একজন নাগরিকের সম্পত্তি দখল করে নিতে পারেন না। আদালত এই বলে তকমা উত্থাপন করেন যে, প্রথম অবস্থায় একটি সম্পত্তি পরিত্যক্ত বলে যথাযথ বিবেচনা না করা হলে সরকার কর্তৃক তা দখল করার পদক্ষেপটি অবৈধ, অন্য কোন বিধানের মাধ্যমে এই কার্যধারা আইনসম্মত করে নেয়া যাবে না। কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি না হলে কেবলমাত্র ১০ (১) (ঘ) ধারাবলে একে কোন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তি করা যাবে না এবং জাতীয়করণ আদেশের ৪ নং ধারাবলে তা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আদালত আরো বলে যে, সরকার যদি জাতীয়করণ আদেশের ১০ (১) (ঘ) ধারাবলে কোন সম্পত্তি কোন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তি করতে পারেন, তাহলে একইভাবে কোন সম্পত্তি সেক্টর কর্পোরেশনের কব্জা থেকে মুক্তও করতে পারবেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তে এবং ১৯৭৬ সালের ১ নং অধ্যাদেশে এধরনের সম্পত্তি মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হলেও পরবর্তীকালে প্রণীত ৭ নং সামরিক আইনের ভিত্তিতে এমনকি পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আইনের ভিত্তিতে বা যেভাবেই হোক, পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিচালনার উপর সরকারের নিরংকুশ অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[১৩৩]

আগেই বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেই দখলকৃত সম্পত্তি সমূহের এক বিশাল অংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিলো। পাকিস্তানীদের মালিকানাধীনসহ ব্যাংক শিল্পের ১০ শতাংশ এবং বীমা শিল্পের ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়ে সরকার নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা বোর্ড, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক অথবা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছিলো। সুতরাং জাতীয়করণ আদেশ তাৎক্ষণিক ভাবে এমন বাঙালী শিল্পপতিদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করে, যারা ছিলেন

---

[১৩৩] মাসুদ রেজার মামলা, ৩০শে জুন, ১৯৭৭.৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, পৃ ১৬৯ ও হালিমা খাতুন বনাম সরকার, ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, সুপ্রীমকোর্ট, পৃ ২০৮।

একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাট ও বস্ত্র কলের মালিক এবং বিশেষ করে পাটের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। যদি জাতীয়করণ করা না হতো তাহলে কিছু, সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে বাঙালী মালিকদের মালিকানায় থেকে যেতো এবং এর পরেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিল্প, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী এবং এভাবে গোটা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু জাতীয়করণ প্রকৃতপক্ষে ছিলো দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং এতে বাঙালী পুঁজিপতিরা দেশের রাজনীতির উপর প্রাধান্য রাখার কিংবা প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাননি।

এছাড়াও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতীয়করণ পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য কোন বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়নি। শিল্পের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইতিমধ্যেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিলো এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী অথবা তাদের প্রিয়ভাজনদের দ্বারা সেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছিলো। এগুলো যারা পরিচালনা করবেন তাদের ন্যূনতম বা নির্দিষ্ট যোগ্যতার কোন সীমারেখা রাখা হয়নি। উপরন্তু , আগে বা পরে যখনই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হোক না কেন, সেই সম্পত্তির কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা সরকারের হাতে ছিলো না। বাঙালীদের যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়, সরকার সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে পূর্বতন মালিকদের হাতে অর্পণ করেন (জাতীয়করণ আদেশ, ধারা ৮)।

এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অফিস স্থাপন, কর্মচারী নিয়োগ, এবং অন্যান্য সুযোগ সম্প্রসারণ ও কার্যকরভাবে চালনা করে সেগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে কর্পোরেশনগুলোর সুদীর্ঘ সময় লেগে যায়। এসমস্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়োগেও সরকারের অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তাছাড়া কর্পোরেশনগুলো গঠন এবং এতে লোক নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির প্রভাব দেখেও মনে হয়েছিলো যে, সরকারের জাতিগঠনমূলক উদ্যোগ এতে বাধাগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত ও জাতীয়করণকৃত সম্পত্তিগুলোর হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা একরকম ব্যাখ্যাবিহীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পত্তি লুট হয়, সেগুলোর দামী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল চোরাচালানের মাধ্যমে বাইরে পাচার হয়ে যায়। দুর্নীতি এক সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং এগুলোর বিপুল পরিমাণের মূলধন বেহাত হয়ে যায়। যে সমস্ত বাঙালী মালিকের হাতে প্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে চালানোর ভার দেয়া হয়, তারাও অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়ে এগুলোর উন্নয়ন সাধনে উৎসাহ অনুভব করছিলেন না। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়েই ব্যস্ত থাকেন, কারণ সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হওয়ায় তারা ছিলেন ক্ষুব্ধ। এভাবে এক পর্যায়ে এসে জাতীয়করণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসে, কালো টাকা শুধু বেড়েই যায় না, বহুগুণে বর্ধিত হয়ে তা ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে জনগণের সকল পর্যায়ের অর্থনৈতিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মুক্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয়করণ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মনে হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর অযত্ন ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা এর যথার্থতার বিরদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়েছে। এটা সত্য যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার কারণে এবং বিরাট সংখ্যার জনশক্তি পাকিস্তান চলে যাওয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলোকে যথেষ্ট ধকল সহ্য করতে হয়েছে। এর পরেও কথা থেকে যায় যে, এগুলো পরিচালনার ব্যাপারে সরকার ছিলেন দুর্বল এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আচরণও তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না।

কাজেই, জাতীয়করণ দেশের যতটুকু না ক্ষতি করেছে, আওয়ামী নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে জাতির জন্য দুঃখ কষ্ট ও অশুভ ফলাফল নেমে এসেছিল তার চাইতে বেশী। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রপ্তানী আয় নেমে আসে ৩৬.৩৮ শতাংশে। চিনির উৎপাদন ৭৯ শতাংশ, নিউজপ্রিন্ট ২৫ শতাংশ, ম্যাচ ৪ শতাংশ, সিগারেট ৬৫ শতাংশ, কাগজ ৭১ শতাংশ এবং পাটজাতদ্রব্যের উৎপাদন ২৪ শতাংশ হ্রাস পায় এবং এসময় কাঁচাপাট রপ্তানী আয় করা হয় লক্ষ্যমাত্রার দুই তৃতীয়াংশেরও কম। ১৯৭২-৭৩ সালে কেবলমাত্র পাটকলগুলো ২৫ কোটি টাকা লোকসানের শিকার হয়। মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের ৩৮৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭২-৭৩ সালে উন্নীত হয় ৬৯৬ কোটি টাকায় এবং উৎপাদনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ছিলো ক্ষীণ।[১৩৪]

একই দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ ঘোষণা করা হয়।[১৩৫] এই আদেশের ভিত্তিতে সমস্ত শাখাসমেত সর্বমোট ১২টি ব্যাংকের দখলীস্বত্ব সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোকে সমন্বিত করে নতুন নামে ছয়টি নবগঠিত ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। কি পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো পরিচালনা করা হবে এবং ব্যাংকগুলো কোন কোন কার্যধারা পরিচালনা করবে উক্ত আদেশে সেগুলো চিহ্নিত করে দেয়া হয়। পূর্বে বিদ্যমান সবগুলো ব্যাংক ভেঙে দেয়া হয় এবং জাতীয়করণ আদেশে ব্যাংকগুলো পরিচালনার জন্য অন্তবর্তীকালীন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অর্থাৎ এই আদেশ কার্য'কর হওয়ার সময় থেকেই বিদ্যমান পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ করে বাঙালী অধ্যুষিত পরিচালকমণ্ডলীর বিলুপ্তি সাধন করে একই দিনে পরিচালক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গের সকল কর্মকাণ্ড স্থগিত ঘোষণা করা হয় (ধারা ৩২)। এছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আদেশের বিপরীতক্রমে শুধুমাত্র শেয়ার দখল না করে ব্যাংকের সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়করণ করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার সময় সরকার জাতীয়করণ আদেশের মাধ্যমে সেগুলো পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক কর্পোরেশন গঠন করলেও এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ অব্যাহত থেকে গিয়েছিলো। পরিচালকমণ্ডলী গঠনের সময় সরকার ও আওয়ামী লীগের সদস্য বা সমর্থক এবং বোর্ডের পরিচালক হবার অযোগ্য অনেক ব্যক্তিকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কর্পোরেশনগুলোর মতো ব্যাংকগুলোর প্রশাসনযন্ত্র সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করতেও সকারের সুদীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ব্যাংক খাতেও অরাজকতা অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপে ব্যাংকের আইন এবং ঋণদান নীতি উপর্যুপরি লঙ্ঘন করা হতে থাকে। অভিযোগ রয়েছে যে, এসময় সত্যিকারের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাংকের সহায়তা লাভ করা ছিলো কঠিন, কারণ ব্যাংকগুলো মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছিলো। ব্যাংকগুলোতে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম এবং স্বজনপ্রীতির ফলে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে এসে ব্যাংক লুট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। সংঘবদ্ধ দলগুলো ব্যাংকের কর্মচারীদের সহায়তায় ব্যাংকের সিন্দুক ভেঙে নির্বিঘ্নে নগদ টাকা লুট করতে থাকে। দুর্বল প্রশাসন এবং ঘন ঘন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে

---

[১৩৪] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৩৫-৩৮।

[১৩৫] বাংলাদেশ বাঙ্ক (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২।

এধরনের ব্যাংক ডাকাতির কারণ ও প্রেক্ষাপট সনাক্ত করা যায়নি এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়নি কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ সরকারকে দুটি বিরাট রকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। একটি হলো পুনর্বাসন এবং অপরটি হলো পুনর্নির্মাণ এবং উন্নয়ন। পুনর্বাসনের সুবিশাল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি লোকের পুনর্বাসন এবং প্রায় ৪৩ লাখ বাসগৃহ নির্মাণ। এসমস্ত বাসগৃহ যুদ্ধকালীন সময়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় বা বিধস্ত করা হয়। এছাড়া যুদ্ধের কারণে গৃহহীন দুঃস্থ লোকের পুনর্বাসন, তাদের জমি, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করাও ছিলো সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব প্রধানত প্রশাসনিক নির্দেশে এবং নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করে এই সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এসময় সরকার জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য ও অর্থানুকূল্যে একটি ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেন এবং বেশ কয়েকটি দেশ থেকে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতম স্তর অবধি পুনর্গঠিত করেন এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে সরকারের নিজস্ব সংগঠনও সৃষ্টি করা হয়। একদিকে এই কাজটি ছিলো যথেষ্ট জটিল এবং কঠিন, অন্যদিকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জনশক্তি নিয়োগসহ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর এক সুদরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জাতীয়ভিত্তিক এই কর্মকান্ডে আওয়ামী লীগ অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে জড়িত করেনি। অন্যভাবে বলা যায়, তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতিও ছিলো সন্দিগ্ধ। চারদিকে বিরাজ করছিলো পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না এমন লোকদের প্রতি তারা ছিলেন সন্দেহপ্রবণ। তাদের এই মানসিকতার মূল্যায়ন করা কঠিন হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সব কিছু তারা রাখতে চাইতেন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এবং এভাবে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে চাইতেন শুধু নিজেরাই। চিরায়তভাবে এধরনের কাজ করে আসছিলো এমন স্থানীয় পরিষদ এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা বিশ্বাস করছিলেন না। তারা অভিযোগ করতেন যে, স্থানীয় সরকারের অনেকেই ছিলেন পাকবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য গঠিত শান্তিকমিটির সদস্য। কাজেই সরকার ত্রাণ কমিটি নামে নতুন এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন ঘটান।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সংগঠিত এবং পরিচালনার লক্ষ্যে তৎকালীন ত্রাণবিষয়ক মন্ত্রী কামারুজ্জামান ১৯৭২ সালের ৯ই জানুয়ারী গ্রাম থেকে শুর করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণকমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। প্রশাসনিক একটি আদেশের ভিত্তিতে সরকার ভারত প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্য জীবনযাত্রার সর্বস্তরের জনগণের সহায়তা কামনা করেন। সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য দেশের প্রাত্যকটি নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করা হয়। এভাবে সরকারী আদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে কমিটি গঠনের জন্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। গ্রামের

আয়তন এবং লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ৫ থেকে ১০ সদস্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো জনগণের কাছে পরিচিত ছিলো ত্রাণকমিটি হিসেবে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় কর্মীদের মধ্য থেকে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা এই ত্রাণ কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করেন। একই পদ্ধতিতে এবং প্রায় একই পন্থা অনুসরণ করে ইউনিয়ন, থানা এবং মহকুমা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়। জেলা পর্যায়ের কমিটিতে ছিলেন ৫ জন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যবর্গ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবর্গ কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করতেন। মহকুমা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন এই জেলা কমিটির একজন সদস্য। সরকারী লোকজনের মধ্য হতে পাঁচজন নন-অফিসিয়াল সদস্যকেও এই কমিটির অন্তর্ভুক্তি করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা জেলা কমিটির চেয়ারম্যানও নিয়োগ করতেন।

এই কমিটিগুলো সম্পর্কে নিম্নরূপে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

(১) কমিটিসমূহের ক্ষমতা ও কার্যবিধি ছিলো অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ।

(২) এই কমিটি গঠনের পেছনে আইনগত কোন সমর্থন ছিলো না। কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব এবং অধিকার ছিলো অনুল্লেখিত এবং প্রয়োগের অযোগ্য।

(৩) প্রতিটি পর্যায়ের কমিটিগুলোতে ছিলো আওয়ামী লীগের সদস্যবর্গর প্রাধান্য।

(৪) যেহেতু জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় নেতার সংখ্যা ছিলো নগণ্য (মাত্র একজন রাজনৈতিক দলের এবং একজন স্বতন্ত্র সদস্য), গ্রাম থেকে শুর করে জেলা পর্যন্ত চেয়ারম্যানসহ প্রতিটি কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের জাতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য অথবা তাদের মনোনীত ব্যক্তিগণ।

(৫) কমিটিগুলো ছিলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একটি সম্প্রসারিত অংশ মাত্র।

(৬) হিসাব এবং ইনভেন্টরির ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়ায় কমিটিগুলোকে দায়ী করার কোন বিধান ছিলো না।[১৩৬]

এসময় বাংলাদেশ অনুদান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ১০০ কোটি ডলার (বর্তমান হিসাবে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা) মূল্যের সাহায্য লাভ করে। এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ এবং নেতৃত্ব প্রদানের অভাব না থাকলে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই সুবিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করা খুব একটা খারাপ পরিকল্পনা ছিলো না। এভাবে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতি পুনর্গঠনের প্রথম ধাপেই এধরনের কমিটি গঠনের পদক্ষেপ সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনায় রাজনৈতিক এলিটদের প্রাধান্য প্রতিফলিত করে।

তবে পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা অবশ্যই ক্ষতিকর ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতারা নিজ নিজ এলাকায় কমিটি মনোনয়ন নিয়ে সত্বর ব্যবসায়ে নেমে পড়েন এবং ফলে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেকেই ছিলেন

[136] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৪১-৪২।

কমিটিতে নিজ নিজ লোক নিয়োগের পক্ষপাতী এবং ফলে নিম্নতম পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বত্র তাদের মধ্যে গড়ে উঠে বিভেদের প্রাচীর এবং সাংগঠনিক ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু এই কমিটিগুলো ছিলো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব করায়ত্ত্ব করার মাধ্যম বিশেষ, এতে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ফলে এই কর্মকান্ডের পেছনে সুপ্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উধাও হয়ে যায় এবং যথাযথ পরীক্ষণ ও তালিকা প্রণয়নের নিয়ম না থাকায় ত্রাণ সামগ্রীর এক বিরাট অংশ ব্যক্তিগত ভোগে চলে যায়। কোন হিসাবযোগ্যতা না থাকায় এভাবে দুর্নীতি সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এই হয়ে দাড়াঁয় যে, যিনিই কমিটির সাথে সংযুক্ত হন না কেন, নৈতিক দিকগুলো বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকেন। এভাবে সারাদেশে ত্রাণ কমিটিগুলো নিদারুণ কুখ্যাতি অর্জন করে। এর নেতিবাচক সমালোচনা আওয়ামী লীগকে বহুদিন পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে। আজ পর্যন্ত যেসমস্ত কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অপছন্দনীয় হয়েছে, ত্রাণ তৎপরতার অব্যবস্থা এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে, ত্রাণ কমিটিগুলো গঠিত হবার সাথে সাথে বিদ্যমান এবং অবলুপ্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালিটির ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের সংঘাত বাঁধে। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির একটি আদেশের মাধ্যমে স্থানীয় কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলো ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করা হয়েছিলো।

এই কমিটিগুলো ভেঙে দেয়ার পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো যে সেগুলো স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি ছিলেন না এবং তাই এগুলো ভেঙে দেয়ার জন্য পার্টির তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ আসছিলো। কমিটিগুলো যাতে তাদের কার্যধারা ঠিকমতো পালন করতে পারে সেজন্য আইনের বিকল্প বিধানও প্রণয়ন করা হয়। তদনুসারে সমস্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলোর বিলুপ্তি ঘটানো হয় এবং বিলুপ্তির সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রশাসক ও সদস্যদের উপর ন্যস্ত অধিকার রহিত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত, থানা কমিটিকে শহর কমিটি, জেলা কমিটিকে জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা হিসেবে নতুনভাবে নামকরণ করা হয় (ধারা-৩)। বিলুপ্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলো কাজ চালাবার জন্য এডহক ভিত্তিতে কমিটি গঠনের পক্ষেও আইনের ধারা প্রণয়ন করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত অথবা শহর কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় মহকুমা প্রশাসককে এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভা গঠনের ভার সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং শহর কমটিতে একজন করে চেয়ারম্যান এবং সরকারী ভাবে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে জেলা বোর্ড গুলোতেও একজন করে চেয়ারম্যান ও উপ-চেয়ারম্যান এবং সরকারীভাবে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এধরনের কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ে কাজ চালাবার জন্য ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও শহর কমিটির ক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান জেলাবোর্ড ও পৌরসভার জন্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের পদ সৃষ্টি করা হয় (ধারা ৪)। তবে এই আদেশবলে বিভাগীয় পরিষদ, থানা পরিষদ এবং ইউনিয়ন কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়নি।

এভাবে স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালটির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর বিলুপ্তি ঘটানো হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকার এব্যাপারে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আইনে মহকুমা অফিসারকে ইউনিয়ন ও শহর কমিটির এবং সরকারকে জেলা ও পৌরসভা কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হলেও এব্যাপারে সরকারীভাবে সুনিন্দিষ্ট নির্দেশনামা না আসায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সরকার নতুন প্রণীতব্য একটি আইনের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য তাৎক্ষনিক ভিত্তিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার আরো ঘোষণা করেন যে, আইন পরিষদের স্থানীয় প্রতিনিধি অন্যান্য স্থানীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে (এক কিংবা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত নিম্নতম স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়) প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক স্থানীয় আইন পরিষদ সদস্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হবে। মন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন যে, থানা পরিষদগুলো থানা উন্নয়ন কমিটি হিসেবে পুনর্গঠিত করা হবে। এগুলোতে থাকবে জনগণের প্রতিনিধি এবং সরকারের কোন প্রতিনিধি এতে থাকবেনা। জেলা বোর্ডে সমস্ত থানা থেকে প্রতিনিধি থাকবেন। মন্ত্রীর ঘোষণায় এর বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে শুধু বলা হয় যে, সরকার প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা এবং বেকার যুবকদের মধ্য হতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্য নিয়ে এক লক্ষ যুবকের সমন্বয়ে একটি গ্রাম কর্মী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। গ্রাম কর্মী বাহিনীর এই প্রস্তাব আইনের ভিত্তিতে গঠনের কথা বলা হয়নি এবং সেকারণে তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক ।

মন্ত্রীর বিবৃতির প্রেক্ষিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকারের পূর্বোক্ত মূল আদেশে একটি সংশোধনী আনা হয় এবং তাতে ৩নং ধারা পরিবর্তন করে সকল স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। ইউনিয়ন কমিটি এবং থানা পরিষদগুলোর যা আগেই বিলুপ্ত করা হয়েছিলো, যথাক্রমে নগর পঞ্চায়েত এবং থানা উন্নয়ন কমিটি হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়। সংশোধনীতে আরো বলা হয় যে, উপরোক্ত ধরনের কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহকুমা অফিসার নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান নগর পঞ্চায়েত এবং সার্কেল অফিসার নিযুক্ত চেয়ারম্যান থানা উন্নয়ন কমিটির কর্ম পরিচালনা করবেন।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসনিক কমিটি গঠনের জন্য পুরোপুরিভাবে ত্রাণ কমিটি গঠনের অনুরূপ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্যও ছিলো অভিন্ন এবং তা হলো স্থানীয় প্রশাসনকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। এর আগের পদ্ধতিটি ছিলো অগণতান্ত্রিক এবং পরবর্তীটিকেও গণতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। এভাবে সবধরনের স্থানীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণই আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটি গঠনের অর্থই ছিলো স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। এর ফলে আইন পরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। কমিটিগুলো গঠন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজ দলের কর্মীদেরই পরস্পরের প্রতি বিবদমান অবস্থায় আবিষ্কার করেন, যা ত্রাণ কমিটি গঠনের সময়ও ঘটেছিলো। ফলে ইতিমধ্যে গঠিত ত্রাণ কমিটিগুলোর সমান্তরালে নতুন করে বিরোধী

কমিটি গঠিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় সরকার শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের কমিটি গঠনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ২৬শে এপ্রিল ১৯৭২ তারিখ থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে কমিটি নিয়োগ সংক্রান্ত ৪নং ধারা পুনরায় সংশোধন করে বিভাগীয় পরিষদ ও ইউনিয়ন কমিটি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র একজন প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়া হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কৃষি সহকারী এবং তিনি না থাকলে তহশিলদারকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একইভাবে থানা কৃষি পরিষদ বা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এবং শহর কমিটিতে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এবং এধরনের অফিসার পাওয়া না গেলে মহকুমা অফিসার কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন অফিসারকে দিয়ে কাজ চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন কমিটি বা নগর পঞ্চায়েত কিংবা বিভাগীয় পরিষদ কারা পরিচালনা করবেন, সংশোধনীতে তার দিক নির্দেশনা ছিলো না।[১৩৭]

স্বাধীনতা অর্জনের পর সবচাইতে গভীর সমস্যা ছিলো তখনকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সুদীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই জনগণ কামনা করছিলেন অব্যাহত শান্তি, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, এক কথায় একটি স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু এই প্রত্যাশা অর্জন এত সহজ ছিলো না। পুলিশ বাহিনীতে ছিলো বিশৃঙ্খলা, সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশ রাইফেলস তখন পর্যন্ত সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, এবং অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীগুলোর প্রায় অস্তিত্বই ছিলো না। তাছাড়া দেশের সর্বস্তরের জনগণের হাতে ছিলো অসংখ্য ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। দালাল মুক্তিযোদ্ধা, মুজিববাহিনী, মুক্তিবাহিনী ধরনের শত শত সংগঠন, ব্যক্তি, পেশাদার দুর্বৃত্ত এবং ষোড়শ বাহিনীর সদস্য সকলের কাছেই ছিলো বেআইনী স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অস্ত্রের জোরে তারা দেশব্যাপী নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে চলছিলেন।

যেসমস্ত রাজনৈতিক নেতা মিলে সরকার গঠন করেছিলেন, তারা মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন না এবং সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি। যদিও তারা ভারতের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন, তথাপি সেগুলো তারা করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কোলকাতা থেকে। যেসমস্ত বীর যোদ্ধা নিজের জীবন বাজী রেখে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি নতুন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য যুদ্ধের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সেই মূল প্রবাহ থেকে নেতৃবৃন্দ ছিলেন বিচ্ছিন্ন। যুদ্ধশেষে জাতি পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার সুদৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসেন। নির্বাসিত সরকারকে আগেই সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনার মতো ঘোরতর সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে অর্থবহ কোন প্রস্তুতিই নেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছাড়া অন্যান্য নেতার মধ্যে কেউই এ বিষয়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেননি! তাজউদ্দিন আহমদের ইচ্ছে ছিলো এমন একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা, যেখানে তালিকাভুক্ত এবং তালিকা-বহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা এসে রিপোর্ট করবেন। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে সারাদেশে ক্যাম্প খোলা হবে; প্রথমেই তারা সেখানে নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন, এবং নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের জন্য

---

[১৩৭] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৪৪-৪৬।

সেই অস্ত্র পুণর্বণ্টন করা হবে। তখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতি গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করা হবে। তিনি আরো চেয়েছিলেন যে, মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ করা হবে। পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ বিশাল একটি সেনাবাহিনী গঠন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। তখন আরো চিন্তা করা হয়েছিলো যে, নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর সাথে সমন্বিত করা হবে, যাতে তারা জাতির উপর বহিঃস্থ যে কোন শত্রুর আক্রমণের মুখে সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে। তদনুসারে ১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারী তাজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিলো এই যে, মওলানা ভাসানীকেও এই জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছিল।

যাই হোক, দেশে ফেরার পর শেখ মুজিব জাতির নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তাজউদ্দিন আহমদ যেখানে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে সশস্ত্র গেরিলাদের অস্ত্র পুনর্বণ্টন করা হবে এবং এদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়ো জিত করবেন, শেখ মুজিব সেখানে প্রথম পর্যায়েই তাদের নিরস্ত্র করার পদক্ষেপ নেন। তাজউদ্দিন আহমদ কল্পিত একটি সমন্বিত জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করার পদক্ষেপ শেখ মুজিবের মনোযোগ অতটা আকর্ষণ করতে পারেনি। শেখ মুজিব জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাবটি একেবারে প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে বিষয়টিকে তিনি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিন্তা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১০ই জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব গণবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেন, যেন তারা ১০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা অফিসারদের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জাতির বৃহত্তম স্বার্থে তারা এই আহ্বানে সাড়া দেবেন। তিনি আরো বলেন, ঘোষিত ১০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও কারো কাছে অস্ত্র রয়ে গেলে, তা বেআইনি এবং অননুমোদিত অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি সরকারের জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের স্কীমের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতা, আগ্রহ এবং মেধা অনুযায়ী তাদের প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, উন্নয়ন এবং জাতি গঠনমূলক অন্যান্য সংস্থায় চাকুরী দেয়া হবে। এই স্কীমের উদ্দেশ্য ছিলো গণবাহিনীর সদস্যদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অধীনে নিয়ে আসা।[১৩৮]

শেখ মুজিবের মতে গণবাহিনী ছিলো মেধার এক অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত যারা ছিলেন জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ধরনের নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, মুক্তি সংগ্রামের নায়কেরাই বাংলাদেশের নতুন সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব দেবেন এবং বলেছিলেন যে অফিসার ও পুলিশ বাহিনীতে গণবাহিনীর সদস্য নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এভাবে উপরোক্ত স্কীমের উদ্দেশ্য ছিলো তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বহির্ভূত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামকালে প্রদর্শিত তাদের অনন্যসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনাকে উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করা, অবশ্য যদি তারা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা জাতীয় মিলিশিয়া শিবিরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করেন।

---

[১৩৮] মুজিবের বিবৃতি, জানুয়ারী ১৭, ১৯৭২, মর্নিং নিউজ, জানুয়ারী ১৮, ১৯৭২, ঢাকা।

শেখ মুজিবের এই বিবৃতি এবং জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাবিত এই রূপরেখা মুজিববাহিনীর কতিপয় সদস্যসহ সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হতাশ করে ফেলে। এই স্কীমের ঘোষণায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হন, কারণ তাদের কাছে এই স্কীমটি ছিলো চোখে ধূলো দেয়া মাত্র। তারা সন্দেহ করেন যে, সরকার চাকুরী ও প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে আসলে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে এই অস্ত্রশস্ত্র হাত করতে চাইছেন। তারা ভয় করতে থাকেন যে অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তারা নিজেদের বর্তমান ক্ষমতা হারাবেন এবং তাদের সমস্ত আশা ভরসা হবে পদদলিত। তারা দাবী করতে থাকেন যে, মুজিব যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের পাশে উপস্থিত ছিলেন না বলে তাদের মর্মবেদনা অনুভব করতে পারছেন না। শেখ মুজিবের সঙ্গে মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের আলোচনাসমূহে মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ্যভাবে তার বিবৃতির বিরোধিতা করেন এবং সরকারে তাদের স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা আরো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, বর্তমান নেতারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি বলে দেশ চালাবার যোগ্যতাও তারা অর্জন করেননি। এছাড়াও তারা যুদ্ধকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের যথার্থ ভূমিকা প্রকাশ করে দিতে থাকেন।

এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিলো না। জনগণের এক বিরাট অংশের হাতে অস্ত্র থেকে যাওয়ায় সরকার জনগণের উপর তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রয়োগে ব্যর্থ হন এবং মুক্তিযোদ্ধারা সরকারের অস্তিত্বের উপর এক অব্যাহত হুমকী হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে নিজেদের ভূমিকার কথা চিন্তা করে কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধাদের হুমকীতে নিদারুণ আতঙ্ক ভোগ করতে থাকেন। দালাল এবং অবাঙালীদের মধ্যে যারা যুদ্ধকালে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন, তাদের মধ্যেও ক্রমশ এই আতঙ্কবোধ সঞ্চারিত হয়। ফলে মন্ত্রীবর্গ এবং আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

অন্যভাবে বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা যা চাইছিলেন তা পুলিশের একটি চাকুরী মাত্র নয়। কেবলমাত্র দায়িত্ব পালনের কথা তারা ভাবছিলেন না। তারা ভাবছিলেন নিজেদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে সীমিত গন্ডীর পরিবর্তে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যবহার করা, যা হবে উৎপাদনমূলক এবং সৃষ্টিশীল। তারা চাইছিলেন জীবন বাজী রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার প্রাপ্য মর্যাদা। যারা পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, কিংবা যারা কোলকাতায় বসে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দাবী ঘোষণা করছিলেন, তাদের মর্যাদা মুক্তিযোদ্ধারা চাননি। এর ফলে ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্ত্র সমর্পণকারীরা বাদে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশালতম অংশ শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারী উদ্যোগে কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারও করা হয়, তবে তাদের সংখ্যা ছিলো কম। শেষ পর্যন্ত এক বেপরোয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শেখ মুজিব তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭২ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী মুক্তিবাহিনী এবং ২৭ শে ফেব্রুয়ারী মুজিববাহিনীসহ অন্যান্য সকল বাহিনী বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে তারা সরকারের সমান্তরালে যেন একটি পৃথক সরকার পরিচালনা করছিলো, সমকালীন সময়ের সরকারী সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে যার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কতকগুলো ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সামান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কতিপয় নির্দেশ এবং শেখ মুজিবের বিবৃতিতে উল্লেখিত চাকুরী, প্রশিক্ষণ এবং অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার মূল্যায়ন কিংবা তাদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা সাকুল্যে যা পেয়েছিলেন, সেগুলো হলো সরকারী এবং আধাসরকারী চাকুরীতে একটি কোটা, প্রমোশন, সামরিক সম্মান এবং একটি ফাউন্ডেশন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা ক্রমবর্ধমান বেকার সংকটের মুখে ছিলেন তারা এই অফার গ্রহণ করেন এবং কেবলমাত্র শত সহস্র সাধারণ লোকের সঙ্গে একই সারিতে অবস্থান করে একটি কেরানী, পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর একটি পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে কেবল তাদর পরিচিতিই বিস্তৃতির অতলে হারিয়ে যায় না, বরং একটি জাতি গঠনের যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, দেশে ফেরার পর তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাহিত হয়ে যায়।

সর্বশেষে বলা যায়, জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের জড়িত করার মতো কোন দার্শনিক চিন্তা কিংবা অভিব্যক্তি তৎকালীন সরকারের ছিলো না। যে উৎসাহ নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের সেই উৎসাহ জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়নি। সম্ভবত তার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। নিঃসন্দেহে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কিংবা তার পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রশ্নটি ছিলো প্রয়োজনীয়। কিন্তু অক্ষত একজন মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে এমন একটি সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছিলেন যা তার জন্য এনে দেবে একটি পেশাগত সন্তুষ্টি এবং যা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করবে। সর্বশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করা হয় সেটি হলো ১৯৭২ সালের ৭ই আগস্ট ঘোষিত বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যান ফাউন্ডেশন।[১৩৯] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ এবং তাদের পরিবার পরিজনের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য এই আইন জারী করা হয়। এই আইনবলে ফাউন্ডেশনের নামে একটি কর্পোরেশন গঠন করে ফাউন্ডেশন পরিচালনার জন্য একটি পরিচালচকমন্ডলী ও এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্দ করা হয় নগদ টাকার একটি তহবিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিচালনার ভারও ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়, যাতে করে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় দিয়ে ফাউন্ডেশনের কর্মতৎপরতা পরিচালনা করা যায়। এই আইনে কেবলমাত্র শহীদ বা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার পরিজনকে ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্য গ্রহণের উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই আইন সংশোধন করে দুঃস্থ ও আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারকেও ফাউন্ডেশনের সুযোগ সুবিধা পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। সংশোধনীর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের নতুন নামকরণ করা হয় ট্রাস্ট এবং পরিচালকমন্ডলীকে রূপান্তরিত করা হয় বোর্ড অব ট্রাস্টি-তে। আইনবলে একে একটা দাতব্য সংস্থা হিসেবে পরিগণিত করা হয়।

ইতিমধ্যে সরকার ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব শিকড় গেড়ে বসে এবং অস্ত্র সমর্পণের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি মুজিবের নিজের দলের অনেক সদস্যও অস্ত্র সমর্পণ করতে

---

[১৩৯] বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যাণ ফাউণ্ডেশন আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪, ১৮৭২), ৭ই আগস্ট, ১৯৭২।

অস্বীকার করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, তাদের সকল প্রতিপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করার আগে নিজেদের অস্ত্র সংবরণ করাকে তারা নিরাপদ বলে মনে করছেন না। এছাড়া এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা এবং দালাল বাহিনীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বও সংকটের নতুন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যুদ্ধ শুরু হবার দিন থেকেই এই বিরোধ ক্রমশ ধুমায়িত হয়ে উঠছিলো এবং পাশাপাশি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় এই সমস্যাও মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এভাবে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলে সমাজের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিকাশ লাভ করে সেগুলো হলো: (১) মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারের দ্বন্দ্ব; (২) মুক্তিযোদ্ধা ও দালালদের দ্বন্দ্ব; এবং (৩) মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুক্তিযোদ্ধারা খুব একটা সংঘবদ্ধ ছিলেন না। তাদের অভ্যন্তরেও প্রচুর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলো বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর অস্তিত্ব, এবং এরা ছিলেন পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার অনুগত। এই অবস্থা পরবর্তীকালে আরো জটিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়ে ওঠে সমস্যাজনক। এমতাবস্থায় বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শন, অভিভাবক কিংবা নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনধারনের জন্য বিভিন্ন পথ বেছে নেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, কেউ নেন শ্রেণী সংগ্রামের দীক্ষা, এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সমাজবিরোধী পেশায় জড়িয়ে পড়েন। এই অংশটি নিয়োজিত হন ডাকাতি ও ছিনতাইয়ে; অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ, খুন, হাইজ্যাক, অপহরণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ইত্যবসরে 'ষোড়শবাহিনী' হিসেবে খ্যাত এক শ্রেণীর ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক পরিচিতিবিহীন বিভিন্ন গোষ্ঠী গোটা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত করে তোলে। শেষোক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আলবদর বা রাজাকার বাহিনীর সদস্য। পুলিশ ফাঁড়ি, ও বাজার লুট, গাড়ী হাইজ্যাক এবং যুবতী নারী অপহরণ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমিক অবনতির শিকার হতে থাকে।[১৪০]

শেখ সাহেবের তিন বছরের শাসনকালে যে কয়েকশো আইন ও অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী ১৯৭২ সালের দালাল অধ্যাদেশ। ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি এই আদেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয় রাজাকার, আলবাদর ও শান্তি কমিটির লোক যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, খুন ধর্ষণসহ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সংঘটিত করেছে অথবা এগুলো করতে পাক বাহিনীকে সাহায্য করেছে, সেই সমস্ত দালালদের সাধারণ আদালতের পরিবর্তে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হবে।[১৪১] স্বাধীনতার পর দাবি ওঠে যে সমস্ত দালালরা মানবতা বিরোধী এই জঘন্য ধ্বংসলীলার সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু একাধিক সভায় ঘোষণা করেছিলেন দালালদের বিচার এদেশের মাটিতে হবেই। ১৯৭২ এর দালাল আইনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আইনে কঠোর শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচিত হতে দেখা যায়। তবে এই আইনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই আইনের মাধ্যমে দালালরা সহজেই জেলখানাকে তাদের নিরাপদ

---

[১৪০] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৫৫-৬০।

[১৪১] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৬৯।

বাসস্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন দালালরা যে ধরনের জঘন্য মানবতা বিরোধী তৎপরতা চালিয়েছিলেন জেলের বাইরে থাকলে উত্তেজিত জনতার হাতেই তাদের মৃত্যুবরণ করতে হতো। অন্যভাবে বলা যায় এই আইনটি দালালদের জনরোষ থেকে রক্ষা করেছিল। তাই দেখা যায় ১৬ ডিসেম্বরের পর দলে দলে দালালরা জেলগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে।[১৪২]

দালাল আইন স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হোক না হোক আইনটির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এই আইনটির বিরুদ্ধে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে যা একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

একদিকে পুলিশ বাহিনী দুর্বল থাকায় এবং অপরদিকে দেশের পুরো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে থাকায় উক্ত আইনের ছদ্মাবরণে নিজস্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করণের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও আইনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সুবিচার প্রাপ্তির যথেষ্ট নিশ্চয়তা ছিলো, তথাপি এতে রাষ্ট্রের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলে তার অপব্যবহার করে এক বিরাট সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী বেপরোয়াভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, ভোগান্তি ও ব্ল্যাকমেইলে মেতে উঠে। ফলে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের হিসেবে অসংখ্য লোক গ্রেফতার বরণ করেন ও ভোগান্তির শিকার হন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের লোকেরা এই আইন নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন বলে বেশ কিছু সংখ্যক সত্যিকারের দালাল ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে পার্টির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আইনের নাগাল এড়িয়ে অক্ষত থেকে যান। এদের একটি বিশেষ অংশ আওয়ামী কর্মীদের সহায়তায় গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। ফলে আইনের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নতুন করে জনমনে অসন্তোষ এবং সন্দেহ দানা বেধে উঠে।

দালান আইনে প্রত্যক্ষ সমালোচনার ভূমিকা নিয়ে যারা সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই দালাল আইনের অপব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, জাতি পুণর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধান না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য। তিনি বলেন, যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না। তিনি জাতির জন্য জরুরী সেই মুহূর্তে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার এবং সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাকবাহিনীকে সমর্থনদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। তিনি

---

[১৪২] ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান এবং শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত)। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।* (ঢাকাঃ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭): ১৯-২১।

বলেন, বহু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি পারিবারিক শত্রুদের কারাবরণে বাধ্য করছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

এই আইনের মাধ্যমে কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিংবা কতজনকে সাজা প্রদান করা হয়েছিলো, তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আনুমানিক সংখ্যা ছিলো ৫০ থেকে ৬০ হাজার এবং প্রায় সমান সংখ্যক ব্যক্তি পলাতক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রতিক্রিয়াও খুব একটা শুভ ছিলো না। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এই আইন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছিলো। একদিকে সত্যিকারের দালালকে সহায়তা দিয়েছেন, অন্যদিকে সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের গায়ে লাগানো হয়েছে দালাল তকমা। এভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে সরকারকে অতি তুচ্ছ আবেগপ্রবণ বিষয়ে মনোসংযোগ করতে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

এভাবে রাজনৈতিক নেতারা খুব সহজেই ঘুষ ও দুর্নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে এই পরিস্থিতি এমন এক স্তর পর্যন্ত উপনীত হয় যে, ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদেরও এই পরিস্থিতির খপ্পরে ফেলে শোষণ করা হয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, 'হিন্দু ভারতের' উস্কানীতেই এসমস্ত কাজ চালানো হচ্ছে। এতে করে সচেতন বা অবচেতনভাবে জনমনে একটি মুসলিম বাংলা গঠনের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। যদিও এই আইন এক ধরনের বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে, অন্য দিকে তা তেমনিভাবে জনমনে এক বিরোধী চিন্তাধারার বীজ বপণ করে গভীরতর এবং সুদূরপ্রসারী অপর এক দুর্যোগের আগমনী বার্তাও বহন করে এনেছে।[১৪৩]

শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকশো আইন প্রনয়ন করেছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই আইনগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য কোন দক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল না। পুলিশ বাহিনী ছিল অত্যন্ত দূর্বল। শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই আইনগুলো বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ক্ষমতার অপব্যাবহার লক্ষ্য করে বোধহয় বাংলাদেশে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনো সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পাশাপাশি ভারতের কাছ থেকে এই মর্মে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল যে, কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করলে ভারত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

যেহেতু পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী দূর্বল ছিল, স্বাধীনতার পর পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শেই শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

---

[১৪৩] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৭০-৭২।

একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা প্রয়োজন সেনাবাহিনী বা পুলিশ আইনের মতো তেমন একটি আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিলো অনুপস্থিত। একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হলেও এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই আইনের সংজ্ঞায় 'রক্ষী' শব্দটি বাহিনীর অফিসার পদে সাধারণ সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হবে সরকার নির্ধারিত পন্থায় এর জন্য 'রক্ষী' এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)। এই বাহিনীয় উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে (অনুচ্ছেদ ১৮)। পরিচালনা ব্যবস্থাপনার জন্য আইনে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত বাহিনী এই বাহিনী তদারকীর দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং আদেশে উল্লেখিত আইন ও তার বিধানাবলীর ভিত্তিতে পরিচালকের মাধ্যমে এই বাহিনী প্রশাসিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অথবা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এ বাহিনী কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ৭)। সরকার তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক এবং অন্যান্য অফিসার বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করবেন। আইনের আওতাধীন রক্ষী এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং শৃঙ্খলাবিধি আরোপ করা হচ্ছে বলে আইনের ১১ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়। ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উক্ত আদেশবলে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিংবা বিশেষভাবে নির্দেশিত নিয়মে, এই আদেশের আওতাধীন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুত করা যাবে।

আদেশে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাহিনীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবেন।

এই ছিলো রক্ষীবাহিনী আদেশের মূল গঠনতন্ত্র। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, অপরাধ দমন এবং সূত্র অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ বাহিনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী আদেশ ছিলো পুরোপুরিভাবে নীরব এবং ৮নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও যুক্তি এ প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরনের এবং বাহিনীর বিস্তারিত কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তার ছাপ ছিলো না।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারি কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগগিরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানতঃ যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তাহল, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও

কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মত এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিকভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি নিরূপণের কোন বিধান ছিলো না। অচিরেই এগুলো আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যেকোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুরসংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং এর ফলে জনমনে ক্রমশঃ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে। যেকোন আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিলো দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মতো কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিল না। তাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য আইনের: 27/307 যেকোন গৃহ তল্লাশী বা সম্পত্তি সীজকরণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলাবারুদের হিসাব রাখার কোন বালাই ছিলো না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ব্যাপারে ভাদের জন্য কোন আচরণবিধি কিংবা কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিলো না।

যখন রক্ষীবাহিনীর আচরণ এবং ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন ২০ মাস কার্যধারা পরিচালানায় ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনী কোনো কোনো তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেও একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের মূল আদেশে প্রথমবারের মতো একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ৮ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে অনেক পিছিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যেকোনো আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যেকোনো সদস্য বা অফিসার ৮ নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোনো আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশতঃ যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার; (২) যেকোনো ব্যক্তি, স্বান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশী বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন যেকানো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তার সম্পত্তি হস্তগত করার পর একটি রিপোর্ট সহ তাকে নিকটবর্তী থানার হেফাজতে প্রেরণ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যেকোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

রক্ষীবাহিনী সরকারের কোন নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হতো। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজকর্ম করতো। বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ এবং সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত দাবীর পরেও এদের গঠনপ্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।

জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসতো। এদের পোশাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাকের সাদৃশ্য ছিলো এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর নির্মাতা বলে দাবী করতো।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সরকারকে প্রচুর বদনাম কুরোতে হয়। এই বাহিনী কালোবাজারি, মজুতদারি ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন নিয়ে সরকারের উপর আদালত তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে। রক্ষীবাহিনীর দাপটে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সরকার কয়েকবার জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন সংশোধন করলেও তা ছিল রক্ষীবাহিনীর কার্যাবলীকে বৈধতা প্রদান ও বাহিনীর পদাধীকারিদের মধ্যে পদমর্যাদা সুস্পষ্ট করে দেওয়া। জনস্বার্থে এই বাহিনী ব্যবহার করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি।[১৪৪]

সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেই শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা, দক্ষতা সুরক্ষিত করা সম্ভব। এর সাহায্যে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখাও সম্ভব। পরিতাপের বিষয় হলো শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র ছিল অত্যন্ত দূর্বল। শেখ সাহেব আমলাতন্ত্রের বিকাশে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ তো করেননি,পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে আমলাতন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়ে। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবনতি ঘটে। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব মাথাচাড়া দেয়, কর্মচারীদের মধ্যে গগনচুম্বী দুর্নীতি বাসা বাঁধে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির নয় নম্বর আদেশের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়েছিল ও যারা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন তাদের মধ্যে প্রবল বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতাকে অগ্রাহ্য করে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়েছিলেন যারা রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদগুলোতে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যাওয়া সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলতা। উৎপাদন দারুনভাবে ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে এই বৈষম্যমূলক নীতি সরকার পরিহার করলেও সরকারের ভাবমূর্তি অনেকাংশেই ক্ষুন্ন হয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শেখ সাহেবের উদ্দেশ্যে ছিল আমলাদের উপর রাজনৈতিক এলিটদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। এই কারণেই হয়তো আওয়ামী লীগ সরকার সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপকপরিমানে বেতন হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাহস পেয়েছিল। সরকার পুরোনো বেতন কাঠামো অগ্রাহ্য করে উচ্চ পদস্থ সরকারি

---

[১৪৪] আহমেদ মুসা। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ।* (ঢাকাঃ বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮): ২৩-২৭।

কর্মচারীদের জন্য বেতন হ্রাস করে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা বেঁধে দেয়। অন্যদিকে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ১০০ টাকা করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে যেমন তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও উৎকোচ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আমলাতন্ত্র তার দৃঢ় মানসিকতা হারিয়ে ফেলে।[১৪৫]

আওয়ামী লীগ সরকার নবগঠিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা। এর সাহায্যে সরকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭৩ সালের ১ লা জুলাই থেকে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) কার্যকর হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমলাদের উপেক্ষা করে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের আধিক্য ছিল প্রবল। অচিরেই দেখা যায় পরিকল্পনা কমিশন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো পরিকল্পনা কমিশনের মুখাপেক্ষি হতে বাধ্য হয়।[১৪৬]

প্রবল আশা আকাঙ্খা নিয়ে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করলেও কতগুলো পরিসংখ্যার দিকে তাকালে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মতো পরিকল্পনা কমিশনও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। নিম্নে কতগুলো পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো–

এই পরিকল্পনা তার অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জন করতে পারেনি। পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে, অর্থাৎ প্রথম দু'বছরে এর তৎপরতা ছিলো দুর্বল ও অসন্তোষজনক। ১৯৭৩ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার ধার্য করা হয়েছিলো ৫২৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছিলো ৪০০ কোটি টাকা, যা প্রকৃত মূল্যে ১৯৭২-৭৩ সালের চাইতেও কম। ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেও সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সেই একই অংক অর্থাৎ ৫২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বাস্তব অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রায় সমান। অবশ্য উভয় বছরে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের চাইতে প্রাক্কলিত বরাদ্দ ছিলো অনেক বেশী।

প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের চাইতে মূলত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনকে প্রাধান্য প্রদান করা এবং উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের স্তরে উপনীত করা। সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হন। পরিকল্পনার প্রথম বছরে কৃষি ও শিল্পখাতে যথেষ্ট পুনরুজ্জীবন ঘটলেও শিল্প ও কৃষিখাতে মোট উৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় যথাক্রমে ২৫% ও ১২% থেকে ১৩% কম। ১৯৭৩-৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ আগের বছরের ৯৮ লাখ টনের চাইতে বেড়ে ১ কোটি ১৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। এই পরিমাণ ছিলো

---

[১৪৫] সা'দ আহমদ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* (www.pathagar.com, ১৯৯০): ২৮-২৯।

[১৪৬] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৭৭।

১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন ১ কোটি ১২ লাখ টনের চেয়ে বেশী, তবে প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২৫ লাখ টনের চাইতে কম। সার, প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালের স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু শিল্পখাত স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় পিছিয়ে থাকে। বিদ্যুৎ, গৃহনির্মাণ ও জনপথ নির্মাণখাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিলো।

লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতিতে একই ধরনের ঘাটতির প্রবণতা অব্যাহত থাকে এবং তা অনুমিত ২৩% ঘাটতি অতিক্রম করে যায়। আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত হিসাবের চাইতে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা (৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার) বেড়ে যায়। রপ্তানী আয় প্রাক্কলিত আয়ের চাইতে ২২ কোটি টাকা (২ কোটি ৭০ লাখ ডলার) পিছিয়ে থাকে। ফলে রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যেকার ব্যবধান যায় বেড়ে। চলতি হিসাবের এই ঘাটতির মুখে আবার বৈদেশিক সাহায্যের ধার্যকৃত প্রবাহ ৩৭০ কোটি টাকা থেকে ৩০৭ কোটি টাকায় নেমে আসে (৪৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার থেকে ৩৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার)। ফলে ২১ কোটি ৭০ লাখ ডলারের স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে হয়।

জালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী খাদ্যের মজুতস্বল্পতা এবং সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত সামগ্রীর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত ধারণার চাইতে বেশী হলেও আমদানীর প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অনেক কম। ফলে আমদানীর ক্ষেত্রে খাদ্যমূল্য ৯১% এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্য ৭৫% বৃদ্ধি **পায়।** কাঁচাপাট ও পাটজাত সামগ্রীর দাম সামান্য বাড়লেও রপ্তানীর পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ৩৬ লাখ বেল লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২৭ লাখ বেলের বেশী কাঁচা পাট রপ্তানী করা সম্ভব হয়নি। আমদানীর স্বল্প পরিমাণ শুধ, বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্য পরিস্থিতিকেই বিরূপভাবে প্রভাবিত করেনি, উপরন্তু আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণকেও তা ভন্ডুল করে দেয়। আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত রাজস্ব ও মূলধন আদায় প্রাক্কলিত পরিমাণ ৪৫০ কোটি ১০ লাখ টাকার চেয়ে ১৩০ কোটি ৩০ লাখ টাকা কম ছিলো। অপরদিকে রাজস্ব আয়ের ঘাটতি সত্ত্বেও ৩৩০ কোটি ৮০ লাখ টাকার উন্নয়ন বহির্ভুত ব্যয় (রেলওয়ের ঘাটতি অথবা ভর্তুকী ছাড়া) ছিলো বাজেটে নির্ধারিত অংকের চেয়ে ৩৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশী। ফলে রাজস্ব উদ্বৃত্ত (খাদ্যতৎপরতা ছাড়া) ১৫৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা থেকে মাত্র ১৯ কোটি টাকায় নেমে আসে। খাদ্যভর্তুকী বাবদ প্রচুর অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে খরচ হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব উদ্বৃত্ত শেষ পর্যন্ত ঘাটতিতে রূপান্তরিত হয়। এতে করে সার্বিক উন্নয়নের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতিজনিত কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালের মূল্য পরিস্থিতি ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায়ও খারাপের দিকে মোড় নেয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের তৎপরতার সার্বিক প্রভাব ছিলো এই যে, এ বছর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম আগের বছরের গড় মূল্যের চাইতে প্রায় ৪০% বেড়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ ১৯৭৩-৭৪ সালের স্তরে রাখা হয়েছিলে।। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালের উন্নয়ন তৎপরতার ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩-৭৪ সালের জি ডি পি ৫% থেকে ৬% বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলিত হলেও প্রকৃত বৃদ্ধি হিসেব করা হয়েছিলো আগের বছরের তুলনায় মাত্র ২% বেশী। খাদ্যশস্যের

মোট উৎপাদন হয়েছিলো ১ কোটি ১৫ লাখ টন যা আগের বছরের চাইতে কম এবং লক্ষ্যমাত্রা থেকেও তা পিছিয়ে থাকে। ফলে ব্যাপক খাদ্যঘাটতি অব্যাহত থাকে এবং ২৬ লাখ ৪০ হাজার টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করতে হয়। পাটের উৎপাদন আগের বছরের ৬০ লাখ বেল থেকে কমে ৪০ লাখ বেলে নেমে আসে। অবশ্য চা, আখ, আলু ও সব্জীর মতো অন্যান্য ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

শিল্পখাতে চিনি, তন্তু, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী সিমেন্ট ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর উৎপাদন বাড়লেও সার্বিকভাবে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী পাট খাতে উৎপাদন ৮% হ্রাস পায় এবং ঘোড়াশাল সার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরিয়া উৎপাদন হ্রাস পায় ৭৭%।

লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি এসময়ে আরো অবনতির শিকার হয়। আমদানীর প্রয়োজনীয়তা ৭৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত হলেও প্রকৃত আমদানী হয় ১৭১ কোটি টাকার। বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য ও সার আমদানী বেড়ে যাওয়ায় টাকার অংক বাড়লেও আমদানীর প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অপেক্ষাকতে কম। অপরদিকে আগের বছরের ন্যায় রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। প্রকৃত রপ্তানী আয় প্রাক্কলিত হয়েছিলো ২৯৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৩৪৮ কোটি টাকা। ২৭ লাখ বেলের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ১৫ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী হয়। পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী হয় মাত্র ৩৯ লাখ টন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪৪ লাখ টনের।

একই বছর. উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় প্রাক্কলিত ৪৯০ কোটি ৮ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ৫৩১ কোটি ১ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। অনুমান করা হয় যে, ১৯৭৪ -৭৫ সালে দ্রব্যমূল্য আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছিলো। শেষপর্যন্ত এই বছরের শুরু থেকে খাদ্যপরিস্থিতি এক সংকটজনক রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রাক্কলিত ২৬ লাখ টন খাদ্যশস্যও যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অনিবার্য ভাবে দেশ এক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয় এবং এতে হাজার হাজার লোক মারা যায়।

এক কথায় বলা যায়, ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ সালে পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রের তৎপরতা অনেকখানি পিছিয়ে পড়ায় লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেশ এমন গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয় যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোটা অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, কৃষি এবং শিল্প কোনো খাতেই পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর দেশ ১৯৬৭-৭০ সালের উৎপাদন স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। পরিকল্পনার প্রথম বছরেই তা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছিলো। এই দুই বছরে জাতীয় আয়ও ১৯৬৯-৭০ সালের স্তর অতিক্রম করতে পারে নি।[১৪৭]

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক নিদর্শন হল ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে নবগঠিত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিনত করার স্বপ্ন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। বিষয়টি এমন নয় যে, দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে সরকার অবগত ছিল না। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে যে পরিমাণ চাষযোগ্য জমি প্রয়োজন ছিল তা ছিল না। শুধু তাই নয় বন্যা, খরা, সাইক্লোন প্রভৃতি কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু ছিল না।

---

[১৪৭] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ২১৮-২২১।

স্বাধীনতার পর বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য পন্য আমদানি, তার সুষ্ঠ বন্টনের ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি। চোরাচালান, অবৈধ মজুতদার, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে চালের দাম বেশি ছিল। তাই প্রচুর খাদ্য পন্য ভারতে পাচার হওয়ার খবর সংবাদপত্রে আসতে দেখা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুবার সেনাবাহিনী তলব করেও তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কারণ এই চোরাচালানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এক অংশের নেতার যোগসাজশ ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বার বার সরকারকে সতর্ক করা হলেও সরকার তাতে কর্নপাত করেনি। সরকার এই প্রচার করতে থাকে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা প্রস্তুত। মওলানা ভাসানী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরন অনশনে বসেন।

সরকারের চরম ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ভয়ঙ্করভাবে বেরে যায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে এসে দাঁড়ায় । নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য গগনচুম্বী হারে বৃদ্ধি পায়, কচু ও লতাপাতার মতো খাদ্যসামগ্রী খেয়ে মানুষ জীবনধারণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে মধ্যম মানের এক মণ চাউলের দাম ছিলো ৫৭.১০ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা উন্নীত হয় ২৪৪.৪০ টাকায়। একই সময়ে মশুর ডালের দর কেজিপ্রতি ১.৬২ টাকা থেকে ৪.৭৫ টাকায়, কেজিপ্রতি মাছের দর ৪.১৯ টাকা থেকে ১১.৭২ টাকায়, গরুর মাংস ৩.২৭ টাকা থেকে ১০.৮৫ টাকায়, আলু ০.৯৫ টাকা থেকে ২.৬২ টাকায়, সরিষার তেল ৬.৮৭ টাকা থেকে ৩১.১৭ টাকায়, মরিচ ৫.২৩ টাকা থেকে ৪৬.৬৬ টাকায়, পেয়াজ ০.৭৮ টাকা থেকে ২.৫৭ টাকায়, লবণ ০.৪৭ টাকা থেকে ৩.৮৩ টাকায়, চিনি ২.৫২ টাকা থেকে ৫.৮২ টাকায়, জজ্বালানী লাকড়ী মণপ্রতি ৫.১১ টাকা থেকে ১৪.৭৪ টাকায় এবং প্রতি ২২ আউন্স কেরোসিন তেলের দাম ০.৮৩ টাকা থেকে ১.৭৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে প্রায় সকল সামগ্রীর মূল্য ৩০০ থেকে ৪০০% বৃদ্ধি পায় এবং একই বছরে পণ্যমূল্য আগের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ১০০%। কোনো কোনো স্থানে কেজিপ্রতি চাল ১০ টাকায়, শুকনা মরিচ কেজিপ্রতি ১০০ টাকায়, বিক্রি হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দ্রব্যমূল্য দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় প্রতিদিনই জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতিকেজি মোটা চাউলের দাম ছিলো ৩.৯০ টাকা ক্রমাগত বেড়ে তা আগস্ট মাসে ৪.৭৮ টাকায়, সেপ্টেম্বর মাসে ৬ টাকায় ও অক্টোবর মাসে ৭.১৬ টাকায় উন্নীত হয়।[১৪৮]

সরকারের উদাসীনতার ফলে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এর প্রকৃত পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ্যের মতো। এই সময়ে রাজধানীর রাস্তার পাশে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। বুকে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল আওয়ামী লীগের শাসনে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।[১৪৯]

---

[১৪৮] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ২৭৬।

[১৪৯] Rukunuddin Shaikh. "Representation of Deaths Due to Misrule during the Famine of 1974 in Neamat Imam's The Black Coat." *The Creative Launcher* 7, no. 4 (2022): 103-111.

স্বাধীনতার পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান জনগনের আশা আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে একটি সংবিধান প্রনয়ন করতে প্রয়াসী হন। এটা করতে গিয়ে এক অংশের জনগণ ও রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তাদের বক্তব্য ছিল ছয় দফার নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করেছিল। এই বিজয়ের সুবাদে নবগঠিত বাংলাদেশে গনপরিষদ গঠনের বৈধ ক্ষমতা ও অধিকার আওয়ামী লীগের নেই। এই অবস্থায় একটি নতুন গনপরিষদ গঠনের দাবি ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান এই দাবি অগ্রাহ্য করে সংবিধান প্রনয়নের দিকে অগ্রসর হন।

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বলে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' ও 'বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ' নামক ২টি আদেশ জারি করে। প্রথমটির মাধ্যমে ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আইনসভা হিসেবে কাজ করার কোন ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল না। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী গণপরিষদের কোন সদস্য তার রাজনৈতিক দল (অর্থাৎ যে দলের মনোনয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন) থেকে পদত্যাগ করেন, কিংবা উক্ত দল থেকে বহিষ্কৃত হন তাহলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

এ দুটি আদেশ জারির পরপরই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদউল্লাহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফ্ফর) থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কমিটিতে একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্য (মোট মহিলা সদস্যসংখ্যা ছিল ৭ জন) অর্ন্তভূক্ত করা হয়। কমিটিতে পরবর্তী ১০ জুনের (১৯৭২) মধ্যে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি অত্যন্ত দ্রুত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ১৭ এপ্রিল কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সংবিধান বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির ঘোষিত শেষ তারিখের (৮ মে ১৯৭২) মধ্যে কমিটি ৯৮টি সুপারিশমালা লাভ করে। পূর্বনির্ধারিত ১০ জুনের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। সংবিধানটিকে পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম করার উদ্দেশ্যে কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও ইংল্যান্ড সফর করে সেখানকার পার্লামেন্টের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া সংবিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কমিটি একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে ৯ অক্টোবর তা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল। এভাবে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটি কমিটির

সভাপতি এবং দেশের আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধানের বিলের আকারে গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। কার্যপ্রণালীর বিধিমালা গ্রহণ করে ১৮ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে সংবিধান বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর তা সমাপ্ত হয়। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানের বিষয়ে তার পার্টির সুপারিশ উপস্থাপন করেন। ৩১ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারি আলোচনা শুরু হয়। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সে আলোচনা চলে। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত কতিপয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের ৭৩নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কর্তৃক আনীত একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ ঠা নভেম্বর সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরী হয়।[১৫০]

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান চারটি নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। সেগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের এই সংবিধান প্রণয়ন ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই সংবিধান গোটা বিশ্বের নজর কাড়ে প্রধানত দুটি কারণে।

১) এই সংবিধান পার্লামেন্টকে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রনয়নের ক্ষমতা দেয়নি।

২) এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা ছিল না।

সার্বিকভাবে অনেক বৃহৎ গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধান ছিল প্রগতিশীল ও জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণের জীবন্ত দলিল।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে তাকালে এই চিত্রই আমাদের সামনে প্রস্ফূটিত হয়। বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ –

(১) একটি সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন; (২) মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি প্রদান; (৩) আটকাদেশ বহাল রাখার বিধানাবলী প্রত্যাহার; (৪) জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী বর্জন ও মৌলিক অধিকার স্থগিত রহিতকরণ; (৫) ক্ষতিপুরণ সহ বা ক্ষতিপুরণ সমেত সম্পত্তি জাতীয়করণ করে "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক" প্রক্রিয়ার বিধান সংযোজন; (৬) চাকুরীবিধি পরিবর্তনের কর্তৃত্ব প্রদানসহ বেসামরিক আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন; (৭) বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন; (৮) কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ বিষয়ক বিধানাবলী প্রণয়ন; (৯) প্রশাসন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণশৃঙ্খলা সংরক্ষণ; (১০) সংসদের অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে সরকারের ক্ষমতা সীমিতকরণ; (১১) দল পরিবর্তনের জন্য সংসদ সদস্যদের অধিকার রহিতকরণ; (১২) বিচার কর্মবিভাগ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা প্রদান; (১৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিধি প্রণয়ন; (১৪) ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বয়সসীমা হ্রাস।

---

[১৫০] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ২৫২-২৬০।

এই প্রতিটি বিধান প্রণয়নের পেছনেই কাজ করেছে এক একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং এগুলোর সবই করা হয়েছিলো অতীতে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত গণ দাবীর ভিত্তিতে।[১৫১]

আওয়ামী লীগ প্রচার করতে থাকে যে একটি বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার একটি বিপ্লবী সংবিধান প্রণয়ন করেছে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সংবিধান বাস্তবায়িত করা গেলে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল। পরিতাপের বিষয় আওয়ামী লীগ কখনোই বিপ্লবী দল ছিল না। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী সংবিধান প্রণয়নের সদিচ্ছাও তাদের ছিল না । প্রকৃতপ্রস্তাবে পশ্চিমী গনতন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র করাই ছিল আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তি, যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাদের প্রবল চাপে আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল প্রবল স্ববিরোধিতা। এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশের নতুন সংবিধানে। এক হাতে যেমন আওয়ামী লীগ জনগণের আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রগতিশীল সংবিধান উপহার দিয়েছিল, অন্যহাতে আওয়ামী লীগ সরকার সেগুলো কেড়েও নিয়েছিল। এটা ঘটেছিল আওয়ামী লীগের শ্রেণি চরিত্রের কারণেই। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে খুবই জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেশে জরুরি অবস্থা জারিও করা হয়। এই সংশোধনীতেই পার্লামেন্টকে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয়। এর ফলে মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে জনগন বঞ্চিত হয়। সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে। সংবিধানের বুকে কুঠারাঘাত করা হয়। গলা টিপে হত্যা করা হয় গণতন্ত্র। সংবাদপত্র ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় একদলীয় শাসন। দেশের সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হয় এক ব্যক্তির হাতে।[১৫২]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসনব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে-

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস। কোনো নেতা, কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্ব এককভাবে দাবি করতে পারেনা। পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার বিকাশে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্রিয় হয়ে উঠলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও পাক-সেনাবাহিনীর হঠকারিতা, অদূরদর্শীতা ও যোগ্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অভাব মুক্তি আন্দোলনকে তরান্বিত করে। দূর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে নবগঠিত বাংলাদেশের ক্ষমতায় চিরস্থায়ী ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ নিজেদেরকে স্বাধীনতার প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রচার করতে শুরু করে। প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামীলীগ পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে

---

[১৫১] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৬১-১৬৫।

[১৫২] সা'দ আহমদ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* (www.pathagar.com, ১৯৯০): ২৮-২৯।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা চায়নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও ইস্তেহারে এরকম কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামীলীগে'র সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাক-বাহিনীকে হঠিয়ে দিয়ে মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। অন্যভাবে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত দেশপ্রেমিকদেরর কিছুটা রসদ জুগিয়েছিল আওয়ামীলীগ। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন আওয়ামীলীগকে দিয়ে ভারত যেমন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থিত করেছিল, অন্যদিকে ক্ষমতালোভী আওয়ামীলীগ ভারতের সহায়তায় নবগঠিত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। মুক্তি আন্দোলনের একক দাবিদার হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান শাসনকার্য নিজের হাতে তুলে নেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও দেশ প্রেমিকদের এই সরকারের অংশীদার করা হয়নি। যোগ্য সম্মান প্রদান করা হয়নি মুক্তি যোদ্ধাদের, আরও সহজভাবে বলা যায় যে সমস্ত দেশপ্রেমিকরা দেশমাতৃকার জন্য নয় মাস ব্যাপী পাক-বাহিনীর সঙ্গে মরণাপন্ন লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন তাদের যোগ্য মর্যাদা দেননি শেখ সাহেবের সরকার। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের উপর তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জন্যে বিশেষ উদ্যেগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। আওয়ামীলীগ সরকার যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে যে সমস্ত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি প্রায় সবটাই ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হয়েছিল। দেশে দেখা দিয়েছিল চরম অরাজকতা, লুঠপাট, গগনচুম্বী দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসঙ্কট, রাজনৈতিক হত্যা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, স্বজনপ্রীতি, আওয়ামীলীগ মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দৌরাত্ম্য জনমনে প্রবল ত্রাসের সৃষ্টি করে। এছাড়াও এক শ্রেণীর মানুষের হাতে সম্পদের পাহাড় পুঞ্জীভূত হওয়া অন্যদিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে পড়া। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শেখ সাহেবের সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

শাসন ব্যবস্থার এই দুর্বলতার কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। আওয়ামীলীগ সরকার এই রাজনৈতিক তৎপরতা দমনের জন্য বহু ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের মৌলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা ছিল পূর্বে ঘোষিত আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক ইস্তেহার ও কর্মসূচির পরিপন্থী। পাকিস্তান আমলে হত দরিদ্র মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার জন্য আওয়ামীলীগ যে তীব্র লড়াই আন্দোলন করেছিল শেখ সাহেব যার জন্য কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছিলেন সেই করুন অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে শেখ সাহেবের শাসন ব্যবস্থায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাবে বহু মানুষের মৃত্যু এই সত্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৭২ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে যে নতুন সংবিধান কার্যকর করে এই সংবিধান ছিল স্বাধীনতার পূর্বকালে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণের শিকড় উপড়ে ফেলার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। অন্যভাবে বলা যায় নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছিল গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষার একটি জীবন্ত দলিল। কিন্তু

দেখা গেল সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই এই সংবিধানের বুকে কুঠার আঘাত করা হল দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনীরনীর মাধ্যমে। সংবিধানে যুক্ত করা হল রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা, পার্লামেন্টকে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রনয়নের অধিকার । সংবিধানের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয় ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর সাহায্যে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, কেড়ে নেওয়া হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। কণ্ঠরোধ করা হয় সংবাদ পত্রের, অন্যভাবে বলা যায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে শেখ মুজিবুর রহমান একনায়ক তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন বাকশাল ব্যবস্থা চালু করে। আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করে। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই চারটি নীতি কতটা বাস্তবায়িত করা হবে, কতটা বাস্তবায়িত করা হবে না এটা ছিল সরকারের স্বেচ্ছাধীন বিষয়। এগুলি বাস্তবায়নের জন্য আদালতের সাহায্যে নাগরিক বর্গের রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন সংবিধানের এই চারটি নীতি ছিল আওয়ামীলীগের জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক সামর্থ্য ছিল না। কারণ হল এই দলটি ছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। তবে আওয়ামীলীগ জনগণকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করে যে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আওয়ামীলীগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মজার ব্যাপার ছিল এই সুচতুর আওয়ামীলীগ তার শ্রেণী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সহায়ক পরিবেশ সুরক্ষিত করেছিল সংবিধানের সাহায্যই। তাই এই চারটি নীতির বাস্তবায়ন বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। বাংলদেশে গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি বরং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। দেশে গড়ে ওঠেনি সমাজতন্ত্র। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ রচনা করা যায়নি। ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে রক্ষা পায়নি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে সংবিধানের মূল চারটি নীতি ছিল আওয়ামীলীগের সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের হাতিয়ার মাত্র।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আওয়ামীলীগ প্রগতিশীল ঘোষিত কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ইস্তেহার গ্রহণ করলেও এগুলি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামীলীগের পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, আওয়ামীলীগ ছিল একটি পেটি-বুর্জোয়া দল। আরও লক্ষণীয় বিষয় যেটি, সেটি হল এই প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচি ও ইস্তেহার বাস্তবায়নের জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের যে উচ্চ রাজনৈতিক মূল্যবোধ প্রয়োজন অধিকাংশ আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের তা ছিল না। নেতাকর্মীদের মধ্যে এগুলি অনুশীলন করানোর ক্ষেত্রেও আওয়ামীলীগের কোনো উদ্যেগ ছিল না। তাই বলা যায় হতদরিদ্র মানুষের ভোটে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার উদ্দেশ্যই বিভিন্ন প্রগতিশীল কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ইস্তেহার গ্রহণ করতে হয়েছিল। নবগঠিত বাংলদেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়েও আওয়ামীলীগ পূর্বে ঘোষিত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে তারা যে তৎপর, জনগণকে এটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে বহু প্রগতিশীল আর্থসামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরিতাপের বিষয় এগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শেখ সাহেব ও তাঁর সরকার ব্যর্থ হন। তাই বলা যায় প্রবল আশা-আকাঙ্খা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়ে-সাত কোটি বাঙালি পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যে

স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সেই স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে আওয়ামীলীগ সরকার ব্যর্থ হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও আবেগ ভু-লুণ্ঠিত হয়।

এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে-তিন বছরের শাসন পর্যালোচনা করে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় একজন সুশাসক উপহার দিতে শেখ মুজিবুর রহমান সক্ষম হননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর কাউকেই দেখা গেল না জাতির পিতার নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করতে অথচ শেখ সাহেবের ডাকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর এক কথায় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসন পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিল। সাড়ে-সাত কোটি বাঙালি তাকে বঙ্গবন্ধু হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল অথচ সেই মহান মানুষটির নৃশংস হত্যা হল জনমনে তার কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। বাঙালি জাতির উপর আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তেইশ বছর লড়াই করে সাড়ে-সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে যে উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন মাত্র সাড়ে-তিন বছরের শাসনে বোধ হয় বাঙালি সেই আসনটি থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবছিলেন।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) ঃ একটি মূল্যায়ণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনঠাসা করে নিজ দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা নতুন কোনো ঘটনা ছিল না। এটার সূচনা হয়েছিল ২৫ মার্চের পর থেকেই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীনই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যখন মরনাপন্ন লড়াই করছিল সেই সময়েই স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রচিত হচ্ছিল। ভারত সরকারের সহায়তায় মুক্তি বাহিনীর বাইরে একটি বিশেষ বাহিনী তৈরী করা হয়। এ বিষয়ে ভারত সরকার জেনারেল ওবান সিংকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়। শেখ মুজিবের প্রতি গভীর অনুরাগ, আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রবলভাবে রয়েছে এমন যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় মুজিব বাহিনী। আওয়ামী লীগ ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দলটি ভারত সরকারের কাছে একটি উপযুক্ত দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল, অন্যকোন রাজনৈতিক দলকে ভারত সরকার বিশ্বাস করত না। ভারত এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পেরেছিল যে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবে না বাংলাদেশ। পাশাপাশি আওয়ামী লীগও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে মুজিব নগর সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারের সহায়তায় মুজিব বাহিনী গঠনের বিষয়টি অনুমোদন করে।[১৫৩]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ অংশগ্রহণ করেনি। এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। অনেক মুক্তি যোদ্ধার আবার কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ছিল না। সহজভাবে বলা যায়, এটা ছিল বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। তবে মুক্তি যোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিলেন বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী ও ভারত বিরোধী। একটি বড় অংশের মুক্তিযোদ্ধা ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এর পক্ষপাতি ছিল না। তারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না। ভারত এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল যদি বাংলাদেশে সরকার গঠন করে তাহলে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে গড়ে তোলা হয় মুজিব বাহিনী। মুজিব বাহিনীর মূল কাজ ছিল সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী বামপন্থী ও আওয়ামী লীগের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এই বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ ও ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হতে পারে এমন মুক্তি যোদ্ধাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে। এর জন্য তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। তাই দেখা যায়, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই মুজিব বাহিনীর সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের বিরোধী মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিবের ভাগ্নে ফজলুল হক মনির নেতৃত্বাধীন মুজিব বাহিনীর হাতে বহু মুক্তি যোদ্ধাকে প্রান বিসর্জন দিতে হয়। মুজিব বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী অথচ আওয়ামী লীগের বিরোধী মুক্তি যোদ্ধাদের পতন করা। ফজলুল হক মনির নেতৃত্বাধীন মুজিব বাহিনীর সদস্যরা এক্ষেত্রে রাজাকার, আলবাদর ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

বরিশাল জেলার পেয়ারা বাগান, কুরিয়ানা, ডুমুরিয়া, ভীমরুলী অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। তারা গুপ্ত হত্যার পথও বেছে নেয়। বহু মুক্তি যোদ্ধাকে হত্যা করে শেখ ফজলুল হক মণি গোষ্ঠীর সদস্যরা। এমনকি মুজিব বাহিনীর অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগ

---

[১৫৩] হক ডালিম। যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি। (নবজাগরন প্রকাশনী, ২০০১): ১৫৪।

বিরোধী সদস্যদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি।[১৫৪]

বিরোধী রাজনৈতিক দল ও রক্ষিবাহিনীঃ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও কলকাতা থেকে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশ করে ২২ ডিসেম্বর। তাজউদ্দীন আহমদের মন্ত্রীসভা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ন্যাপ নেতা মোজাফ্ফর আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, যেসমস্ত রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠন করা হোক। তিনি মন্তব্য করেন, সব সংগ্রামী শক্তিকে আস্থায় নেয়া এবং তাদের কাজে লাগানো দরকার এবং একটি জাতীয় সরকারই কাজটি করতে পারে। সংগ্রামী শক্তি বলতে তিনি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, মওলানা ভাসানীর দল ও বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস- এই পাঁচটি দলের নাম উল্লেখ করেন। তার এ বক্তব্য নিয়ে কিছুটা হইচই পড়ে যায়। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো 'দাবিদার' আছে, এটা অনেকেই ভাবতে পারতেন না। ২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান সংবাদ সম্মেলন ডেকে বললেন, এই মুহূর্তে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এটা মানুষকে শুধু বিভ্রান্ত করবে।[১৫৫]

বিরোধী দলগুলির জাতীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দাবি মেনে নেওয়া হলো না। তবে এ বিষয়ে বিরোধী দলগুলি কোনো জোড়ালো প্রতিবাদ জানায়নি। কারণ, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তাই হয়তো বিরোধী দলের পক্ষে প্রতিবাদ সংঘটিত করা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল তাজউদ্দীন আহমদ সরকারের পাশে। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, জাতীয় সরকার গঠন না করা হলেও পাঁচ দলীয় উপদেষ্টা কমিটিকে সক্রিয় করা হবে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হবে। পরিতাপের বিষয় স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে এই কমিটির বৈঠক কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনায় এই কমিটির কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতেও দেখা যায়নি।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক চরম সংকটের সময় একটি খবর সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটায়। সে খবরটি ছিল শেখ মুজিবের মুক্তির। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মনে করেছিল শেখ সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে দেশে যে অস্থিরতা চলছে তার অবসান ঘটাবেন। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে মুক্তি বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী ইত্যাদি গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যাপক লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, জোর করে সম্পত্তি দখল ইত্যাদি সমাজ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দেয়। দালাল তকমা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্মূল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই অবস্থায় শেখ মুজিবের মুক্তির খবর জনমনে এক নতুন আশার সঞ্চার ঘটায়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন বঙ্গবন্ধু। লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ সেদিন হাজির হয়েছিলেন তাদের প্রিয় নেতা ও তাদের নয়নের মনি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানাতে।

---

[১৫৪] মাসুদুল হক। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০): ১০৫-১০৭।

[১৫৫] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ৬৮।

এই দিন রেসকোর্স ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। চারিদিকে শ্লোগান ওঠে জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা ইত্যাদি। লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের এই সভায় সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আজ আমার কারুর প্রতি কোন আক্রোশ নেই। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্র গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান নয়মাস ব্যাপী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মরনাপন্ন লড়াই করার জন্য বাঙালি জাতিকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও কুর্নিশ জানান। তিনি পাক বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের এই বক্তব্য ছিল জাতি গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগনের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও তিনি কার্পন্য করবেননা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, কোনো শক্তিই বাংলাদেশকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

এই সভায় বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে আহ্বান করেন যে, কেউ আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে নেবেন না। যে অপরাধ করেছে আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অবশ্য এর পাশাপাশি তিনি দৃঢ়কণ্ঠে এক অজানা-অজ্ঞাত-কল্পিত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তাদের নির্মূল করবেন, নিঃশেষ করবেন। তাঁর এই বক্তব্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্মূল করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। এই বক্তব্য সেদিন হতাশ করেছিল অনেককেই।[১৫৬]

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের হাতে প্রচুর অস্ত্রসস্ত্র জমা হয়। এই অস্ত্র দিয়ে মানুষ পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতা থেকে বাংলাদেশে পদার্পণ করে জতির বৃহত্তর স্বার্থে এই সমস্ত অস্ত্র সরকারের কাছে জমা দেওয়ার আবেদন জানান। কোনো পক্ষই অস্ত্র জমা দিতে রাজি হয়নি। তারা বলেন, শেখ সাহেবের কথায় অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম, শেখ সাহেবের কথাতেই আমরা অস্ত্র জমা করবো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার আবেদন জানান। দেখা যায় শেখ সাহেবের আবেদনে সামান্য কিছু অস্ত্রসস্ত্র সরকারের কাছে জমা পড়ে। কোনো পক্ষই সমগ্র অস্ত্র ভাণ্ডার শেখ সাহেবের নির্দেশে সরকারের কাছে জমা দেয়নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের উপর সন্দেহ, ভিতি প্রদর্শন, অবিশ্বাস জনমনে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে ছিল খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, পুরোনো শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ, মুক্তিপণ আদায়ের মতো ঘটনা।

স্বাধীনতার পর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা উল্লেখ করলে তৎকালীন পরিস্থিতির চিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর দলবল মিলে চারজন লোককে প্রকাশ্যে আধঘন্টা ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে শেষে গ্রেনেড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনা নবজাতক বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শত্রু নিধনের লক্ষ্যে মুজিব বাহিনী, রক্ষিবাহিনী, লাল বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে।[১৫৭]

---

[১৫৬] আতাউর রহমান খান। অবরুদ্ধ নয়মাস। (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১): ৮০।

[১৫৭] গোলাম মুরশিদ। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০): ১৭৬-১৭৭।

জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভার মতো রাজনৈতিক দল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির বিরোধীতা করেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে এই দলগুলিকে সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। তারা রাজনীতি করার স্বাধীনতা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতোই ভোগ করত। স্বাধীন বাংলাদেশে দেখা গেল একটি ভিন্ন চিত্র। এই চিত্রটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি নতুন সরকারের উদার মনোভাব প্রদর্শনের পরিচায়ক নয়।

মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এরফলে এই সমস্ত দলের সমর্থকরা বৃহত্তর জাতি গঠনের কাজে এগিয়ে আসেনি। খুব মৃদুভাবে হলেও ভিতর ভিতরে তারা যে সরকার বিরোধী কার্যাবলীতে লিপ্ত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১৫৮]

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবাদর ও শান্তি কমিটির লোক যারা পাক বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মুক্তি যোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপে যারা জড়িত ছিল তাদের দালাল বলা হয়। এদের সহায়তায় পাক বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সমস্ত দালালদের বিচারের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে দালালদের শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দালালদের বিচার এই দেশের মাটিতে হবেই। পাশাপাশি তিনি এও বলেন কেউ আইন-শৃঙ্খলা হাতে তুলে নেবেন না। তবুও দেখা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দালাল নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। দালালদের সম্পত্তি দখল, তাদের ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, পুরোনো শত্রুতার প্রতিশোধ ইত্যাদি ঘটনা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে সরকার দালাল আইন প্রণয়নের দিকে অগ্রসর হয়।

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি দালালদের বিচারের জন্য দালাল আইন জারি করা হয়। দেশের প্রচলিত আইন উপেক্ষা করে দালালদের কঠিন শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে এক সময়ের আওয়ামী লীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যারিস্টার সাদ আহমদ তাঁর "মুজিবের কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "যদিও এই হুকুম ১৯৭২ সনের ২৪শে জানুয়ারী জারী হয়, কিন্তু রিট্রসপেকটিভ মোজেজার সাহায্যে আইনের কার্যকারীতা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে গণ্য হবে বলে ঘোষণা করা হল। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশটি পাকিস্তানের অংশ ছিল এবং পাকিস্তানের সামরিক সরকার দোর্দন্ড প্রতাপ নিয়ে শাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের বিরাট অংশকে পূর্বের মতই পাক সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী করতে হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা চালাতে হয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর হুকুমের কাছে নতী স্বীকার করতে হয়েছে। রিট্রসপেকটিভ মোজেজার দৌলতে অনেক স্বাভাবিক কাজও অপরাধজনক কাজ বলে গণ্য হলো। সরকার দালাল শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এত ব্যাপকতার আশ্রয় নিলেন যে, ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক শাসনের অধীনে এদেশে বসবাসকারী ৬ কোটি মানুষকেই দালাল বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে দেশের প্রচলিত আইনের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে কতকগুলো অত্যাচারমূলক ধারা এই

---

[১৫৮] অলি আহাদ। *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪): ৪৬২।

হুকুমের মধ্যে সামিল করা হলো। দালাল সন্দেহে পুলিশ যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবে এবং প্রথম দফায় তদন্ত সাপেক্ষে তাকে ৬ মাস লাল ঘরে রাখা যাবে। ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাকে রেখে দেওয়া যাবে। তদন্ত হবার পর চার্জশিট দাখিল হলে ট্রাইবুনাল বিচার করে নির্ধারিত শাস্তি দেবে। ট্রাইবুনাল কাউকে খালাস দিলে সরকার হাইকোর্টে আপীল করবেন এবং আপীলের শুনানী না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইবুনাল কর্তৃক খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলে পচতে হবে। তদন্ত-বিচার বা আপীলের কোন ক্ষেত্রেই আসামীকে জামিন দেবার ক্ষমতা আদালতের থাকবেনা। ট্রাইবুনাল যদি কাউকে শাস্তি দেয় (অর্থাৎ জেল জরিমানা) তাতেও কিন্তু আসামীর পাপ খন্ডন শেষ হলো না। এরপর পুনরায় সরকার দ্বিতীয়বার জবেহ করবেন, অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

যদিও এদেশের আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতীতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা সুবিচার পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে কোন সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যর বিষয় বিচারের বুনিয়াদ ওলোট পালটকারী রাষ্ট্র প্রধানের জারীকৃত হুকুমের বিরুদ্ধে কোন ক্ষীণ প্রতিবাদও উত্থিত হলো না। আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের যারা দালালীর সন্দেহে অভিযুক্ত হলেন এবং যাদের পিছনে সরকারী যন্ত্র ও বিভিন্ন বাহিনীর হায়েনাদের লেলিয়ে দেওয়া হলো তাদের পক্ষে অবশ্য প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর বাইরে যারা ভবিষ্যতে এই আইনের ছোবল তাদের উপর পড়তে পারে এই চিন্তা মোটেই করলেন না। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং তাদের লেজুড় ছাত্র শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দালাল আইনের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেরই সমাধি দেখতে পেলেন। নীতি বা আদর্শের নীরিখে একে বিচার বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আর বিভিন্ন বাহিনীর জন্য এসব আইনত এক একটি নেয়ামত। দালাল পাকড়াও করার নামে এবং দালালের বাড়ীঘর তল্লাসের নামে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার মহা সুযোগ এই আইনগুলো সৃষ্টি করে দিল। সুতরাং তারা জানাল খোশ আমদেদ এবং চতুর গুণ উদ্দীপনার সাথে দালাল নিধন ও দালালদের সম্পত্তি লুটপাট শুরু হলো। দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল দৈনিক পত্রিকাগুলোর কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করাই ভাল। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ইয়াহিয়া সরকারের গুণগানে মুখর ছিল তারা এখন বর্তমান সরকারের নজরে 'গুড বয়' হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, যা সি আই ডি পুলিশের পক্ষেও সম্ভবপর নয় সে কঠিন কাজও তারা করছে। সামরিক শাসনামলে কোন্ মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি.ডি.পি নেতা বা রাজাকার, আলবদর কোথায় কত শত হাজার বা লক্ষ নরনারী হত্যা করেছে তা এরা অবলীলাক্রমে নিজেদের অফিসে বসে বলে চলেছে, কাগজের পাতায় ছাপিয়ে চলেছে। কোন ডোবা বা ইন্দারা থেকে উদ্ধারকৃত কোন কংকাল বা হাড়ের স্তূপের ফটো দেখেই এরা বলে দিচ্ছে। কোন্ প্রগতিশীল ব্যক্তিদের লাশ এগুলো আর কোন্ ধর্মান্ধ ব্যক্তি হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগের স্বীকার মতে যে পঁচিশ হাজার পাক সেনাকে এদেশে হত্যা করা হয় বা আন্দোলনের নয় মাসে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন স্থানে দালাল হিসাবে যাদেরকে হত্যা করে এবং উর্দুভাষী নরনারী বিভিন্ন সময়ে যারা মৃত্যুর শিকার হয়, তাদের কোন কংকাল বা হাড়ের চিহ্ন এদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল সাংবাদিকরা দেখতেই পেলেন না। রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক জারীকৃত হুকুমনামাগুলোর এবং বিশেষ করে দালাল আইনের জারী গান গাইতে এরা শুরু করেছে। সামরিক বাহিনীর যে কোন কু-কর্মকে সরকারের প্রতিপক্ষদের উপর এমনকি নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার

জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আমার সম্পর্কে লিখা হলো 'কুষ্টিয়ায় প্রখ্যাত দালাল সা'দ আহমদের বাসার নিকটে একটি ইন্দারার মধ্যে বহু মাথার খুলি পাওয়া গেছে.....।' বহু বিশ্লেষণ দিয়ে আমাকে বিভূষিত করা হয়েছে এবং আমি যে একজন বিরাট খুনী সে রায়ও তারা দিয়ে দিয়েছে। আমার নিজের বাড়ীতে বা বাড়ীর পার্শ্বে কোন ইন্দারার অস্তিত্ব ছিলনা বা নাই। অনেকগুলি বাড়ী পার হয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে রেল কর্মচারীদের বাসার কাছে ওদের ব্যবহৃত একটি ইন্দারা আছে। ওখানে কোন মাথার খুলি পাওয়া গেছে বলে কারো জানা নেই। তবে যদি পাওয়া যায়ই সেটা কি আমার বাড়ীর পাশে হলো? আর শহরের কোন প্রান্তে বা অপর কোন স্থানে ইন্দারা থাকলে নিশ্চয়ই তাও আমার বাড়ীর পাশে অবস্থিত একথা বলা চলে না। এরূপ হাজারো রচিত কাহিনী খবরের কাগজের পাতা উল্টালে পাওয়া যেত যা এদেশের এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের সততা ও কর্তব্য বোধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে।

প্রথম দিকে দালাল আইন প্রণয়নের পেছনে প্রবল জনসমর্থন ছিল। পরিতাপের বিষয় দেখা গেল যে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এই আইন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আইনের সংজ্ঞা এতই ব্যাপক ছিল যে এক কোটি শরণার্থী ও যারা ভুয়ো মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পেরেছে তারা ছাড়া দেশের সকল মানুষকেই দালাল বলে সাব্যস্ত করা যেত। এই সুযোগে বহু সাধারণ মানুষের গায়ে দালাল তকমা লাগিয়ে দিয়ে মুক্তিপণ আদায়, সম্পত্তি দখলের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। দেখা যায় এই আইনটি জনমনে ব্যাপক ভীতির সৃষ্টি করে। আইনটি প্রণয়নের সময় যে জনসমর্থন ছিল ক্রমশ তা লোপ পেতে থাকে। বিভিন্ন মহল থেকে দালাল আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রথম দিকে যে সমস্ত সমালোচকরা এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সহ-সভাপতি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই দালাল আইনের অপব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে আতাউর রহমান খান বলেন, 'জাতি পুণর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধান না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য। তিনি বলেন, 'যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে' প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না। তিনি জাতির জন্য জরুরী সেই মুহূর্তে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার এবং সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাকবাহিনীকে সমর্থনদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, বহু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি পারিবারিক শত্রুদের কারাবরণে বাধ্য করছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি

বলেন, এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।[১৫৯]

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে যে প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠিত হয় তার নামই জাতীয় রক্ষীবাহিনী। এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা, চোরাচালান রোধ করা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতিহত করে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। তবে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করাই ছিল এর লক্ষ্য। তাদের অভিযোগ ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শেই শেখ মুজিব এই বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।
রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে "সাপ্তাহিক হলিডে"- তে প্রকাশিত 'দি ফেস অব টেরর' শীর্ষক রচনায় বলা হয়েছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শে বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের নির্মূল করার লক্ষ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলেছে। আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রবন্ধে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীতে তাদেরই নিয়োগ করা হচ্ছে যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বলা হয় যে রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে ভারত তার আধিপত্য বাংলাদেশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। আরও মন্তব্য করা হয় যে, মুক্তি যুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এমন মুক্তি যোদ্ধাদের নির্মূল করতে ভারতীয় সহায়তায় যে মুজিব বাহিনী গড়ে উঠেছিল তার একটি সম্প্রসারিত রূপ হলো রক্ষীবাহিনী। জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে বলে প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

“ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ” গ্রন্থে আহমদ মুসা উল্লেখ করেছেন যে, স্বাধীনতার পর পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শেই শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়। একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা প্রয়োজন সেনাবাহিনী বা পুলিশ আইনের মতো তেমন একটি আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে উপস্থিত ছিল না। একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হলেও এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই আইনের সংজ্ঞায় 'রক্ষী' শব্দটি বাহিনীর অফিসার পদে সাধারণ সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হবে সরকার নির্ধারিত পন্থায় এর জন্য 'রক্ষী' এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে (অনুচ্ছেদ ১৮)। পরিচালনা ব্যবস্থাপনার জন্য আইনে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত বাহিনী এই বাহিনী তদারকীর দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং আদেশে উল্লেখিত আইন ও তার

---

[১৫৯] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৭১।

বিধানাবলীর ভিত্তিতে পরিচালকের মাধ্যমে এই বাহিনী প্রশাসিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অথবা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এ বাহিনী কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ৭)। সরকার তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক এবং অন্যান্য অফিসার বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করবেন। আইনের আওতাধীন রক্ষী এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং শৃঙ্খলাবিধি আরোপ করা হচ্ছে বলে আইনের ১১ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়। ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উক্ত আদেশবলে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিংবা বিশেষভাবে নির্দেশিত নিয়মে, এই আদেশের আওতাধীন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুত করা যাবে।

আদেশে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাহিনীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবেন।

এই ছিলো রক্ষীবাহিনী আদেশের মূল গঠনতন্ত্র। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, অপরাধ দমন এবং সূত্র অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ বাহিনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী আদেশ ছিলো পুরোপুরিভাবে নীরব এবং ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও যুক্তি এ প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরনের এবং বাহিনীর বিস্তারিত কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তার ছাপ ছিলো না।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারি কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগগিরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানতঃ যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তা হল, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মত এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিকভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি নিরূপণের কোন বিধান ছিলো না। অচিরেই এগুলো আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যেকোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুরসংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং

এর ফলে জনমনে ক্রমশ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে।

যেকোন আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিলো কঠিন। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মতো কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিল না। তাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য আইনের: 27/307 যেকোন গৃহ তল্লাশী বা সম্পত্তি সীজকরণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলাবারুদের হিসাব রাখার কোন বালাই ছিলো না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন আচরণবিধি কিংবা কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিলো না।

যখন রক্ষীবাহিনীর আচরণ এবং ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন ২০ মাস কার্যধারা পরিচালানায় ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনীর কোনো কোনো তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেও একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের মূল আদেশে প্রথমবারের মতো একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ৮ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে অনেক পিছিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যেকোনো আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যেকোনো সদস্য বা অফিসার ৮ নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোনো আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার; (২) যেকোনো ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশী বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকানো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তার সম্পত্তি হস্তগত করার পর একটি রিপোর্ট সহ তাকে নিকটবর্তী থানার হেফাজতে প্রেরণ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যেকোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

রক্ষীবাহিনী সরকারের কোন নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হতো। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজকর্ম করতো। বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ এবং সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত দাবীর পরেও এদের গঠনপ্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।

জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসতো। এদের পোশাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাকের সাদৃশ্য ছিলো এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর শ্রষ্ঠা বলে দাবী করতো।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সরকারকে প্রচুর বদনাম কুরোতে হয়। এই বাহিনী কালোবাজারি, মজুতদারি ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন নিয়ে সরকারের উপর আদালত তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে। রক্ষীবাহিনীর দাপটে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সরকার কয়েকবার জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন সংশোধন করলেও তা ছিল রক্ষীবাহিনীর কার্যাবলীকে বৈধতা প্রদান ও বাহিনীর পদাধীকারিদের মধ্যে পদমর্যাদা সুস্পষ্ট করে দেওয়া। জনস্বার্থে এই বাহিনী ব্যবহার করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি।[১৬০]

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে প্রবল সংঘাত দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে প্রথমে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের পৃথক দুটি সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে যায়। এরপরে আওয়ামী লীগের কৃষক সংগঠন জাতীয় কৃষক লীগ ও শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগেও ভাঙন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে জন্ম হয় নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ)।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে একটি ৭-সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে জাসদের অভ্যুদয় দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সূচনা ঘটায়। এ সময় আওয়ামী লীগের যুবক কর্মীদের একটি বিরাট অংশ দলের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন। দেশে মনের মতো কোনো সংগঠন না থাকাতে নতুন এই দল তাদের বিপুল ভাবে আকর্ষণ করে। দলটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটাতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভকে পুঁজি করে জাসদ অতি শীঘ্রই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। জাসদের জনসভাতে প্রচুর লোক-সমাগম হতে থাকে। এ সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত ডানপন্থী দলগুলোর নেতা কর্মীরাও জাসদের জনসভায় যোগ দিয়ে সভার আয়তন স্ফীত করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করতে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে দেশে অবস্থানকারীদের ওপর আওয়ামী লীগ সবসময় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছিলো। তাদের মতে দেশে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ছিল মাত্র তিনটি। কৌশলগত কারণে জাসদ তাদের ভাবাবেগকে মূলধন করেও দলের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে। উপরন্তু জাসদকে দেশপ্রেমিক দল হিসেবে চিহ্নিত না করার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ দলের অধিকাংশ নেতাকর্মীই স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু তাহের, সিরাজুল আলম খানের মতো অন্যান্য প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা জাসদ নেতৃত্বের পুরোভাগে থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন বলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বামপন্থী কর্মীরা জাসদের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে থাকেন। এভাবে একবছর যেতে না যেতেই জাসদ দেশের একক বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

[১৬০] আহমেদ মুসা। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ।* (ঢাকাঃ বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮): ২২-২৫।

এ সময় সামাজিক সুবিচার ও বিপ্লব সংগঠনের প্রত্যয় নিয়ে আরো বেশকিছু সশস্ত্র দলের অভ্যুদয় ঘটে। কম্যুনিস্ট পার্টির 'হক গ্রুপ' এ সময় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে থাকে। টিপ বিশ্বাস ও ওয়াহিদুর রহমানের সংগঠন রাজশাহী ও পাবনা এলাকায় সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তবে এদের মধ্যে সবচাইতে সুসংগঠিত দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন মেধাবী প্রকৌশলী সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'। যুদ্ধকালে অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র একটি সুশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ যুবকদের সমন্বয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছিলো। দলটি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে তার সংগঠন গড়ে তোলে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কম্যুনিস্ট গুপ্ত সংগঠনগুলোতে সক্রিয় অন্যান্যদেরও এই দলের অন্তর্ভুক্তি করা হতে থাকে। খুব শিগগীরই সর্বহারা পার্টি' একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাসম্পন্ন শক্তিশালী গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ন্যাপ-এর মওলানা ভাসানীও তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পন্থায় তার রাজনৈতিক ভূমিকা অব্যাহত রেখে চলছিলেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অবস্থিতির নমুনা পাওয়া যেতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তখনো পুরোপুরিভাবে সুসংহত হয়ে কোনে ইতিবাচক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে না এলেও জনমনে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দানা বেধে উঠছিলো। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের প্রথম স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে সর্বপ্রথম এই বিক্ষোভের আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রার্থীর মনোনয়ন দেয়া বা তার জন্য প্রচার চালনায় বিরত থাকে। তবুও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল সব সময়েই তাদের সমর্থকদের অনুকূলে এই নির্বাচনে অনানুষ্ঠানিকভাবে অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ আমলেও এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি এবং নিজস্ব সমর্থকদের পাশ করানোর জন্য দল থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, এই স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার সমর্থকদের অনুকূলে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা নিযুক্ত করলেও সরকার বিরোধী বিপুল সংখ্যক প্রার্থী এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

এভাবে জনগণের সরকার বিরোধী অংশে বিক্ষোভ ক্রমশঃ দানা বাঁধছিলো। স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের এই বিক্ষোভকে সাফল্যজনকভাবে কাজেও লাগান। সারাদেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্নীতি ও প্রশাসনযন্ত্রের অব্যবস্থার প্রতিবাদে অসংখ্য জনসভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ঢাকায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ নং ধারা জারী করেন। এতে ৪ জনের অধিক লোকসমাগম, মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যে সরকার এতদিন নিজেকে গণতন্ত্রী ও জনপ্রিয় বলে দাবী করছিলেন, সে সরকারের জন্য এটি তখন চুড়ান্ত পরাজয় বলেই বিবেচিত হয়। বিরোধী দলগুলোও সরকারের এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আতাউর রহমান খান ১৪৪ ধারা জারীর এই ঘটনাকে অগণতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই পথ পরিহার করার জন্য আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিলো। অথচ সরকার পক্ষান্তরে সেই পথই অবলম্বন করছেন। তিনি বলেন, ১৪৪ ধারা জারীর মধ্য দিয়ে সরকারের পতনের প্রক্রিয়াই শুরু হয়েছে।

সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জাসদ সারা দেশব্যাপী ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে জাসদ আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয় তবে আওয়ামী লীগের প্রভাব ও জনপ্রিয়তার কাছে জাসদ ছিল একটি নগন্য রাজনৈতিক দল। এছাড়াও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব, মতাদর্শগত বিভ্রান্তি এই দলের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ ও সরকারের কঠোর দমন নীতির ফলে এই দল প্রচন্ড চাপের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একটি জোট তৈরি করে আন্দোলনে সামিল হয়। তবে এই জোট খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ন্যাপ(মো), CPB কে নিয়ে পাল্টা একটি জোট তৈরি করে। মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ, CPB ও তার দল একমাত্র দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে আর কোনো দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল নেই।[১৬১]

উপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় সেটি হল এক শ্রেণির লেখক, সমালোচক, রাজনীতিবিদ মুক্তি আন্দোলনে শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে একদল রাজনীতিবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন সেগুলো যথেষ্ট জোড়ালো ও শক্তিশালী। তাদের লেখনীতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে অসহায় বাঙালি জাতিকে মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন সেই বিষয়টি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর প্রত্যক্ষভাবে মুক্তি আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ না করতে পারলেও সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তার ডাকে সাড়া দিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানকেও অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারত মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এই জন্য ভারত তার স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগকেই বিশ্বাস করত, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে ভারত বিশ্বাস করত না। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় সহায়তা প্রেরণ করত আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে। বিরুদ্ধবাদী লেখকদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেছেন একদল লেখক। তাদের বক্তব্য ভারত বাংলাদেশের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে সহায়তা করেছিল এই ধারণা ঠিক নয়। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের পর এককোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এরফলে ভারতের অর্থনীতি ও আইন শৃঙ্খলার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলে তা যেন ভারতের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল ভারতকে। আওয়ামী লীগ ভারতের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হলে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। তাই ভারত আওয়ামী লীগকে একমাত্র

---

[১৬১] সা'দ আহমদ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* (www.pathagar.com, ১৯৯০): ১৭৯-১৮০।

বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে করত। আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য চরমপন্থী ভারত বিরোধী রাজনৈতিক দল মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতি ভারতকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় আওয়ামী লীগ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করলে তা ভারতের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা ছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছিলেন। এককোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও ভারতের সাধারণ মানুষ উদার হস্তে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের জন্য আন্তর্জাতিক জনমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেছিলেন। সীমান্তে তীব্র উত্তেজনার কারণে ভারতের উপর যে প্রবল অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল সেই চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ভারতের এই ভূমিকাকে যারা ছোট করে দেখেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।[১৬২]

আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে যে, স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে মুক্তি যুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করে ভারত। এই লক্ষ্যে ভারতের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় মুজিব বাহিনী। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃত প্রস্তাবে মুজিব বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অতি বাম ও দক্ষিণপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি আন্দোলনকে জনস্বার্থে পরিচালিত করা। শেখ মুজিবের প্রতি প্রবল অনুরাগ, আনুগত্য রয়েছে এমন দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় মুজিব বাহিনী। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থিত করতে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়নি।[১৬৩]

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানায়। আওয়ামী লীগের পক্ষে এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই সময় সরকার বলতে যা বোঝায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ ধ্বংসের স্তূপে পরিনত হয়। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। এছাড়াও যুদ্ধবন্দী সমস্যা, মুক্তিযোদ্ধা ও এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পরে। জাতীয় সরকার গঠন করতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবার সম্ভাবনা ছিলো।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবের ডাকেই সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন অব্যাহত ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন বাঙালি জাতির অসংবিদিত নেতা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে উপস্থিত না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন

---

[১৬২] ইকবাল, মুহম্মদ জাফর। *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮): ৭-২০।

[১৬৩] মাসুদুল হক। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০): ৯৩।

হতো, দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। দেখা গেছে ১৬ ডিসেম্বরের পর বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা তাদের নিজস্ব এলাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তবুও দেখা যায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি শেখ মুজিব কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি।

১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি ইংল্যান্ডে শেখ আব্দুল মান্নানকে জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যের দিকে তাকালে এটা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয় যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের উদারতা কিছু কম ছিল না। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) এবং ১০ই জানুয়ারি (১৯৭১) নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জীবিত আছে; তাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁরা সরকার গঠন করবে। কিন্তু তোমরা যদি চাও অন্যরাও সরকারে যোগ দেবে, তাহলে সেই সুযোগ আমি দেবো। ইলেকশান করা হোক, তোমরা দেশে আসো, দেশের জন্য কাজ করো। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, সরকার ওরাই গঠন করবে। আমি গিয়ে বাগিয়ার নদীতে ছাতা মাথায় দিয়ে মাছ ধরবো। তোমরা একটা স্বাধীন দেশে এখন বসবাস করছো। এরপর তোমাদের আর কিছু আমার দেওয়ার নেই। আমি জীবনের দীর্ঘ ১১টি বছর জেল খেটে আমার পুত্র-কন্যাকে অবহেলা করে নিজের ঘর-সংসার বাদ দিয়ে দেশের কাজ করেছি। এখন তোমরা কিছুটা করো। তোমরা অনেক সুযোগ পাবে এবং আমি তোমাদের সেই সুযোগ দেবো, অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে যারা গণনির্বাচিত, তারাই সরকার পরিচালনা করবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিকট এই সরকারের আইনগত বৈধতার জন্যই বঙ্গবন্ধু এই প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।[১৬৪]

শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপথগামী করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু শক্তি সক্রিয় রয়েছে। এই কারণে দ্রুত একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লাখ মানুষের সামনে বলেছিলেন, আপনারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়াই করে যাব।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন মহল থেকে দালালদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের সময় যারা মানবতা বিরোধী জঘন্য কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সমস্ত দালালদের আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ও সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, দেশের আইনেই দালালদের বিচার করা হবে। কেউ আইন-শৃঙ্খলা হাতে তুলে নেবেন না। এই উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান দালাল আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনটি কিছু কিছু মহল অগণতান্ত্রিক, মানবতা বিরোধী বলে দাবি করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে দালাল আইনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই আইনটি জনরোষ থেকে দালালদের রক্ষা করেছিল। দালালরা এই আইন অনুযায়ী কারাগারে নিরাপদে অবস্থান করতে পেরেছিল। দালাল আইনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু গুরুতর

---

[১৬৪] শেখ আব্দুল মান্নান। *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান।* (বাংলাদেশঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স): ১২৩-১২৪।

অপরাধ ছাড়া সমস্ত দালালকে ক্ষমা প্রদর্শন করে জাতি গঠনের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৬৫]

পাকিস্তান আমল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ, সেনাবাহিনী ছিল প্রবল বৈষম্যের শিকার। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সমস্ত বাহিনী রয়েছে তাদের বিকাশের জন্য কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পুলিশ ও সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের ফলে এই সমস্ত বাহিনীর অনেক সদস্যের মৃত্যু হয়। খুব সহজভাবে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছিল দুর্বল। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। এই বাহিনীর কাজ ছিল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাজে সহায়তা করা। আওয়ামী লীগ সরকার মনে করত যে, এই সমস্ত দেশপ্রেমিক যুবকরা জাতি গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে।

সরকারের জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্যোগকে বিরোধী দলগুলি সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তারা অভিযোগ করতে থাকে যে, রক্ষীবাহিনী হলো বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি বাহিনী। এই বাহিনী আওয়ামী লীগের স্বার্থই সুরক্ষিত করবে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, রক্ষীবাহিনী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, কালোবাজারি, মজুতদারি, চোরাচালান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই দুর্নীতিগ্রস্তরা আতঙ্ক বোধ করতেন। এছাড়াও পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী।[১৬৬]

স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের শাসন ব্যবস্থাকে এক অংশের বিরোধী রাজনৈতিক দল সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সংকট যেমন, আইন-শৃঙ্খলার অবনমন, অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি ঘটনাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। তারা দেশের এই সংকটের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে থাকে। জাসদ, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি, ভাসানী ন্যাপসহ অতিবাম ও চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পরে। সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনেরও ডাক দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বেপরোয়াভাবে হত্যা করতে শুরু করে এই সব রাজনৈতিক দল। বহু আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যা করা হয়। তারা অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের মাধ্যমে দেশে এক অরাজকতার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় চরমপন্থীদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কয়েকবার সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয় সরকার। পুলিশ ও রক্ষিবাহিনীর মাধ্যমে চরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার।

---

[১৬৫] ড. শরীফ আহমদ, কাজী নূর-উজ্জামান এবং শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত)। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।* (ঢাকাঃ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭): ১৭-২২।

[১৬৬] আহমেদ মুসা। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ।* (ঢাকাঃ বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮): ২৭-২৮।

চরমপন্থী এই দলগুলি বিভিন্ন থানা থেকে অস্ত্র লুট করতে শুরু করে। বহু ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপরেও এরা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের ডাক দেওয়া হয়। কয়েকটি চরমপন্থী দল স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। এই অবস্থায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে অস্ত্র-শস্ত্রসহ বহু দুষ্কৃতকারীকে সরকার গ্রেফতার করে।[১৬৭]

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার ১৯৭৪ সালে জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য হয়। তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ১৯৭৫ সালে সরকার সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তিলে তিলে গড়ে তোলা তাঁর স্বপ্নের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সর্বসাধারণের জন্য একটি জাতীয় দল, যার নাম ছিল কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকেরই এই দলে সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল।

বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংবিধানের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে নাগরিক বর্গের জন্য মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকে। সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব রয়েছে বিচার বিভাগের হাতে। নাগরিকরা সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের ফলে নাগরিকরা মৌলিক অধিকার ভোগের সুযোগ পায়। খুব সহজভাবে বলা যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। পাকিস্তান আমলে শাসকগোষ্ঠী বিচার বিভাগের কণ্ঠ রোধ করে ও নিপীড়নমূলক আইন প্রনয়ণ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শাসন, শোষণ চালাতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর এই নিপীড়নমূলক শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রুখে দাঁড়ায়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। ১১ই জানুয়ারি অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় দেশে আইনসভা বলতে যা বোঝায় তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রপতির হাতে। আইন বিভাগীয় কাজ ও শাসন সম্পর্কিত কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশে। এই সময় ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহসহ সকল অধিকার ছিলো স্থগিত, হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় রীট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ, উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতের উপর হুকুমনামা জারী করা, নিষিদ্ধকরণ, ক্যুও ওয়ারেন্টো, নিম্ন আদালতে বিচারিত মকদ্দমার নথিপত্র প্রেরণার্থে উচ্চতর আদালতের তলবপত্র জারী ইত্যাদির কার্য সম্পাদনে হাইকোর্টে'র ক্ষমতা স্থগিত করে রাখা হয়।[১৬৮]

---

[১৬৭] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৩৬৮-৩৬৯।

[১৬৮] The High Court of Bangladesh order 1972.

এইভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকরা ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

ব্যারিস্টার সাদ আহমদ তাঁর 'মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৫ নং ফরমান ও ৯ নং ফরমান ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে দুর্বল করেছিল। তিনি দেখিয়েছেন রাষ্ট্রপতির ৫ নং আদেশের দ্বারা পুরোনো হাইকোর্টের বিলোপ ঘটিয়ে নতুন হাইকোর্ট সৃষ্টি করে তার হাত থেকে রীট জারি করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। ৯ নং আদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করা হয়। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এই দুটি ফরমান জারি করে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তার ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করে নেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় মানুষ। বিচার বিভাগও তার স্বাধীনতা হারায়। তার মতে, ১৯৭২ সালের দালাল আইনও ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী।[১৬৯]

রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান আমলে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিব। ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কারণে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। জীবনের বড় একটা সময় কেটেছিল তাঁর পাকিস্তানের কারাগারে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস গ্রহণ করে। এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় নম্বর অধ্যায়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিকদের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করে। এই অধিকার গুলির সাহায্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন শেখ মুজিব।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ঐতিহ্যগতভাবে যে কোন আধুনিক সংবিধানের অনুসরণে জনগণের সকল রকমের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত সবগুলো ধরনের মৌলিক অধিকারই ছিলো ভারতীয় সংবিধান, পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সাংবিধানের অনুরূপ।

সংবিধানে উল্লেখিত সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭), ধর্মীয় ব্যাপারে বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ ২৮), সরকারী কর্মসংস্থানে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ২৯), আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩১), গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে' রক্ষাকবচ (অনুচ্ছেদ ৩৩), জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুচ্ছেদ ৩৪), বিচার ও দন্ড সম্পর্কে নিরাপত্তা (অনুচ্ছেদ ৩৫), চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৬), সমাবেশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৭), সংগঠনের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩১), চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছদ ৪১), সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪২) এবং গহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (অনুচ্ছেদ ৪৩) ইত্যাদি ব্যাপারে আইনের সংযোগ গ্রহণের নিশ্চয়তা ছিলো।

---

[১৬৯] সা'দ আহমদ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* (www.pathagar.com, ১৯৯০): ২৮-৩২।

শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, সংবিধানে শুধু মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করলেই ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন, নির্ভিক, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। তাই দেখা যায় ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এমন এক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ধারনাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আইনের শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে বৃটিশ শাসনের উৎসসঞ্জাত এই বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবীটি দীর্ঘদিন যাবৎ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে আসছিলো। গণতন্ত্রপ্রেমিক প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং নেতা দেশে আইনের শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে এই দাবী উত্থাপন করে আসছিলেন। বাংলাদেশের মত জটিল প্রশাসনিক পদ্ধতিতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ধারনা কতটুকু কার্যকর হবে, তা ছিলো একটি ভিন্নতর বিষয় কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় সকল সংবিধান প্রণেতারাই এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি আইয়ুব সরকারের মতো কঠিন কেন্দ্র-ভিত্তিক সরকারও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মতো না হয়ে বাংলাদেশ একটি একক ভূখণ্ডের রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, এবং স্বাধীনতার পর জরুরী প্রশ্ন ছিলো বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সুপ্রীম কোর্ট' ও হাইকোর্টে'র মতো দুটি আলাদা বিচার প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করা এবং তাদের গঠন ও কার্যপ্রণালী স্থির করার বিষয়টি সর্বপ্রথম প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমল থেকেই এ ধারণা তীব্রভাবে অনুভূত হয়ে আসছিলো যে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন ঢাকায় হলেও বিচারের সুযোগ সকলের জন্য সম্প্রসারিত করে দেয়ার লক্ষ্যে অন্তত পক্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ গঠন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে গরীব লোকের জন্য তা ছিলো অত্যাবশ্যকীয়, কারণ আর্থিক সংকটের কারণে তাদের অনেকেই সুবিচারের জন্য ঢাকা অবধি আসতে পারতেন না। এই বিষয় দুটির প্রেক্ষাপটে উচ্চতর আদালতের গঠন বিষয়ক প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দেয়।

মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলোতে আইনের প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা ছাড়াও কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ফেডারেল বা সুপ্রীম কোর্ট' গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনেই পাকিস্তান আমলে সুপ্রীম কোর্ট' গঠন করা হয়েছিলো। কিন্তু এককেন্দ্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশে আর সুপ্রীম কোর্ট থাকার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। কাজেই বাংলাদেশে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট' নামে পৃথক দু'ধরনের আদালত গঠন না করে সংবিধানের বিধিবলে হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপীলেট ডিভিশন এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন করে ব্যায়াধিক্য, বিচারবিভাগীয় জটিলতা ও দ্বিচারীতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে আপীলেট ডিভিশনকে সর্বোচ্চ আদালত এবং হাইকোর্ট' ডিভিশনকে এর পূর্ববর্তী আদালত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এককথায়, বিচার প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং এর জন্য একজন মাত্র প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে বলা

হয় যে, প্রধান বিচারপতি ও আপীলেট ডিভিশনের বিচারপতিগণ বসবেন আপীলেট ডিভিশনে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ হাইকোর্ট ডিভিশনে বসে বিচার প্রশাসন পরিচালনা করবেন।

মুক্ত ও স্বাধীন একটি বিচার বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্য বিচারপতিগণ স্বাধীন অবস্থায় থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন (অনুচ্ছেদ ৪ (৪))। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করার পর তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৯৫)। কেউ একবার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলে দুর্ব্যবহার বা অক্ষমতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার পদচ্যুতির প্রস্তাব জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিসূচক সমর্থনে গৃহীত না হলে তাকে (প্রধান বিচারপতিকে) তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৯৬ (২))। সুপ্রীম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে কাজ করবে এবং এর অবমাননার জন্য আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইনসাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবে (অনুচ্ছেদ ১০৮)। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্গত সকল নির্বাহী ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টে'র কার্য পরিচালনায় সহায়তা করবেন (অনুচ্ছেদ ১১২)। সংবিধানের ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবে (অনুচ্ছেদ ১০১)। সুপ্রীম কোর্টের বিধি অনুযায়ী এই নিয়োগপদ্ধতি কার্যকর করা হবে (অনুচ্ছেদ ১১৩)।

১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচারসংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে সবচাইতে ব্যতিক্রমধর্মী বিধানটি ছিলো সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সংক্রান্ত। এতে বলা হয়, বিচারবিভাগে কর্মরত নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনরত ম্যজিষ্ট্রেটদের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টে'র সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল আদালতের ওপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হয়।

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের এই ক্ষমতার কথা বলা হলেও কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাদের উর্ধ্বতন আদালতের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। বরং বিচার বিভাগীয় লোকদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে এবং জেলাজজদের নিয়োগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশের প্রয়োজন হতো। অন্যান্য জজ নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এবং সুপ্রীম কোর্টের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করতেন। বিচারক হিসেবে ৭ বছর অথবা এডভোকেট হিসেবে ১০ বৎসর পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকলে যে কেউ জজ পদের জন্য আবেদন করতে পারতেন। এভাবে বলা যায় অসংখ্য জটিলতা থাকা সত্বেও ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের হাতে দেয়া হয়েছিলো প্রচুর ক্ষমতা। সুপ্রীম কোর্টকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয়েছিলো, যাতে করে এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে।

উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের মতো বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানেও হাইকোর্ট বিভাগকে অন্যান্য ক্ষমতার পাশাপাশি মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারী অরিজিন্যাল জুরিসডিকশন ও ম্যান্ডামাস, সারসিওয়ারি, ক্যুও ওয়ারেন্টো, হেবিয়াস কর্পাস, ইত্যাদি আকারে রীট ইস্যুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো (অনুচ্ছেদ ১০২)। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলো এই যে, সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে প্রযোজ্য হয়, এমন কোনো ক্ষেত্রে আদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের ছিলো না। ৪৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ মারফত হাইকোর্ট বিভাগকে অপরিসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ছিলো মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রীট ছাড়াও বিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোনো শৃঙ্খলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রযোজ্য হয় এমন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য ম্যান্ডামাস এবং সারসিওয়ারী ধরনের রীট ইস্যু করা। তবে ১১৭ নং অনুচ্ছেদ বলে গঠিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহের ওপর রীট জুরিসডিকশন কার্যকর করা যেতো না।[১৭০]

১৯৭২ সালের সংবিধান যে সমস্ত কারণে প্রসংশা অর্জন করেছিল তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি করার কোন সংস্থান রাখা হয়নি। আরেকটি বিষয় হলো জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ পূর্বে দেওয়া জনগণের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই অগণতান্ত্রিক বিষয় দুটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেনি। এই কারণে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় আওয়ামী লীগ সরকার তাদের এই প্রগতিশীল প্রয়াস বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট জটিল আকার ধারণ করে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, মাথাচাড়া দেয় চোরাচালান। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে সামিল হয়। তারা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে শুরু করে। শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেয়। জাতীয় ঐক্য সংহতি বিপদের মুখোমুখি হয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সাফল্য অর্জন করা যায়নি।

পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনী আইন প্রনয়ণ করে সরকার। দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইনের সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হয় জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা। এরফলে সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রনয়ন করে দীর্ঘদিন আসামীকে বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা লাভ করে। রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা তুলে দিয়ে মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয়। এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য ছিল খেয়াল খুশি মতো সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। এক বছর যেতে না যেতেই সরকার ১৯৭৪ সালে জাতীয় জরুরী অবস্থা জারি করে। বেশ কিছু ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়।[১৭১]

---

[১৭০] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৪৭-১৫০।

[১৭১] সা'দ আহমদ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* (www.pathagar.com, ১৯৯০): ১৭৯।

দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ব্যর্থ হয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন পার্লামেন্টে অনুমোদন করিয়ে নেন শেখ মুজিব। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই বাকশাল ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই নতুন শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই সংশোধনের ফলে দেশের মূল সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে উল্লেখিত বিচার প্রশাসনেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রদবদল সাধন করা হয়। এই উপমহাদেশের প্রতিটি দেশের প্রতিটি সংবিধানে বিচার বিভাগকে আইন পরিচালনায় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও চতুর্থ সংশোধনীবলে একে সরকারের নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা, মর্যাদা ও কার্যাবলী নিদারুণভাবে সংকুচিত করা হয় এবং মূল বিষয়াদিতে বিচারকদের ক্ষমতাও সংকুচিত করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীবলে বিচারবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়। বহুদিন থেকেই বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের বাড়াবাড়ি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিধান করে আসছিলো। কাঠামোগত রদবদলের ফলে সে প্রক্রিয়া নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে। কিন্তু শেখ মুজিবের উপনিবেশবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান সূচিত করে নয়া অর্থনৈতিক ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিচারবিভাগে পরিবর্তন সাধনের সমস্ত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান করেন।

উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের মূল সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পূর্ণ পৃথকীকরণ একটি মৌল নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছিলো। তদনুসারে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বিধানের পক্ষে পর্যাপ্ত আইন-বিধিও এতে সংযোজিত করা হয়েছিলো। বহুদিন যাবৎ বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ স্বীকৃত বলে বিবেচনা করা হচ্ছিলো সেগুলো হলো: (১) বিচারকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব; (২) নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে অবস্থান করে কাজ করার জন্য বিচারকদের অধিকার এবং (৩) সুনির্দ্দিষ্ট একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগের মূল ভিত্তিসহ গোটা কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং তখন থেকে তিনি আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে বিচারক নিয়োগে বাধ্য ছিলেন না (অনুচ্ছেদ-৯৫)। বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগের বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়। এতে বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি দুর্ব্যবহার কিংবা অযোগ্যতার প্রেক্ষিতে যে কোনো সময়ে প্রধান বিচারপতিসহ যে কোনো বিচারককে অপসারিত করতে পারবেন। এভাবে চাকুরীর কার্যকালের মেয়াদের ব্যাপারে বিচারকবৃন্দ যে নিশ্চয়তা পেয়ে আসছিলেন তা পুরোপুরিভাবে প্রত্যাহার করা হয় এবং তখন থেকে যে কোনো বিচারকের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির একটি আদেশই ছিলো যথেষ্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ না করে সুপ্রীম কোর্টের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির ওপর সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হয় (অনুচ্ছেদ-৯৮)।

অধঃস্তন আদালতসমূহে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্বও রহিত করা হয়। সংবিধানের ১১৫ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে, বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিনিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। এই সংশোধনী শুধুমাত্র বিচারকদের চাকুরীর নিরাপত্তাই ব্যাহত করেনি, একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার বিভাগের মর্যাদার ওপরও আঘাত হেনেছে। এভাবে জেলা অথবা অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা রহিত করে জেলা জজ কিংবা অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তি পরিবর্তন করে সেখানে নির্বিচারে নিয়োগদানের পথ উন্মুক্ত করা হয়। একইভাবে মূল সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অধঃস্তন বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের (নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) সমস্ত ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। উক্ত সংশোধনীতে ১১৬ (ক) নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে যদিও বলা হয় যে, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন, তথাপি বিচার প্রশাসনে আনীত ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উক্ত সংশোধনীবলে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের কোনো মৌলিক ক্ষমতা বিচারক এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেটদের দেয়া হয়নি।

মূল সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে রীট অধিকার ও অন্যান্য নির্দেশ প্রয়োগের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পন করা হয়েছিলো।

বহুদিন যাবতই এই ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে আদালতের অধিকার ছিলো ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত। এ ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিপন্থী যে কোনো কার্য সাধন থেকে বিরত রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারীর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিলো। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীতে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগের জন্য একটি সুপ্রীম সাংবিধানিক আদালত গঠন করা হয় (নতুন ৪৪ নং অনুচ্ছেদ)। এভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ব্যাপারে হাইকোর্টের ঐতিহ্যগত অধিকার খর্ব করা হয়। উপরন্তু সংশোধনীর নতুন ১০২ নং অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের ওপর থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারীর বিধানও প্রত্যাহার করা হয়। সংশোধনীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানবলে সমস্ত ট্রাইব্যুন্যাল ও অধঃস্তন আদালতের ওপর সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধিকার সংকুচিত করে কেবলমাত্র অধঃস্তন আদালতের ওপর এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র সংকুচিত করে আনা হয়। এভাবে সংশোধনীর এক সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিচার বিভাগের মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তা সরকারের একটি অধঃস্তন প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসে। বিচার প্রশাসন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কোনো বিকল্প বিধানও এই সংশোধনীতে সংযোজন করা হয়নি।[১৭২]

দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের দিকে তাকিয়ে একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, এই দুটি সংবিধান সংশোধন বিচার বিভাগের কণ্ঠরোধ করেছিল। বিপন্ন করেছিল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। তবে শেখ মুজিবুর

---

[১৭২] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ৪২২-৪২৪।

রহমান বলেছিলেন বাকশাল কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। জাতির সামনে যে সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই সংকট থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ও আমলাতন্ত্রঃ পাকিস্তান কাঠামোর ভিতর অবস্থানকালেই আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, উপনিবেশবাদী কায়দায় প্রণীত প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে দেশে একটি গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটানো হবে। পাকিস্তান আমলে আমলাতন্ত্র ক্রমশ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকায় এই প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে জোরালো হতে থাকে। গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং ইস্কান্দার মীর্জার মতো আমলারা পাকিস্তানের অভ্যুদয় পর্যায়ে চরম অসাংবিধানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বদৌলতে যে এলিট গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে, তারা সবসময়েই নিজেদের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত অধিকার আদায়ের সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে আমলাতন্ত্রকে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসক এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণীর প্রতিভূ বলেই মনে করা হতো। এই ধারণা শুধু উচ্চতম ক্যাডার সার্ভিস এবং রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করেনি, ঊর্ধ্বতন আমলা এবং সরকারী প্রশাসন গঠনকারী অসংখ্য নিম্নপদস্থ ক্যাডারের মধ্যেও নিদারুণ ভারসাম্যহীনতার উদ্ভব ঘটিয়েছিলো। দেশের সামগ্রিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই এলিট শ্রেণী একটি বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এরা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও দেশের বিপুল জনসাধারণ এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের তীব্র আক্রমণে ক্রমশ তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছিলেন।

গতিশীল একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রণয়নের স্বার্থকে সামনে রেখেই আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচীতে সমাজ কাঠামো পুণর্বিন্যস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলো। এরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস অবলুপ্ত করে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন পরিচালনা করা হবে। ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কর্মচারীদের মধ্যেকার আয়বৈষম্য হ্রাস করার ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছিলো। স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য প্রবল দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। অনেকদিন আগে থেকেই নিম্ন বেতনভূক সরকারী কর্মচারীদের বিশালতম অংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছিলো। ১৯৫৪ সালে ২১ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের সময়ই আওয়ামী লীগ উপরোক্ত বেতন বৈষম্য হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে এই দল দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সংক্ষেপে বেসামরিক প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো নিম্নরূপঃ (১) আওয়ামী লীগ এলিট ক্যাডারসার্ভিস অবলুপ্ত করে প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে "গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের" পক্ষপাতী ছিলো; (২) বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের সহায়তায় এরা নির্বাচিত জেলা প্রশাসন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো; (৩) এই দল মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করে মূল প্রশাসনিক ইউনিটের পরিধি বিস্তৃত করে স্থানীয় সরকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার সুপারিশ করেছিলো; (৪) এই দল নতুন চাকুরীবিধির ভিত্তিতে নতুন পেশাদারী ক্যাডার

কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাব রেখেছিলো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে এরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অত্যাচার দমনের জন্য প্রশাসনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলো।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনকালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও এই প্রতিশ্রুতিগুলো একই ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলছিল। এতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গোড়াপত্তনের উপযোগী একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রগতিশীল প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ যা চেয়েছিলো, তা হলো যে কোন উপায়ে আমলাতন্তের ওপরে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক এলিট শ্রেণীর মুলোৎপাটন করার চেষ্টা করেছিলো। এই দুটি শক্তিই পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলো এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর এরা ছিলো হুমকী বিশেষ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন অথবা আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে পরিকল্পনাই থাকুক না কেন, আওয়ামী লীগ প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণ ও বেতন বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে তার চাপ অব্যাহত রেখেছিলো। ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত ভাষণে শেখ মুজিব আমলাদের প্রতি বিগত দিনের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করে জনগণের সেবক হিসেবে পরিচয় দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, একটি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতি গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। দালাল আদেশ এবং রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে যত বিরূপ প্রতিক্রয়াই সৃষ্টি করুকনা কেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা আওয়ামী লীগকে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো পুণর্বিন্যস্তকরণের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছিলো।[১৭৩]

বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়েই তাজউদ্দিন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন হ্রাসের এক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট আমল থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে, না যুদ্ধবিধস্ত অর্থনীতির দুর্যোগ কবলিত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কোলকাতায় বসে প্রবাসী সরকার আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগাদেশ প্রণয়নের সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকারী চাকুরেরা তাদের বেতন ও পদমর্যাদা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা পাবেন। কিন্তু কোলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ৭ দিনের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ পরবর্তী বেতন কাঠামো প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বেতন হ্রাস করে 'কৃচ্ছতা' অবলম্বনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সকল সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য করা হয়। বেতন কাটার পর বাকী অংশ জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ভিত্তিতে সঞ্চিত রাখার সরকারী নির্দেশও এতদপ্রসঙ্গে জারী করা হয়। এছাড়াও সরকার নূন্যতম ৫০০ টাকা মাসিক বেতনভোগী কর্মচারীদের কোন ইনক্রিমেন্ট না দেয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন।

---

[১৭৩] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৯২-৯৫।

বিদ্যামান পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তের কেউ বিরোধিতা করেননি, বরং জনগণ এই সিদ্ধান্তকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু এর পর থেকেই বেসরকারী চাকুরেদের উপরও কৃচ্ছতা অবলম্বনের জন্য অব্যাহত চাপ আসতে থাকে। ফলে ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ৫নং আদেশবলে বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সকল সংগঠনের কর্মচারীদের বেতন ও পারিতোষিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে বেসরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সঙ্গতিও বিধান করা হয়। এই ঘোষণার ফলে সরকারী ও বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের নিদারুণ অবনতি ঘটে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত উভয় খাতে এই অসন্তোষ অব্যাহত থাকে। শেষপর্যন্ত সরকার একটি জাতীয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ২০০০ টাকায় নির্ধারণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বেসরকারী খাতে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয় শ্রেণীই সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরণে অসম্মতি জানান।

বেতন হ্রাসের এই সরকারী নির্দেশ পরবর্তীকালে এক সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে আনে। মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যহার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় বিশেষ করে সরকারী চাকুরেদের মধ্যে ত্যাগ ও কৃচ্ছতার সকল মনোবাসনা লোপ পায়। বেতন হ্রাস সাধারণত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করলেও অচিরেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীরাও নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হন। ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সরকারী কর্মচারীদের বেতনহ্রাসের মধ্যে একটা ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান থাকায় এবং অপরদিকে হ্রাসকৃত বেতন পরিশোধের প্রক্রিয়াও ত্রুটিপূর্ণ থাকায় সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ায় উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের এই নৈতিক অধঃপতন নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত ভিত্তিকে অত্যন্ত দুর্বল করে তোলে।

একই সময় দেশপ্রেমের মানদণ্ড নির্ধারণ নিয়েও সরকারী কর্মচারীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। যারা মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবাসী সরকারে যোগ দিয়েছিলেন তারা সকল পর্যায়ে নিজেদের দেশে অবস্থানকারী কর্মচারীদের তুলনায় অধিক দেশপ্রেমিক বলে দাবী করতে থাকেন। ফলে ভারত প্রত্যাগত ও দেশে অবস্থানকারী কর্মচারীদের মধ্যে এক ভয়াবহ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ইতিমধ্যেই আওয়ামী দলীয় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ভারত প্রত্যাগত অফিসার দেশের বড় বড় পদগুলো দখল করে বসেছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেলো যে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনচালানোর মতো যোগ্যতা তাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি, এমন কর্মচারীদেরও বিভিন্ন উচ্চপদে বসানো হতে থাকে। ফলে স্বভাবতই সামগ্রিক প্রশাসন ভারত প্রত্যাগত এবং স্বদেশে অবস্থানকারী এই পৃথক দুই শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে আরেকটি কারনে এই দ্বন্দ্ব প্রকটতর আকার ধারণ করে। স্বাধীনতার পর পরই সরকার কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে পাক সরকারের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করেন। ৫৩ জন সরকারী কর্মকর্তাকে এই বলে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিলো যে তারা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের

মধ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে বেসামরিক খেতাব ও পুরষ্কার গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সরকারী প্রশাসনে শান্তি শৃংখলা পরিস্থিতিকে নতুন সংকটের সম্মুখীন করে। পরিস্থিতি পরে আরো জটিল আকার ধারণ করে যখন সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গী অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হন এবং সিদ্ধান্ত প্রকাশের দিনকয়েকের মধ্যেই কিছু অফিসারকে এবং ক্রমশ প্রায় সকলকেই তাদের পদে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত, এবং ক্ষণেকের মধ্যেই তা আবার প্রত্যাহার করায় সরকারের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়।

যাই হোক, পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নকল্পে আওয়ামী লীগ সরকার নিজেকে একটি বিপ্লবী সরকারের প্রতিভূ হিসেবে দাবি করে জাতীয় পুনর্গঠনের জরুরী লক্ষ্যে গোটা শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নেয়। তদনুসারে প্রণয়ন করা হয় রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ-১৯৭২।[১৭৪] আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হিসবে রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, পাকিস্তান সরকারে যে কোন পদেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, কেউ এ ব্যাপারে তাদের দাবী উত্থাপন করতে পারবেন না। অন্যকথায়, আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশকে একটি 'ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরাসরি নাকচ করে দেয়া হয় এবং সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীগত অবস্থান তখন থেকে কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের করুণার ওপর নির্ভর করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সরকারের বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত কর্মচারিদের ভাগ্যও একই সুতোয় গেথে তাদের ওপরও সরকারী কর্মচারীদের এই বিধি সমানভাবে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশের ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, কোন সরকারী বা কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীকে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলে কোন কারণ না দেখিয়ে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা যাবে। কেবলমাত্র পাকিস্তান আমলেই নয়, যারা বাংলাদেশ সরকারের আমলে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছিলো, তাদের জন্যও এই নিয়ম সমানভাবে কার্যকর হবে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। আইনে আরো বলা হয় যে, সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনগত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৭)।

আইনটি আকারে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সরকারী প্রশাসনে এর ফলাফল ছিলো ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে জাতি পুনর্গঠনের বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণের লক্ষ্যেই এই আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। বাস্তবে সরকারী কর্মতৎপরতায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণের কোন নমুনা দেখা যায়নি। অথচ আইনটি তার নিজস্ব পথেই অগ্রসর হয়। পুনর্গঠনের আবরণে এই আইন প্রশাসনে বরং বিভিন্ন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে চলে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত সরকারী চাকুরীকে যে মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্বের প্রতীক বলে মনে করা হচ্ছিলো, এবং পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে সরকারী কর্মচারীদের যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিলো, এই ঘোষণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার সেই সুদৃঢ় ভিত্তি বালির বাঁধের মতোই ধসে পড়ে।

একথা সত্য যে, বিপ্লবী একটি সরকারের বিপ্লবী কর্মচেতনার সাথে খাপ খাওয়াতে গেলে প্রাথমিকভাবে অনেক আইনই বিসদৃশ বলে মনে হতে পারে। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশের যথার্থ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে

---

[১৭৪] বাংলাদেশ সরকার (চাকুরী) আদেশ, ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির ১ নং আদেশ, ১৯৭২।

হয়তো এ প্রশ্নের একটি সদুত্তর পাওয়ারও অবকাশ ছিলো। কিন্তু বাস্তবে পুনর্গঠনের কোন বিস্তারিত ও সংজ্ঞায়িত পরিকল্পনা হাতে না নিয়ে যেভাবে এই আইন কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো, পক্ষান্তরে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়ার মতো, এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিলো অত্যন্ত ভয়াবহভাবে। এই আইন প্রণয়নের পেছনে সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, এর প্রয়োগপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্র ও বেসামরিক প্রশাসনের উপর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আইনের সাহায্যে অচিরেই ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রশাসন থেকে দালাল ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের অপসাণের কাজ আইনসঙ্গত করে নেয়া হয়। যে কেউ আওয়ামী লীগ সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে বেপরোয়াভাবে তাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা হয়। রাজনৈতিক এলিটদের অনুরাগ ও বিরাগ এড়াবে একদল সরকারী কর্মচারীর দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি বা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। সিনিয়র সচিব থেকে শুরু করে থানা উন্নয়ন অফিসার, প্রকৌশলী থেকে শুরু করে বি আর টি সি'র ড্রাইভার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এই আইন বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করা হতে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক এলিটদের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কায় আতঙ্ক বোধ করতে থাকেন। অন্যদিকে যে লক্ষ্যেই এই আইন কার্যকর করা হোক না কেন, প্রতিক্ষেত্রেই তা প্রশাসনিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে করা হয়েছে বলে সরকারী অজুহাত প্রদর্শন করা হতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশের এই বেপরোয়া প্রয়োগ প্রতিহতকরণে দেশের উচ্চতর আদালতগুলোও খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি। যদিও সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদ বলে সুপ্রীম কোর্টকে তাঁর অন্তর্লীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছিলো, তথাপি উক্ত আদেশের ৭নং অনুচ্ছেদ বলে মতামত প্রয়োগে আদালতের ক্ষমতাও সীমিত করে দেয়া হয়েছিলো। যদিও প্রাথমিকভাবে আদালত দাবী করেছিলো যে এই অনুচ্ছেদবলে জনগণের স্বাভাবিক সুবিচারের নিশ্চয়তা অস্বীকার করা হয়েছিলো এবং দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছিলো যে সংবিধানই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন, তথাপি শেষাবধি আদালত উক্ত আইন বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ করার প্রক্রিয়ায় খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, জনগণের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করে এই আইন যথানিয়মে তার স্বনির্ধারিত লক্ষ্যপথে যাত্রাপথ অব্যাহত রাখে।

১৯৭২ সালে আওয়ামীলীগ সরকার আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ' আইন প্রণয়ন করেছিল। এর একটি হলো সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী থেকে অবসর প্রদানের বয়স সংক্রান্ত, এবং অপরটি দুর্নীতিপরায়ণ ও দালাল অফিসারদের বহিষ্কার সংক্রান্ত। প্রথম আইনটির মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত চাকুরেদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের সময়সীমা তাঁর ৫৫ বছর বয়সে নির্ধারণ করা হয়।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১২১ নং আদেশ, ১৯৭৩ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ (Ordinance XXVI of 1973) এবং ১৯৭৪ সালের ১২ নং আইন- বলে (Act XII of 1974) এই আইনে কতগুলো প্রধান সংশোধনী আনা হয়েছিলো। এর মধ্যে একটি সংশোধনীবলে চাকুরে কিংবা সরকারের যে কেউ অবসর গ্রহণের প্রস্তাব দিতে পারতেন। একইসাথে এই আইনের ভিত্তিতে যে কোন সরকারী কর্মচারী তার চাকুরী জীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হলে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন, আবার একইভাবে সরকার চাকুরীর মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে যে কাউকে কোন কারণ না দেখিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিতে পারতেন। রাষ্ট্রপতির

৯নং আদেশের ন্যায়, সংবিধানে চাকুরী থেকে অবসর দানের কতিপয় শর্ত উল্লেখিত থাকলেও এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারে আদালত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

দালাল অফিসারদের বহিষ্কার সংক্রান্ত আইনটি ছিল আরও কঠোর আইন। এই আইনের সাহায্যে দুর্নীতিগ্রস্ত ও পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন সরকারি কর্মচারীদের উপর শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রশাসনে সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগের বিষয়টিকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দালালদের বিচারের জন্য একটি পৃথক ট্রাইব্যুনাল থাকা সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা দালাল বলে পরিচিত তাদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রনয়নের বিষয়টি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি শেখ মুজিবুর রহমান মেনে নিতে পারেননি। উচ্চহারে বেতন পেয়ে উচ্চপদস্থ আমলারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করবে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর বিরোধী। পাকিস্তান আমলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের উচ্চপদস্থ আমলাদের তুলনায় বেতন দেওয়া হতো খুবই সামান্য। তাদের অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করতে হতো। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল তাঁকে। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে উচ্চপদস্থ আমলাদের বেতন হ্রাস করলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন শেখ মুজিব।

আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম একটি পদক্ষেপ ছিল ১৯৭৩ সালের সরকারের প্রশাসনিক ও বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে সরকার একটি প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটি নিয়োগ করে। সেইসঙ্গে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো সুপারিশ করার লক্ষ্যেও একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটি- এর সুপারিশমালা পেশ করে। এতে পূর্বে বিরাজমান আমলাতান্ত্রিক বিশেষ সুবিধাগুলো অবলুপ্ত করে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে কাঠামোগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। চাকুরীকে সাধারণ ও উন্নয়ন ক্যাডারে বিভক্ত করারও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এর কিছুদিন পরেই বেতন কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। এতে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীর জন্য বহুমুখী বেতন স্কেল সংকুচিত করে ১০টি জাতীয় বেতন স্কেল প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। বেতন কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ এবং স্বল্প ও উচ্চ আয়ের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন ব্যবধান হ্রাস করা ছিলো এর মূল লক্ষ্য। তাই পূর্বে বিরাজমান স্কেলের তুলনায় সাধারণভাবে স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয় এবং উচ্চ আয়ের কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করা হয়। ন্যূনতম বেতন পূর্বেকার ৫৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে স্থির করা হয় ১৩০ টাকায় এবং উচ্চতম বেতন ৪০০০ টাকা থেকে কমিয়ে আনা হয় ২০০০ টাকায়। এর আগে বেতন স্কেলের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশী, কারণ প্রায় প্রতিটি অফিসারের জন্যই ছিলো তার নিজস্ব বেতন স্কেল। সমান যোগ্যতা থাকা সত্বেও এবং সমান পরিশ্রম ও চরিত্রের কাজ করেও ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী কেবলমাত্র পৃথক পৃথক সরকারী অফিস, সচিবালয় বা কর্পোরেশনে কাজ করতেন বলে তাদের বেতন স্কেল ছিলো পৃথক ধরনের। এই বহুমুখী স্কেলকে মাত্র ১০ টি বেতন স্কেলে নামিয়ে আনার কাজটি ছিলো দুরূহ। প্রাথমিকভাবে এই ধারণা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করলেও,

বেতন ও সুবিধা যাই হোক না কেন, সরকারের এই উদ্যোগ একটি সাহসী পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হয়েছিলো। বাংলাদেশ সরকার সকল কর্মচারীর জন্য একটি বেতন স্কেল প্রণয়নের কাজটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশও এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে তা করতে পারেনি। তবে চাকুরী পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত করা হয়নি। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে সরকার নয়া বেতন কাঠামো কার্যকর করতে থাকেন।

১৯৭৩ সালের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা ছিল মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জন্য গৃহীত একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

বঙ্গবন্ধু ও সেনাবাহিনীঃ শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকটি কারণে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন না। পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, জনগণের সার্বিক উন্নয়ন উপেক্ষা করে শাসকগোষ্ঠী রাজস্বের একটা বড় অংশ সেনাবাহিনীর জন্য খরচ করত। এর ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হত। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর পেছনে অর্থ খরচ যতদূর সম্ভব হ্রাস করে রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সেই অর্থ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও ভারত থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, বাংলাদেশের উপর কোনো রাষ্ট্র আক্রমণ করলে ভারত বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেবে।

আওয়ামী লীগ ছিল একটি প্রবল জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। তাই আওয়ামী লীগ সরকার মনে করে যে, দেশের সেনাবাহিনী শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাকে দেশের জনগণ সুনজরে দেখবে না। এছাড়াও পাকিস্তানে সেনাবাহিনী যেভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল সেটা শেখ মুজিব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা লিপ্সা ও হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রভূত ক্ষমতা প্রদানের বিরোধী ছিল। এই কারণে মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের নিয়ে একটি প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে আওয়ামী লীগ।

১৯৭৩-এর ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লাহোর থেকে বিমানে এলেন অনেক বাঙালি সামরিক অফিসার, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দি ছিলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেমেই তারা দেশের মাটি চুম্বন করলেন। আলো-আঁধারিতে এই ভগ্নচূর্ণ তেজগাঁও বিমানবন্দরও তখন তাদের চোখে স্বর্গপুরীর মতো দেখাচ্ছিল। পাকিস্তান ফেরত সেনা অফিসারদের স্বাগত জানানোর জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।[১৭৫] পাকিস্তানে বন্দিদশায় প্রাণ হাতে নিয়ে, স্ত্রী-কন্যাদের ইজ্জতের ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে এই অফিসাররা বন্দিশালায় ছিলেন। কাঁটাতারের বেড়ার গেটে পাঞ্জাবি প্রহরী। ঘুমাতে পারতেন না কেউই। সেটা ছিল এক জীবন্ত নরকবাস।[১৭৬]

---

[১৭৫] রহমান, এম খলিলুর। কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫। (প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ১১।

[১৭৬] রহমান, এম খলিলুর। কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫। (প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ১২-১৩।

পাকিস্তান থেকে ফেরত পাঠানো সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পদে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ হাজার। এই সকল অফিসার ও সৈনিককে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তথা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হলো কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই।[১৭৭]

এই নিয়োগের পরেই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ফ্রিডম্ ফাইটার ও রিপ্যাট্রিয়েটেড নামে দুটি শিবিরের সৃষ্টি হয়ে গেল- মুক্তিবাহিনী গ্রুপ এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিকদের গ্রুপ।[১৭৮] শেষোক্ত গ্রুপ বড় হলেও মুক্তিবাহিনী অফিসারদের ক্ষমতা ও দাপট ছিল অপ্রতিরোধ্য। ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীর পরিবেশ ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মুক্তিবাহিনী অফিসাররাই।[১৭৯]

মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে তারা ছিলেন শ'খানেক অফিসার ও কয়েক হাজার সৈনিক। আর পাকিস্তান ফেরত গ্রুপে ছিলেন তার তিনগুণ অফিসার ও সৈনিক। মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের অনেকেই ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। কারণ, উপযুক্ত লোক না পেয়ে শরণার্থী শিবির ও অন্যান্য উৎস থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিয়মিত বাহিনীতে নিতে বাধ্য হন সেক্টর কমান্ডারগণ। তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী ছিল না।[১৮০] কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭২ সালেও সামরিক বাহিনীর যে কাঠামো ছিল, তাতে প্রয়োজন ছিল লক্ষাধিক সৈনিক এবং হাজার পাঁচেক অফিসার। যে বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান ফেরতদের তুলনায় দু'বছরের সিনিয়রিটি পাবেন। তাদেরকে এই সিনিয়রিটি দেয়ায় প্রত্যাগতরা অপমানবোধ করেন।[১৮১] পাকিস্তান ফেরত অফিসাররা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতিকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। অথচ নিয়মানুযায়ী যারা পাকিস্তানে বন্দিশিবিরে স্থায়ী পদে না থেকে অস্থায়ী পদে ছিলেন তাদেরকে পূর্বতন স্থায়ী পদে অর্থাৎ এক স্তর নিচে নিয়োগ করার কথা, অস্থায়ী পদের বিপরীতে নয়। যেমন, যিনি পাকিস্তান বন্দিশিবিরে অস্থায়ী মেজর ছিলেন তাকে নিয়মানুযায়ী তার পূর্বতন স্থায়ী পদ অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার কথা। নিয়ম থাকলেও পাকিস্তান ফেরত অফিসারদের ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি। উপরন্তু পাকিস্তান ফেরত অফিসারদের মধ্যে অনেকেই দুই তিন বছরের মধ্যে মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন লে. কর্নেল এরশাদ (পরে রাষ্ট্রপতি) পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনটি পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল হন। শান্তিকালীন এরকম পদোন্নতি নজিরবিহীন।[১৮২]

---

[১৭৭] চৌধুরী, মইনুল হোসেন। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক। (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০): ৫৬।

[১৭৮] অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস। অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান। বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ। (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮): ২৯।

[১৭৯] লে. কর্নেল (অব.) হামিদ, এমএ। তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা। (ঢাকাঃ পিএসসি হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩): ২০।

[১৮০] চৌধুরী, মইনুল হোসেন। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক। (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০): ৫৩।

[১৮১] লে. কর্নেল (অব.) হামিদ, এমএ। তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা। (ঢাকাঃ পিএসসি হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩): ২১।

[১৮২] চৌধুরী, মইনুল হোসেন। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক। (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০): ৫৭।

মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্তি ও ভাগাভাগি শুধু যে সামরিক বাহিনীতেই ছিল তা নয়, বেসামরিক কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও তা সমানভাবে প্রকট ছিল। যারা তখন সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি কিংবা করেননি, তাদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞার ভাব তো ছিলই, তাদের দেশপ্রেম নিয়েও সন্দেহ করা হচ্ছিল।[১৮৩]

স্বাধীনতার পরে কিছুদিনের মধ্যেই দু'জন মেজরকে মেজর জেনারেল এবং তিনজন মেজরকে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এই ঘটনা দু'টি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এবং নতুন রাষ্ট্রটির পরবর্তী ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন জেনারেল ওসমানী ও শেখ মুজিবের প্রথম পছন্দ। বর্ষীয়ান ও পেশাদার অফিসার হিসেবে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবেও যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির তরুণ অফিসার হিসেবে তিনি বার্মা ফ্রন্টে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে অন্যান্য বাঙালি অফিসারের মতো অবরুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পরই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন। বিবিসি থেকেও এ সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করা হয়েছিল।

কিন্তু জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন যেহেতু পাকিস্তান ফেরত অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা নন এবং 'অবাঙালি'; এই যুক্তিতে সেনা প্রধান হিসেবে তার সম্ভাব্য মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা শেখ মুজিবকে জোরের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেন। তরুণ নেতাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ দু'জনই কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের প্ররোচনায় অনেকটা জোরের সঙ্গে শেখ মুজিবকে এই সিদ্ধান্তটি নিতে বাধা দেন।[১৮৪] পরিশেষে সেনা প্রধান হিসেবে জেনারেল শফিউল্লাহকে মনোনীত করা হয়। আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উপ-সেনা প্রধান করা হয়। জেনারেল শফিউল্লাহ আর জেনারেল জিয়া একই ব্যাচের ক্যাডেট ছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সিনিয়রিটি অনুসারে জেনারেল শফিউল্লাহর চেয়ে অধিকতর যোগ্য ও অগ্রবর্তী অবস্থানে ছিলেন জেনারেল জিয়া। তবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতারা জিয়াকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করতেন। জেনারেল ওসমানীও জিয়াকে সুনজরে দেখতেন না। এমনকি একটা সময় জিয়াকে পূর্ব জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে আর্মি থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল।[১৮৫]শুধু অফিসারদের অসন্তোষ নয়, সৈনিকদের অবস্থাও ছিল ভয়াবহ। তাদের জুতা বা পোশাক পর্যন্ত ছিল না। পাকিস্তান প্রত্যাগত এক সিনিয়র অফিসার ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণরত খালি পা, লুঙ্গি ও গেঞ্জি অথবা হাফশার্ট পরা, রাইফেল হাতে নিয়মিত সৈনিক দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা জবাবে বলেছিলেন এদের এখনো উর্দি দেয়া সম্ভব হয়নি, কাপড়ের অভাব।

---

১৮৩ রহমান, এম খলিলুর। কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫। (প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ৩৪।

১৮৪ রহমান, এম খলিলুর। কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫। (প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ২৮।

১৮৫ লে. কর্নেল (অব.) হামিদ, এমএ। তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা। (ঢাকাঃ পিএসসি হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩): ১৬।

সৈনিকদের কাপড় ও জুতা নেই। একই সময় কুর্মিটোলায় সেনা ছাউনিতে প্রত্যেক সিনিয়র অফিসারের অফিস কামরায় লেগেছিল এয়ারকন্ডিশনার, জানালায় দামি পর্দা, দেয়াল থেকে দেয়াল কার্পেটে মোড়া। পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর জেনারেলের নিচে কারো অফিসে এয়ারকন্ডিশনার ছিল না। অফিসগুলোও ছিল শত বছরের পুরনো। যেমন অন্ধকার, তেমনি ছোট।[১৮৬]

এই আক্ষেপ থেকেই ১৯৭৩-এর নির্বাচনে সৈনিকরা ৮০ শতাংশের বেশি ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেয়। এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সামনের সারির বীর সেনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব ছিলেন দেশ, জাতির জনক আর তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে মুজিবকে রাজনৈতিক সমর্থন দেবার জন্য তারা আর তৈরি ছিল না।[১৮৭]

সৈন্যরা নিজেদের হতভাগ্য বলে মনে করতো। কারণ, তাদের খাবার নেই, কোনো প্রশাসন নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, ইউনিফর্ম নেই, গায়ের কোট নেই, পায়ে দেয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদেরকে কম্বল গায়ে দিয়ে ডিউটি করতে হয়। অনেক সিপাহি লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। তদুপরি, তাদের ওপর হয়রানি। এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যদের পেটাতো পুলিশ। রক্ষীবাহিনীর দাপটও ছিল প্রবল। এছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের হেয় প্রতিপন্ন করতেন। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সরকারি আমলারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার চোখে দেখতো। একবার সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে মেরে ফেলা হলো। সেনা অফিসাররা শেখ মুজিবের কাছে গেলেন। শেখ মুজিব আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি অভিযোগকারী সেনা কর্মকর্তাদের জানালেন যে, 'কোলাবরেটর' ছিল বলে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।[১৮৮]

সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবল হতাশা ও অসন্তোষের চিত্র ধরা পড়েছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের একটি ছোট্ট বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা তো সামরিক লোক নই। কাগজপত্রে আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের বেতন দেওয়া হয় কারণ মুজিব বলেছেন, আমরা যেন বেতন পাই। আমাদের অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণতই মুজিবের ওপর নির্ভরশীল। আইনগত কোনো ভিত্তি নেই আমাদের। আমাদের লোকেরা জাহান্নামে যাচ্ছে কিন্তু তাদের কোন অভিযোগ নেই। কারণ, তারা দেশের সেবায় নিয়োজিত। দেশের জন্যে যে কোন ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত।"[১৮৯]

শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন না করার উদ্দেশ্য যাই হোক শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। নিজের জীবন তুচ্ছ করে শেখ মুজিবের আহ্বানে সেনাবাহিনীর অফিসার থেকে শুরু করে নিম্ন স্তরের সেনারা মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের পর পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাঙালি সেনারা। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন তা জনমনে খুব বেশি প্রচার পায়নি।

---

[১৮৬] রহমান, এম খলিলুর। কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫। (প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬): ২৪।

[১৮৭] অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস। অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান। বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ। (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮): ৩৮।

[১৮৮] অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস। অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান। বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ। (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮): ১৮৩।

[১৮৯] আহমেদ মুসা। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ।* (ঢাকাঃ বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮): ১৮৩।

শেখ মুজিবের নামে পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা সেনাবাহিনী ও দেশের আপামর জনসাধারণের মনে গভীর দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটায়। মানুষ খুঁজে পায় লড়াইয়ের নতুন রসদ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশে তারা উপযুক্ত মর্যাদা পাবে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাই ছিল সেনাবাহিনীর আকাঙ্খা। পরিতাপের বিষয় স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সেই মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। তাই দেখা যায় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও হতাশা।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে শুধু সামরিক বাহিনী নয় বেসামরিক প্রশাসনের কর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক সকলেই সাড়া দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে। খুব সহজভাবে বলা যায়, ১৯৭১- এর মুক্তি আন্দোলন ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়েছিল দেশের সকল শ্রেণির সকল পেশা ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। অন্যভাবে বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন পেশার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি দেশের সেনাবাহিনীকে উন্নত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেও একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

যেমন- ইনফ্যানট্রি, আর্টিলারি, সিগন্যাল, আর্মড, ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ান এবং আনুষঙ্গিক ইউনিটসহ তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী জন্মলগ্নেই সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনী।

দেশ তখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু হাঁপিয়ে উঠেছেন দশ কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে। বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও তখন তুঙ্গে। সেই সংকটের সময়ও বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীর কথা। খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় অস্ত্রভাণ্ডার। যুগোশ্লাভিয়ায় প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র। ভারতের অনুদান ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। সে সময়ে মিগ- ২১ ই ছিল এই উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক বিমান। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই মিসর থেকে আনা সম্ভব হয়েছে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। জেনালের এরশাদ নিজেও সে সময় দিল্লিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করেন এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলেন। এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অত্যন্ত সংকটজনক

পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর প্রতি কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ করেননি। তিনি সামরিক একাডেমি স্থাপন করে আরও নতুন নতুন তেজোদীপ্ত তরুণের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আরও ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এ কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সেনাবাহিনীর অনেক কর্তাব্যক্তি এই পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেছেন। অনেক জেনারেল বিভিন্ন সেনাছাউনিতে গিয়ে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত উদার ও যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকারী হাজার হাজার সৈনিক ছিল দেশেরই সন্তান। তারা দেশের শত্রু ছিল না। জাতির জনক হিসেবে তাদের প্রতি অনুদার ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তাছাড়া সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও ছিল। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করাই বঙ্গবন্ধু যুক্তিসংগত মনে করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তখন ত্রিশ-চল্লিশ জন মাত্র কর্মকর্তা। আর প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় তেরো শত। বঙ্গবন্ধু সেদিন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সকল অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

বঙ্গবন্ধু সকলকে শুধু চাকরিতে পুনর্বাসনই করেননি, কর্মকর্তা ও সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পদোন্নতির প্রণালি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেছেন। আজকের কর্মকর্তা ও সেনানায়কদের পদমর্যাদা লক্ষ করলেই এর সত্যতা মিলবে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তা ও জওয়ানদের পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালীন বেতন প্রদান করেন। সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহের জন্যই শুধু বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, সেনাছাউনির (ক্যান্টনমেন্ট) উন্নতি ও নতুন ছাউনি নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয় তখনই। পুরোনো ছাউনিগুলোতে নতুন নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার সাথে নতুন ছাউনিও গড়ে ওঠে সারাদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'দিঘনালা', 'রুমা', 'আলিকদম'-এর মতো সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ছাউনি বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারই প্রথম সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের রেশন নিকটস্থ সেনাছাউনি থেকে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে ছাউনিতে অবস্থান করতেন তারাই শুধু এ সুযোগ লাভ করতেন।

বঙ্গবন্ধু সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনী গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে, যখন দেশ স্বাধীনতার ধকল সামলে উঠতেই হিমসিম খাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজই ছিল তখন জরুরি। তার মধ্যেও সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে দেননি বঙ্গবন্ধু, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

এদেশের সেনাবাহিনী তাই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে, বঙ্গবন্ধুর গর্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে। সেই সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠবে এ কথা কল্পনা করাও ছিল কঠিন। তাই সত্য হয়েছে বাংলাদেশে।[১৯০]

এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিকুলতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রবল ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাঃ শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। গণতন্ত্রের সাফল্য বহুল অংশে নির্ভর করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর। তাই সংবাদ মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর দমনমূলক শাসন-শোষন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান শাসকগোষ্ঠীর এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

মানুষের আত্মবিকাশের জন্য মানবাধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নির্ভিক সংবাদপত্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "কারাগারের রোজনামচা" পড়লে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ইত্তেফাক দেখে মনে হলো ৭ই জুনের হরতাল সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ছাপাতে পারবে না বলে সরকার হুকুম দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আরও হুকুম দিয়েছিল, 'এক অংশ অন্য অংশকে শোষণ করেছে এটা লিখতে পারবা না। ছাত্রদের কোনো নিউজ ছাপাতে পারবা না। আবার এই যে হুকুম দিলাম সে খবরও ছাপাতে পারবা না।' ইত্তেফাকের উপর এই হুকুম দিয়েছিল। এটাই হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! আমরা তো লজ্জায় মরে যাই। দুনিয়া বোধ হয় হাসে আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেখে! যে দেশে মানুষের মতামত বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে কেমন করে? যারা আজও বুঝছে না, জীবনেও বুঝবে না।

আমার ভয় হচ্ছে এরা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এপথে বিশ্বাস করি না। আর এ পথে দেশে মুক্তিও আসতে পারে না। কিন্তু সরকারের এই নির্যাতনমূলক পন্থার জন্য এদেশের রাজনীতি 'মাটির তলে' চলে যাবে। আমরা যারা গণতন্ত্রের পথে দেশের মঙ্গল করতে চাই, আমাদের পথ বন্ধ হতে চলেছে। এর ফল যে দেশের পক্ষে কি অশুভ হবে তা ভাবলেও শিহরিয়া উঠতে হয়! কথায় আছে, 'অন্যের জন্য গর্ত করলে, নিজেই সেই গর্তে পড়ে মরতে হয়।[১৯১] শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জোড়ালো সমর্থক।

পরিতাপের বিষয় হলেও এটা সত্য যে, স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। জোর করে বিভিন্ন সংবাদপত্র দখল করা হয়। গ্রেফতার করা হয় অনেক সাংবাদিককে। নৃশংসভাবে আক্রান্ত

---

[১৯০] শেখ হাসিনা। *শেখ মুজিব আমার পিতা।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১৭): ৩৪-৩৭।

[১৯১] রহমান, শেখ মুজিবুর। কারাগারের রোজনামচা। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১৭): ৬২।

হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের কার্যালয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর তথাকথিত মুক্তি যোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতারা ঘর-বাড়ি, দোকান, অফিস প্রভৃতি দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সংবাদপত্রকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। সিরাজুল আলম খানের অনুসারী ছাত্রলীগের একদল কর্মী ডিসেম্বরের শেষদিকে পুরনো ঢাকার রাংকিং স্ট্রিটে 'জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্' দখল করে নেয়। সেখান থেকে জামায়াতে ইসলামীর দৈনিক পত্রিকা 'সংগ্রাম' ছাপা হতো। এই দখল অপারেশনের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ নেতা আফতাব উদ্দিন আহমেদ। এই প্রেস থেকেই 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা ছাপা হতে থাকে, যা পরবর্তী সময়ে জাসদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত হয়।

শেখ ফজলুল হক মণির গ্রুপও পিছিয়ে ছিলেন না। তারাও দলবল নিয়ে 'দৈনিক পাকিস্তান' (যা পরে 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল) ও 'মর্নিং নিউজ' অফিস দখল করতে যান। ঘটনাক্রমে ওই সময় ভবনটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত তথ্যসচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি শেখ মণিকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'খবরদার, আমি যতক্ষণ আছি, এক পাও এদিকে নয়।' শেখ মণি আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাননি। 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'মর্নিং নিউজ' রক্ষা পায়; কিন্তু রেহাই পেলো না উর্দু দৈনিক 'পাসবান'- এর। তিনি উর্দু দৈনিক 'পাসবান'- এর দখল নিলেন এবং সে নাম বদলে হলো 'বাংলার বাণী'। 'বাংলার বাণী' হয়ে উঠলো আওয়ামী লীগের মুখপত্র।[১৯২]

আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে দেখা গেছে যে আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব ও সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সমালোচনায় মুখর হয়েছে ও সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইতালির সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে বাংলাদেশ থেকে স্বদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিমানে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পাঁচজন অস্ট্রেলিয় ও দুজন ভারতীয় তাকে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশ ছেড়ে না গেলে তার প্রান নাশের আশঙ্কা ছিল।[১৯৩]

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে কতগুলো ঘটনার দিকে তাকালে যে চিত্র ফুটে ওঠে সেটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাসও অতিক্রান্ত হয়নি, অথচ বাহাত্তরের ২১ জুন সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। বিস্ময়করভাবে এই গ্রেফতারের ছাব্বিশ দিন পর শেখ মুজিব বলেন, 'তার সরকার কোনো দিনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।' এর মাস দেড়েক পর আগষ্ট মাসে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা কোরবান আলী দৈনিক বাংলায় এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'সংবাদপত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে না।' ঠিক তার পরের মাসের ৬ তারিখে গ্রেফতার হলেন 'সাপ্তাহিক মুখপত্র' ও 'স্পোকসম্যান' সম্পাদক ফয়জুর রহমান। পরদিন চট্টগ্রামে 'দেশবাংলা' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

তিয়াত্তরের ১ জানুয়ারী ইউসিস অফিসের সামনে পুলিশ ছাত্র ইউনিয়নের দু'জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যার পর দৈনিক বাংলা টেলিগ্রাম বের করায় সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান ও সম্পাদক তোয়াব খান তাদের চাকরি হারান। পত্রিকার সাংবাদিক-কর্মচারীরা শেখ মুজিবের কাছে এর প্রতিকার দাবি

---

[১৯২] মহিউদ্দিন আহমদ। *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি।* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৭): ৬২-৬৩।

[১৯৩] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ৯৩।

করলে মুজিব বলেন, আমার কাগজে এসব কি লিখেছ? তোমাদের নীতি থাকে প্রেসক্লাবে ফলিও, নিজেদের ড্রইং রুমে ফলিও। আমার কাগজে এসব চলবে না।

'দৈনিক বাংলা'র দু'জনের চাকরি যাবার পর ৫ জানুয়ারী শেখ মুজিব বললেন, 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকা থেকে দু'জন পাকিস্তানী দালালকে অপসারণ করা হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নামের আগে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু না লিখলে পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' এর ৯ দিন পর শেখ আবদুল আজিজ এই বলে মন্তব্য করলেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর।'

এরপরের ইতিহাসও লাগাতার কলঙ্কের। তিয়াত্তরের ২৯ মার্চ গণকণ্ঠের সাংবাদিকদেরও জোর করে অফিস থেকে বের করে দেয়া হয়। ১৩ মে বন্ধ করে দেয়া হয় 'দৈনিক স্বদেশ', নিজেরা অযোগ্য প্রশাসক সেজে এটি বন্ধ করেন। ১৮ জুন গ্রেফতার করা হয় 'নবযুগ' সম্পাদককে। ২৯ জুন সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে বলা হয়, 'সত্য বলা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা হুমকির মুখে সীমিত স্বাধীনতায় কাজ করছি।' ১২ আগস্ট 'দেশবাংলা' বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৩ নভেম্বর 'সাপ্তাহিক ওয়েভ' পত্রিকাকে উচ্ছেদ করা হয় আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে। গ্রেফতার করা হয় সম্পাদককে।

গণকণ্ঠসহ অন্যান্য পত্রিকার ওপর বার বার হামলার প্রতিবাদে '৭৪-এর ১৬ জানুয়ারি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিভিন্ন মহলের নিকট হতে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ঘোষিত-অঘোষিত নানা রকম হুমকি, প্রাণনাশ ও প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়ার হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।'

চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ 'গণকণ্ঠ' বন্ধ করে দেয়া হয়। গ্রেফতার করা হয় পত্রিকার সম্পাদক আল মাহমুদ ও আরো কয়েকজন সাংবাদিককে। পরে আবার চালু হলেও হামলা চলতে থাকে। ৩০ জুন পুলিশ গণকণ্ঠের অফিসে ঢুকে পত্রিকার সাজানো ফর্মা ভেঙ্গে দিয়ে আসে। জুলাই মাসে 'প্রাচ্যবার্তা'র সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। চট্টগ্রামের 'ইস্টার্ণ একজামিনার' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় 'অভিমত' সম্পাদক আলী আশরাফের বিরুদ্ধে।[১৯৪]

আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের শাসনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে মুদ্রণ, সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিষ্ট্রেশন) অধ্যাদেশ [Printing, press and publications (Declaration and Registration) Ordinance] সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালে সরকার এই আইন প্রনয়ন করে। এই আইন ১৯৬০ সালে আয়ুব খানের সময়ে প্রথম বারের মতো জারী করা হয়েছিলো এবং একটি কালাকানুন হিসেবে তা নিদারুণ সমালোচনার শিকার হয়েছিলো। যেহেতু পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিলো অন্যতম প্রধান ইস্যু, সেহেতু আইয়ুব খানের এই আইন এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আওয়ামী লীগ তার আন্দোলন পরিচালনাকালে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো এবং সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ সহ সমস্ত কালাকানুন বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

---

[১৯৪] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ২১৩-২১৪।

এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৬০ সালের উক্ত আইনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং মুদ্রণ, সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিষ্ট্রেশন) অধ্যাদেশ [Printing, press and publications (Declaration and Registration) Ordinance] নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই আইন জারীর পর দেখা গেলো যে, তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে সেই কালাকানুনেরই রূপান্তর মাত্র। সংবাদমাধ্যমের ডিক্লারেশন ও রেজিষ্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ করাই ছিলো এই আইন জারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিলটি উত্থাপনের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ সংবাদপত্রের দায়িত্বহীনতার ওপর কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বিরোধী দলগুলোকে সতর্ক' করে দিয়ে বলেন যে সংবিধানে উল্লেখিত মূলনীতিগুলোর কোনো অবমাননা সহ্য করা হবেনা।

এই আইনবলে ছাপাখানা স্থাপন এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য ডিক্লারেশন সংগ্রহের বিধান জারী করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেন যে, সরকার ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশনার অধিকার বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ উদ্দেশ্যেই আইনের সমস্ত কালো অধ্যায় অপসারিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই আইনের মাধ্যমে ছাপাখানা স্থাপন কিংবা সংবাদপত্র প্রকাশনার ওপর কোনো বিধিনিষেধ প্রবর্তন করা হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশের কোনো কারণ বিরোধী দলগুলোর নেই। তিনি বিশেষ কয়েকটি সংবাদপত্রের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন এবং সেগুলোর 'দায়িত্বহীনতার' কতিপয় উদাহরণও উল্লেখ করেন। 'সাপ্তাহিক হলিডে' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের প্রতি ইঙ্গিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এধরনের সংবাদপত্র দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়েও কটাক্ষ করেছে। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে এবং সংবাদপত্রের এধরনের ভূমিকা সরকার সহ্য করবে না। তিনি যুক্তি দেখান যে, ব্যাঙের ছাতার মতো সংবাদপত্র গজিয়ে ওঠার প্রবণতা রোধ করতে হবে এবং এই বিল উত্থাপনের পেছনে সরকারের কোন বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নেই। এই আইন থেকে বোঝা যায় যে, অতীতের অন্যান্য সরকারের মতো আওয়ামী লীগ সরকারও সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এই আইন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যে ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের ওপর সরকারের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। বিরোধী দলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই আইনকে একই সাথে কালাকানুন ও নিবর্তনমূলক বলে আখ্যায়িত করে, এবং এই আইনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তারা অভিযোগ করেন, আইউব খানের কালাকানুনের অনেকগুলো বিধান উক্ত আইনে অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল শর্তগুলো ভঙ্গ করে তা পক্ষান্তরে ছাপাখানা স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশনার মতো মৌলিক অধিকারসমূহের ওপরই আঘাত হেনেছে। এই আইন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার এতে দেশে ছাপাখানা প্রকাশনার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নির্দেশ দেয়নি। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণের পেছনে সরকারের সত্যিকারের কোন সুউদ্যোগ থেকে থাকলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তীক্ষ্ণ বক্তব্যে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তা সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রকটভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছিলো। সাপ্তাহিক হলিডে'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে 'বন্য বক্তব্য বলে উল্লেখ করেন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সাংবাদিকদের ওপর কটাক্ষপাত, বিচার বিভাগের অবমাননা এবং বিরোধী দলগুলোর সহযোগী শক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তাঁর নির্জলা মিথ্যা উক্তির তীব্র নিন্দা করেন।

এটা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যখন বিরোধী দলগুলো ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে চলছে এবং আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তখন বিগত দিনের কালাকানুনসমূহের কোনো কোনোটি অব্যাহত রাখাই উত্তম হবে। তারা স্পষ্টভাবে অনুভব করেন দেশের বহু সমস্যা তখন পর্যন্ত সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র ছিলো তখন একমাত্র মাধ্যম যা সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারে।[১৯৫]

দেশে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি করার মাধ্যমেও খুব সহজে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার সুযোগ সরকারের হাতে ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সবথেকে বড় আঘাত করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে। এই সময় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সরকারের এই নির্দেশ গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সংবাদপত্রের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষপাতি। টাঙ্গাইলের এক জনসভায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছি, তার মানে এই নয় যা খুশি তাই লেখা যাবে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোনো সংবাদ প্রচার না করার আহ্বান জানান তিনি। প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, আর্থ-সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল উদ্দেশ্য। কিছু রাজনৈতিক দল এই সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংঘটিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হন।

গণতন্ত্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। জীবনের একটা বড় সময় ব্যয় করেছিলেন তিনি পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা অপরিহার্য। এই কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"-তে তিনি লিখেছেন, কর্মী সম্মেলনের জন্য খুব তোড়জোড় চলছিল। আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অফিস হয়েছে। শওকত মিয়া সকলের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করত। সে ছাড়া ঢাকা শহরে কেইবা করবে? আর একজন ঢাকার পুরান লীগকর্মী ইয়ার মোহাম্মদ খান সহযোগিতা করছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ খানের অর্থবল ও জনবল দুইই ছিল। এডভোকেট আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান এবং আনোয়ারা খাতুন এমএলএ সহযোগিতা করছিলেন। আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর

[১৯৫] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৯১-১৯৩।

জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সার্বিক মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে কতটা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "কারাগারের রোজনামচা"- গ্রন্থে। এই গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় যে একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ কায়েম থাকলে জনগণের দুঃখ, দুর্দশা কী পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তার একটি জীবন্ত চিত্র। এই গ্রন্থে তিনি লিখছেন, পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন বলে 'নিউনেশন প্রেস' বাজেয়াপ্ত করিয়াছে সরকার। এই প্রেস হইতে ইত্তেফাক', ইংরেজি 'সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস' ও বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' প্রকাশিত হইত। পুলিশ প্রেসে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্বের দিন ইত্তেফাক ও নিউনেশন প্রেসের মালিককে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে ইত্তেফাক সকল কাগজের থেকে বেশি ছাপা হয়। এর পাঠকের সংখ্যা অসংখ্য। বাংলার গ্রামে গ্রামে ইত্তেফাক পরিচিত। দেশরক্ষা আইনের বলে অন্য কোনো কাগজকে এত বড় আঘাত করা হয় নাই। ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে এবং তাহার মালিক ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে ৬ দফার দাবিকে বানচাল করতে চায়। কিন্তু আর সম্ভব হবে না। এতে আন্দোলন আরও দানা বেঁধে উঠবে। যার পরিণতি একদিন ভয়াবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কি করে আইয়ুব খান সাহেব মোনায়েম খান সাহেবকে এ কাজ করতে অনুমতি বা নির্দেশ দিলেন আমার বুঝতে কষ্ট হয়।

খবর নিয়ে জানলাম মানিক ভাই প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, সে জন্য একটুও মুষড়ে পড়েন নাই। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ কোনো প্রেসেই আওয়ামী লীগের কোনো প্যামফলেট ও পোস্টার ছাপাইতে দেওয়া হইতেছে না। যে প্রেসই ছাপায় তার মালিককে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। প্যামফলেট ছাপানো বেআইনি নয়। এমনকি কালো ব্যাজ ছাপার জন্যে 'দি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেসের' মালিককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। বোঝা গেল গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে তারা দিবে না। একদলীয় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। পূর্ব বাংলায় এটা বেশি দিন চলতে পারে না। আন্দোলনকে ভিন্ন গতি নিতে এরা বাধ্য করছে-যা আমরা চাই নাই।[১৯৬]

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মৌল নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে জনগণের দুর্দশা যে ভয়ানক আকার ধারণ করে এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করলেও তিন মাসের মধ্যে অগণতান্ত্রিকভাবে এই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান গণতন্ত্রের মৌল নীতি পদদলিত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপর দমনমূলক শাসন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার অগণতান্ত্রিক আইন জারি করে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে,

---

[১৯৬] রহমান, শেখ মুজিবুর। কারাগারের রোজনামচা। (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১৭): ১০২-১০৩।

হস্তক্ষেপ করা হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর। জনগনকে রাজনৈতিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আর এর জন্য সহ্য করতে হয়েছিল কঠোর নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরিতাপের বিষয় আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্রে আত্মনিয়োগ করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রুখে দাঁড়ায়, সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধের। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। পরিতাপের বিষয় শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্জিত হওয়ায় পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়। সৃষ্টি হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এইদিন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক জনসভায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র কেমন হবে তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান চারটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেগুলো হলো- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মৌল নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।[১৯৭]

স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রবল তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল আওয়ামী লীগের শাসনামলে। এক বছরের মধ্যেই দেশকে একটি প্রগতিশীল সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাবনায় বলা হয়, আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;
আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার

---

[১৯৭] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ৮৯-৯১।

ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। এতে জনগণকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র ভাগটির বিস্তৃত বিবরণী:

১. বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।...

২. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

৩. (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"-র প্রথম দশ চরণ।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে পার্শ্বে ধান্যশীর্ষ বেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরি উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

৫. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি পরিচিত হইবেন।

৬. (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

সংবিধান গৃহীত ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার পর সংবিধানের প্রদত্ত বিধিমতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রি, মন্ত্রিবর্গ ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ শপথ গ্রহণ করেন এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের বিধিমালায় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নিবিড় করার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা করে বাংলাদেশ। এর তিন মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সনের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।[১৯৮]

---

[১৯৮] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৩৬১-৩৬২।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের শাসক নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ পায়। এ থেকেই বোঝা যায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগ।

আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দেশের জনগণের জন্য যে সমস্ত প্রগতিশীল মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় নম্বর অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য সেই সমস্ত প্রগতিশীল মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান সবথেকে বেশি প্রসংশা অর্জন করে এই কারণে যে, এই সংবিধানে অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচিত নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়নি। এইভাবে বিভিন্ন প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পূর্বে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আওয়ামী লীগ দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। স্বাধীনতার পর এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। পরিতাপের বিষয় এই প্রগতিশীলতা তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রের মৌল নীতি থেকে সরে আসে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে সংসদ বলতে যা বোঝায় এই সংসদীয় ব্যবস্থায় তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আইন ও শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের হাতে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও সংকোচিত করা হয়। আদালতের হাত থেকে লেখ জারি করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। এই অবস্থা চলেছিল ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত। এছাড়াও কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে। আওয়ামী লীগের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করা। এই অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যেভাবে সরকার গঠন করে এটা গণতন্ত্র সম্মত হতে পারে না।[১৯৯] আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি করার ক্ষমতা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করলেও সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনের মাধ্যমে এই অগণতান্ত্রিক বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে। এই সংশোধনীতেই রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক এই দুটি বিষয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৭৪ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ণ করে বহু রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখাও হয়। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ছিল সরকারকে বাধ্য না করা হলে সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন ও জরুরি

---

[১৯৯] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ১৪।

অবস্থা জারির মতো অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে না। অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আওয়ামী লীগ সরকার এই ক্ষমতা ব্যবহার করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধন করে। শুধু তাই নয় নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন ও দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেও আওয়ামী লীগ সরকার উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এই সিদ্ধান্তটি হলো ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয় এক ব্যক্তির হাতে অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রপতির হাতে। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হয়েছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। সৃষ্টি করা হয় একটি জাতীয় দল, যার নাম দেওয়া হয় শ্রমিক কৃষক আওয়ামী লীগ বাকশাল। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন বাকশালের পদাধিকারী প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের। অন্যভাবে বলা যায় বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শাসনই প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল করে দেওয়া হয়। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২০০]

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন অগণতান্ত্রিক বলা যায় না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়েছিল। দেশের বিরাজমান নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসান ঘটানো, জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা ও সকল শোষণ-অবিচার নির্যাতন দূর করার জন্যই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ চতুর্থ সংশোধনীর অপরিহার্যতা বিষয়ে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

১. ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন পদ্ধতি। সবসময় তিনি প্রশাসনের সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন;

২. ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যা ইতিমধ্যেই সংসদের ৪ জন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিসহ দলের অসংখ্য নেতাকর্মীর প্রাণহানির কারণ হয়েছিল;

৩. গুপ্তহত্যা, অর্থনীতির ব্যাপক ধ্বংসসাধন, ধ্বংসমূলক তৎপরতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দালালদের কথিত ভূমিকা;

---

[২০০] পিনাকী ভট্টাচার্য। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ*। (UK: Horoppa, ২০২১): ৪১৭-৪২৪।

৪. জাসদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং তাদের বিধ্বংসী তৎপরতা;

৫. গোষ্ঠীবিশেষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবস্থিতি এবং সরকারবিরোধী কাজে তা ব্যবহারের অব্যাহত প্রবণতা;

৬. দুর্যোগময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশে দুর্ভিক্ষের মরণাঘাত, খাদ্যাভাব এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা;

৭. শিক্ষিত শ্রেণীই ছিল দেশের সবচাইতে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তারাই ছিল সমাজের মূল শোষক। জনগণের শ্রমলব্ধ অর্থে সুশিক্ষিত হয়েও তারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে সেই প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাতে নিদারুণভাবে উদাসীন ছিলেন, সর্বোপরি ব্যাপক দুর্নীতির সাথে দেশের দরিদ্র জনগণ জড়িত ছিলেন না অথচ তার মতে দেশের ৫০% জনগোষ্ঠী শিক্ষিত শ্রেণীই ছিলো সমস্ত দুর্নীতির ধারক ও বাহক;

৮. প্রশাসন, শিল্প এবং শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা;

৯. বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা ছিলো উপনিবেশবাদী ধারার বাহক এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তার সংস্কারমুখী পরিবর্তন ছিলো অপরিহার্য;

১০. মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত শোষণ; এবং

১১. চোরাচালান, অবৈধ মজুদদারি ও কালোবাজারির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

সমাজের বুকে বিদ্যমান এসব দুষ্টক্ষত নিরাময়ের জন্যই শেখ মুজিব প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা দিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছিল না বলেই শেখ মুজিব জনগণের ঐক্যবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ সংশোধনীকে যুক্তিযুক্ত বলা যায়, কিন্তু এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বেই শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়। তাই চতুর্থ সংশোধনীর ফলাফল বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করা সম্ভব নয়।[২০১]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে অণনতান্ত্রিক বলা যায় না। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে একটি সরকার উপহার দেওয়ার ক্ষমতা আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যেহেতু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাই স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ যে সরকার গঠন করে তার পেছনে আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করা হলে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হতো, ব্যাহত হতো উন্নয়নমূলক কাজ। এছাড়াও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। শেখ মুজিবের প্রতি জনগণের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ছিল। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনেও দেখা যায় জনগণের প্রবল আনুগত্য আওয়ামী লীগের প্রতি রয়েছে। এই দিক থেকে পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে সরকার গঠন করে তা অণনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল না।

---

[২০১] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৬৭-২৬৮।

সমাজতন্ত্র ও বাকশাল ব্যবস্থাঃ ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে রেসকোর্স ময়দানে প্রথম জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বক্তব্যে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। এই সভায় তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসেবে ৪ টি নীতির উল্লেখ করেন। এরমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল সমাজতন্ত্র। শেখ মুজিবুর রহমান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শাসন-শোষনের শিকড় উপড়ে ফেলা হবে। আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলাদেশে মুজিববাদ কায়েমের প্রচেষ্টা চালান। এর মাধ্যমে তারা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা মুজিববাদকে একটা নতুন দর্শন হিসেবে প্রচার করে। এই দর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে বলে আওয়ামী লীগ প্রচার করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যেমন- পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ। এছাড়াও বাংলাদেশকে দ্রুত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পরিকল্পনা কমিশন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে দ্রুত সুস্থ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিকল্পনা কমিশনের গঠনতন্ত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের আধিক্য ছিল প্রবল। সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। এই কর্মীরা হবে দেশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে এই বিশেষ বাহিনী। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয়করণ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজবিপ্লবে বিশ্বাসকরে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথামাত্র নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো।' জাতীয়করণ আদেশে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর দানও করেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি ব্যতীত ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কারখানা জাতীয়করণে সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করেন। জাতীয়করণ নীতি সফল করতে সরকার ব্যাংক, জীবন ও সাধারণ বীমা, পাট-বস্ত্র-চিনি শিল্পসহ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিমান, জাহাজ কর্পোরেশন প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়। অবাঙালি শিল্পপতিদের মালিকানাধীন বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না; কারণ অবাঙালি শিল্পপতিরা ১৯৭১ সালে পাইকারীভাবে পাকিস্তানে চলে যান। তবে বাঙালি ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত ছিল না।

বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের অধীনে দেশের প্রধান প্রধান আমদানি রপ্তানি ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ন্যস্ত করা হয়। পরিশেষে সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যই জাতীয়করণের পরিকল্পনা ছিল। জাতীয়করণের আওতায়

আনার জন্য যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হবে তাদের মালিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জনগণকে নতুন মালিক হিসেবে সহযোগিতা প্রদানের আবেদন জানানো হয়।

স্বাধীনতার সুফল সকল মানুষের জন্য। শিল্প-কারখানা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত নীতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ফলভোগে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এই নীতি কার্যকর হলে শ্রমিকদের তাদের মালিকদের সাথে চিরন্তন বিরোধের অবসান ঘটবে এমন আশা বঙ্গবন্ধুর ছিল।[২০২]

১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান গ্রহণের দিন গণপরিষদে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মৌল নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ওইগুলো জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনো তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়, অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছান যায় এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ, যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি- শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাদ করে আনতে চাই না। একেক দেশ একেক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজ স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্য দিকে চলেছে। রশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখা যাবে ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার নাসেরের মিসর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাদ করে এনে কোনো দিন সমাজতন্ত্র হয় না। তা যারা করেছেন, তারা কোনো দিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না- যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোভব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ বিপ্লবের মাধ্যমে যারা সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলো করতে পারেনি- এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধা হয়ই। সেটা Process- এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।[২০৩]

---

[২০২] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৩৫০-৩৫১।

[২০৩] আকিল উজ জামান খান। "সংবিধানের চার মূলনীতি ও বঙ্গবন্ধু।" নীরিক্ষা ২২৪, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ- এর গণমাধ্যম সাময়িকী (আগস্ট ২০১৯): ৬৫।

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারির পূর্বে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে সেগুলির সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতার তালিকাই ছিল দীর্ঘ। যেমন- পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। দেখা যায় যে, এই সমস্ত সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ করা ও দক্ষ পরিচালকের অভাবে সরকারের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। দেখা যায় যে, এই সমস্ত সম্পদের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা। এই সুবাদে আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পদের পরিমাণ লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পায়, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি বাসা বাঁধে। দ্রব্যমূল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। যে আসা নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই আশা-আখাঙ্খা পূরণে সরকার ব্যর্থ হয়। মানুষের নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল দেশের এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের

উদ্দেশ্যে কয়েকবার সেনাবাহিনী ও রক্ষিবাহিনী তলব করা হয়, তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।
দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠন করা হয় পরিকল্পনা কমিশন। দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন একগুচ্ছ নীতি প্রণয়ন করে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল অতিমাত্রায় কাল্পনিক ও ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিশন সুপারিশ করে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এমন দক্ষ, পরিশ্রমী, রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন এমন ক্যাডার প্রয়োজন। কিন্তু কমিশন এটা পর্যালোচনা করে দেখেনি আওয়ামী লীগ এই বিশেষ কর্মী প্রদানের ক্ষেত্রে সক্ষম কিনা। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করত। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদের মতো কয়েকজন নেতা ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতারা আন্তরিক ছিলেন না।

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশগুলি আলাপ-আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিতর্কের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উত্থাপিত হয়নি। জাতীয় সংসদেও কোনো আলোচনা হয়নি। কমিশনের সুপারিশগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, রাজনীতিবিদদের কি করা উচিত সেই দিকটির উপরেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছিল কমিশন। বাস্তবক্ষেত্রে তারা কি করছে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আরও সহজভাবে বলা যায় মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য আওয়ামী লীগের যে শ্রেণি চরিত্রের প্রয়োজন ছিল এই দলটির তা ছিল না। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাই ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। এই অবস্থায় শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব কিনা তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল কমিশনের।

শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শকে একসঙ্গে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পরে বলে অনেকেই দাবি করেন। এছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মৌল নীতি ছিল সমাজতন্ত্র। পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য

এমন কতগুলো মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যেগুলি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিল সামঞ্জস্যহীন।[২০৪]

সরকারের এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস গুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে জাসদ, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি, মৌলানা হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দেয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ চালানো হয়। জাসদ ঘেরাও আন্দোলনের ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপরেও আওয়ামী লীগ ও সরকারি বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ শুরু হয়। এইভাবে হত্যা, পাল্টা হত্যার রাজনীতি জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। শেখ মুজিব শক্তহাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি যেমন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তার নিজের দল আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রতিও অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। বহু নেতা ও সংসদ সদস্যকে তিনি দল থেকে বহিস্কার করেছিলেন।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বহুল বিতর্কিত প্রতিক্রিয়াশীল বলে সমালোচিত বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা করেছিলেন। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিভিন্ন মহল থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করা হলেও দেশের শোষিত মানুষের একমাত্র মুক্তির রাস্তা বাকশাল ব্যবস্থা বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের দিনে জাতীয় সংসদে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' মহৎ লক্ষ্যেই সংবিধানে সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। তিনি বলেন দেশে বর্তমানে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি সংসদকে লক্ষ্য করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা সত্ত্বেও জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল শোষণ-অবিচার-নির্যাতন দূরীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো।[২০৫]

শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ সাহেব বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন শুধু তাই নয় পাশাপাশি মানুষের রক্ষনশীল চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়ে এক প্রগতিশীল উন্নয়নমুখী চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারির পর থেকে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি। তাই এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

---

[২০৪] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ২১৪-২১৮।

[২০৫] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৮৫।

১৯৭৫ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু নতুন দলের কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। ৫টি ঐক্যবদ্ধ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্বের নামও ঘোষণা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রও প্রকাশ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীকে নিয়োগ করা হয়। দলের ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা ও মন্ত্রী, ৩০ জন সংসদ সদস্য ও ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। সামরিক বাহিনী, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিবর্গ, মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ৪ জন ন্যাপ নেতা এবং সিপিবি-র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদকেও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়। একই সাথে তৎকালীন সংসদের বিরোধী দলের নেতা আতাউর রহমান খান এবং বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকেও এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাংগঠনিক বিষয়ের প্রশ্নগুলো গঠনতন্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলো। দলের সর্বোচ্চ সংস্থা ছিল জাতীয় পরিষদ। প্রতি দুই বছরে একবার এই পরিষদের বৈঠক করার নিয়ম করা হয়। জাতীয় পরিষদের দু'টি বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে দলের প্রধান সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি। রাজনৈতিকভাবে দল পরিচালনা, গঠনতন্ত্রের নীতি ও নিয়ম মেনে চলার দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর। সরকারি ও সামাজিক সংগঠনগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু দল পরিচালনা ও সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে।[২০৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন জাতীয় দল কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশালের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপঃ

(১) প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন। ধাপ-ভিত্তিতে পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে এধরনের সমবায় গঠন করা হবে এবং ৬৫,০০০ গ্রামের প্রতিটিতে এর অস্তিত্ব থাকবে। ৫০০ থেকে ১০০০ পরিবারের সমন্বয়ে একটি সমবায় গঠন করা হবে। সমবায়গুলো দেশের অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো গঠনের সাথে সাথে সকল ইউনিয়ন পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সার ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং পূর্ত' কর্মসূচী পরিচালনাসহ সরকারী সকল সাহায্যমূলক তৎপরতা এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জমির ওপর বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে তবে জমির সমস্ত উৎপাদন বিভক্ত করা হবে তিন ভাগে। এর মধ্যে একভাগ থাকবে মালিকের কাছে এবং বাকী দুই ভাগ যথাক্রমে সমবায় ও সরকারের কাছে। দেশের সকল কর্মক্ষম বেকার এবং ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সমবায়ের সদস্য হবে এবং তা থেকে সমান অংশ ভোগ করবে। যুবগোষ্ঠী এই সমবায় পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(২) বাকশাল, যুব সম্প্রদায়, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতি থানায় একটি করে প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করা হবে। পরিষদের প্রধান হবেন একজন গভর্নর। তিনি একজন সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক কর্মী হবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। একজন বিশ্বাসী সরকারী কর্মকর্তাকেও গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হতে পারে। অবশ্য জেলা

---

[২০৬] মোনায়েম সরকার এবং আশফাক উল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১): ৪২১-৪২২।

প্রশাসনিক পরিষদগুলো কাজ শুরু করার এক বৎসর পর এধরনের থানা প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

(৩) বিদ্যমান জেলাগুলো বিলুপ্ত করে প্রতিটি মহকুমাকে এক একটি জেলায় পরিণত করে তাকে জনগণ, বাকশাল, সংসদ সদস্য এবং সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত নয়া প্রশাসনিক পরিষদের আওতাধীনে নিয়ে আসা হবে। একজন গভর্নর এ ধরনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করবেন। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচব্যবস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদগুলোর ওপর ন্যস্ত করা হবে। জেলা প্রশাসক পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। জেলা ম্যজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার সহ সরকারের সকল জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিষদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। জেলায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ ইত্যাদি ফোর্স' গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। অন্য কথায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, আইন শৃঙ্খলা বিধান ও দৈনন্দিন প্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদ এবং গভর্নরের ওপর ন্যস্ত হবে। জেলা প্রশাসনিক পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবে। এগুলো সবই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক একটি পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৪) বিচার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং বিচারব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে যাতে করে সাধারণ লোকের পক্ষে সুবিচার প্রাপ্তি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হয়। ত্বরিৎ এবং সুলভে সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি থানা পর্যায়ে আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।

(৫) রাজধানীকেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সচিবালয় উঠিয়ে দিয়ে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করা হবে এবং আরো অধিক সংখ্যক কর্পোরেশনকে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে।
উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান বিষয় ছাড়াও শেখ মুজিব তার প্রবর্তিত নয়া পদ্ধতি পরিচালনার লক্ষ্যে আরো কতিপয় নীতিমালা ঘোষণা করেন। সেগুলো হলো

(৬) নয়া পদ্ধতি প্রতিটি পর্যায়ে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপনের সহায়ক হবে। এই পদ্ধতিতে কর্মক্ষম প্রতিটি লোকের জন্য জাতিগঠনের লক্ষ্যে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য ছিলো সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ বাহিনী, রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে সকল পেশার লোকদের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন। তিনি সমাজের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, সৃজনীশক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে সমাজে জাতিগঠনে অবদান রাখার উপযোগী দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগণকে নিয়ে একটি অভিন্ন মোর্চা গঠনের অভিলাষী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র একটি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে সকল পর্যায় থেকে ক্যাডার সংগ্রহ করেই এধরনের অভিন্ন মোর্চা গঠন করা সম্ভব।

(৭) প্রস্তাবিত নয়া পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে গণবাহিনীতে রূপান্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছিলো। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ বাহিনী তৈরীর ইচ্ছা ছিলোনা। দেশের প্রতিরক্ষা এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় গণবাহিনীকে নিয়োজিত রাখাই ছিলো এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

(৮) গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে সুনির্দ্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জনস্বার্থের অনুকুল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা ছিলে নবউদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

(৯) সমন্বিত উদ্যোগে অধিকতর পরিশ্রমে ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি করে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

(১০) সম্পূর্ণ নতুন ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

(১১) সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা হবে। বিদ্যমান প্রশাসন-ব্যবস্থা দুর্নীতিতে নিমগ্ন এবং সেজন্য দুর্নীতি অপসারণের লক্ষ্যে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান প্রশাসন পদ্ধতির রূপান্তর সাধন। জনগণ, রাজনৈতিক নেতা এবং নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রতিটি পর্যায়ে সততা, নিষ্ঠা ও দুর্নীতিহীনতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রকাশ করতে হবে। ঘুষ গ্রহণকারী এবং আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন জীবন যাপনকারী লোকদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় করে তোলা হবে, কারণ কেবলমাত্র দুর্নীতি রোধ করা গেলেই ৩০% সমস্যার সমাধান হবে।

(১২) সকল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাকশালের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্বাহী কেন্দ্রীয়, জেলা ও অন্যান্যপর্যায়ের আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলোর সদস্যদের বাছাই না করেই বাকশালের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে বাকশালের সদস্য না হয়ে কেউ সরকারের কোনো দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

(১৩) দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমেই সরকারের সমস্ত কর্মসূচী শেষ হয়ে যাবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের এটি হবে কেবলমাত্র প্রাথমিক একটি পর্যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি ও অবিচারমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাংলাদেশী ধরনের সমাজতন্ত্রই প্রবর্তি'ত করা হবে এবং বাইরে থেকে ধার করা পদ্ধতি এখানে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব ভাবমূর্তি'।

(১৪) স্বাধীনতাবিরোধী এবং পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেও কোনো কোনো গোষ্ঠী বাংলাদেশকে একটি প্রদেশ হিসেবে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ গোষ্ঠীকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

(১৫) শ্রমিক, মালিক এবং সরকারী শ্রম বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিল্প নীতি প্রণয়ন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।[২০৭]

বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয় এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও বাকশালের চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নির্দয়ভাবে সংকোচিত

---

[২০৭] মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল। (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩): ৩৩০-৩৩৩।

করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়। জাতীয় সংসদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধানেরও গুণগত পরিবর্তন সাধন করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে দেশ একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়।

বাকশাল ব্যবস্থা বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচিত হলেও দেশের উদ্ভূত সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,১৯৮০ সালের মধ্যেই দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে। শেখ সাহেবের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাকশাল কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বাকশাল ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের প্রভাবশালী বিত্তবানদের স্বার্থে চরম আঘাত হেনেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। "স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস"- গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন ও মোঃ মাহবুবর রহমান উল্লেখ করেছেন, সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতঙ্কিত বোধ করে। প্রকৃত পক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচিতে সমাজের প্রতিটি প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ নেতৃত্বের ধ্বজাধারী গ্রামীণ এলিট শ্রেণী, সমবায় ব্যবস্থাধীনে জমির মালিকানা হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আমলারাও তাদের উপর স্থাপিত একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারেননি। সেনাবাহিনীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হয়। বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধঃস্তন করে তোলায় তা বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ সেই দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সাবেক দলীয় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটায় নিদারুণ অস্বস্তির শিকার হল।[২০৮]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হওয়ার ফলে বাকশাল ব্যবস্থার অবসান ঘটে। বাকশাল ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কিন্তু ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাকশাল ব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় বাকশাল সম্পর্কে কোনো সুসংবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যথেষ্ট কঠিন। তবুও দেখা যায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাকশাল ব্যবস্থার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলগুলির গোপন তৎপরতা কমে আসে। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, দেশের রূপকার জাতির জনক ও স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের পথ পরিবর্তন করে। আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে সামরিক শাসকবর্গ।

উপসংহারঃ শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবগঠিত

---

[২০৮] মুনতাসীর মামুন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫): ২৮৭।

বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে গভীর ঐক্য, সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব বোধ ও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। পরিতাপের বিষয় স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই মহান আদর্শগুলি অনুসরণ করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ছিল প্রবল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতি প্রদর্শনের প্রবনতা, যেটা নবজাত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে প্যারামিলিটারি গঠন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি যোদ্ধাদের দেশের কাজে লাগানো, আইন-শৃঙ্খলা ও চোরাচালান রোধে পুলিশ ও মিলিটারিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। তাই শেখ মুজিব বৃহৎ সেনাবাহিনী গঠনে আগ্রহ দেখাননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন রক্ষীবাহিনী ছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। তাই বিভিন্ন সময় সরকারের আহ্বানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে রক্ষীবাহিনীকে বিরোধী দলগুলির কাছে বিরাগভাজন হতে হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রক্ষীবাহিনী যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল তা খাটো করে দেখা হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, রক্ষীবাহিনী বিরোধী দলগুলির কাছে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থিত করার এক বিশেষ বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করে মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন, নেতা সরকারের ব্যর্থতাগুলিকে হাতিয়ার করে স্বাধীন বাংলাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থিত করার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। যেটা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে আগ্রহ দেখাননি। তিনি মনে করতেন সেনাবাহিনীর জন্য ব্যাপক অর্থ খরচ না করে সেই অর্থ জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা শ্রেয়। এছাড়াও তিনি ভারত কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন শক্তিশালী সেনাবাহিনী কিভাবে ক্ষমতার অপব্যাবহার করে। শেখ মুজিবের এই অভিজ্ঞতা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে তাঁকে অনাগ্রহী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন দেশের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে জনগনকে তুলে ধরতে। শেখ মুজিবুর রহমানের সেনাবাহিনীর প্রতি এই রকম মনোভাব সেনাবাহিনীর এক অংশের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীর মধ্যে এই রকম মনোভাব দেখা যায় যে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি সেনা অফিসাররা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হচ্ছে না।

আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এই প্রগতিশীলতা তাদের পক্ষে ধরে রাখা আর সম্ভব হয়নি। দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট, বিরোধী দলগুলির হঠকারী আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান আইন

শৃঙ্খলার অবনতি, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাচালান ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠলে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে চরম অগণতান্ত্রিক এই নীতি স্বাধীন বাংলাদেশে অনুসরণ করতে বাধ্য হন শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র দেখে স্বাধীন বাংলাদেশে এইরূপ আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কয়েকজন আমলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিল। যার ফল হয়েছিল মারাত্মক । এই অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না বলে শেখ মুজিবুর মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক এলিটদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি আমলাতন্ত্রকে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারনা পরিত্যাগ করে আমলাদের জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবের এই মনোভাব সেনাবাহিনীর মতো আমলাদের মধ্যেও অসন্তোষের জন্ম নেয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূজারী। গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসেবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার। শুধু তাই নয় এক বছরের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার ও সংবিধান কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উৎসব সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হয় আওয়ামী লীগ সরকার। পরিতাপের বিষয় মহান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূজারী হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিসর্জন দিয়ে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই পরিবর্তনকে বিভিন্ন মহল থেকে কঠোরভাবে সমালোচিত হতে দেখা যায়।

নবগঠিত বাংলাদেশে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা খুব কম ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখেছিল। সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত করতে গেলে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কর্মীর তা ছিল না। তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষনের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি। দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের বহু নেতা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পরে। ফলে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

এই অবস্থায় কতগুলো রাজনৈতিক দল যারা ছিল সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সমর্থক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে। পাশাপাশি তারা আওয়ামী লীগের শাসনকালে জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ি করতে থাকে। এক অংশের জনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর

কর্মসূচিতে সামিল হয়। এই অবস্থায় দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হঠকারী আন্দোলন প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাকশাল ব্যবস্থা চালু করার পথ সুনিশ্চিত করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অবসান ঘটিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন করা। এইজন্য তিনি শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটিমাত্র জাতীয় দল শ্রমিক কৃষক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বিরাজমান ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি শক্তহাতে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতাকে এক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত করা হলেও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনাও বাকশাল ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থা কার্যকর করতে চেয়েছিলেন জনগণের সম্মতির ভিত্তিতেই। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে শেখ মুজিব বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বিষয়টি এমন নয়। তিনি চেয়েছিলেন হতদরিদ্র মানুষের সার্বিক মুক্তি। শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে এটা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও যে আওয়ামী লীগকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন সেই আওয়ামী লীগ দলটিও উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করতে অপারগ বলে শেখ মুজিব মনে করেছিলেন। তাই তিনি সকল পেশা সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে একটি গণভিত্তিক জাতীয় দল গড়ে তুলেছিলেন।

নবগঠিত বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যা গুলির সমাধানের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দুরদর্শিতা ও অনেক বেশি সহনশীলতার প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যদি নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করত তাহলে বিশ্বে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হত। পরিতাপের বিষয় হল শাসকদল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে এগুলির অভাব জাতির জন্য বয়ে আনে এক অশনি সংকেত।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বদেশী, ব্রিটিশ বিরোধী, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেখ মুজিবুর রহমান এক নতুন রাজনৈতিক রনাঙ্গনে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙালিদের উপর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি। বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই। এর জন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল কঠোর নির্যাতন। ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জনপ্রিয় নেতা।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির উপরে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ভয়াবহ আকার নিলে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রানপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করা হয়। শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তি যুদ্ধকে পঙ্গু করে দেওয়া। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতেই বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে নয় মাসব্যাপী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মরনাপন্ন লড়াই করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, জাতির জনক, স্বাধীনতার স্থপতি ও দেশটির রূপকার। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে তখন রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বলতে যা বোঝায় তার প্রায় কিছুই ছিল না। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ফিরে পেয়েছিলেন তাদের নয়নের মনি শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা বিশ্বাস করতেন বর্তমানে বাংলাদেশে যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট চলছে এই সংকট থেকে জাতিকে মুক্তির দিশা দেখাবেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে শাসনকার্য চালানো যথেষ্ট কঠিন ছিল। নয়মাস যুদ্ধের ফলে দেশে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শাসনকার্য হাতে তুলে নেন শেখ মুজিব। বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেন তিনি। এছাড়াও যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, বিভিন্ন কল্যানমুলক কর্মসূচী, আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কয়েকশো আইন প্রনয়নের মতো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্খা পূরনের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেন তিনি। এই অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল সেনা আধিকারিকের হাতে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের অবসান ঘটে।

আমার গবেষণা পত্রটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সেগুলি হলো-

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গ বন্ধুর শাসন ব্যবস্থা ও শাসন তন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ঃ আমার গবেষণা পত্রের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর সম্পর্কযুক্ত কতগুলি বিষয় প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন- ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল। এছাড়াও সাহিত্য পর্যালোচনা, Research Gap, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এগুলির সাহায্যে আমার গবেষণা পত্র সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। ভারত বিভাগের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি যুক্তবাংলা গঠনের প্রচেষ্টা চালান। তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো না, সৃষ্টি হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। বাঙালি জাতি যাতে কোন অবস্থাতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির প্রধান পরিচয় বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু করে। তাঁরা জোর করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দেয় ভাষা আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষা আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে কারারুদ্ধ হন তিনি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরেই অনশনে বসেছিলেন তিনি।

বাঙালি ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। অন্যভাবে বলা যায় বাঙালি ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিক প্রমুখেরা ভাষা আন্দোলনকে তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি দিক থেকে বিবেচনা করত। এইগুলোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল আরো গভীরে। তিনি ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে

প্রতিপন্ন করত। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখতে চায়। বঙ্গবন্ধু এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলোচ্ছেদ না করতে পারলে বাঙালিদের ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্রমবিকশিত করে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। খুব সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রধানত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে। মুসলিম লীগের একদল প্রগতিশীল নেতা কর্মী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ভেবে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের উপর শাসকগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নিপীড়ন শুরু করে। দিনের পর দিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল চার কোটি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল দুই কোটি। রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অথচ মোট বাজেটের মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থ খরচ করা হত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ করা হত বাঙালিদের উপর। দিনের পর দিন এই বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। এরজন্য তাঁকে সহ্য করতে হয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক কঠোর নির্যাতন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের আর্থ সামাজিক মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ছয় দফা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অন্যভাবে বলা যায়, ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে আত্মসচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এক দফায় পরিনত হয়, অর্থাৎ স্বাধীনতা। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও দেখা যায় দ্রুত লীগের নেতৃত্ব চলে যায় উত্তর ভারতে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালিদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। দিনের পর দিন পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। শেখ মুজিবুর রহমান এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। তিন মাসের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী এই সরকার ভেঙে দেয়। বঙ্গবন্ধুসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৮

সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে মার্শাল আইন জারি করে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেন। শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার জন্য তাঁকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৯ সালে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। পতন ঘটে আইয়ুব খানের।

ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভা ও সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ। পরিতাপের বিষয় বাঙালিদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না ইয়াহিয়া খান। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দফায় দফায় আলোচনার পরও কোন সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়নি। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবিত জাতীয় সভার অধিবেশন মার্চের ৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন দমন করতে ২৫ শে মার্চ ইয়াহিয়া খান ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করা হয়। সূচনা হয় মুক্তি যুদ্ধের। নয় মাস মরোনাপন্ন লড়াই করে বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগ যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল সেগুলো বাস্তবায়ন করা আওয়ামী লীগের কাছে জরুরি হয়ে পড়ে। এছাড়াও নতুন সরকারের কাছে জনগনের আশা আকাঙ্খা ছিল গগনচুম্বী। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বহু আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কয়েকশো আইন প্রনয়নও করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য দ্রুত একটি সংবিধানও প্রনয়ন করা হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যোগসূত্র ছিল খুব সামান্য। লড়াই করেছে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য, মুক্তি যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি বলে দাবি করে ও বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের এই আচরণ সুনজরে দেখেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্খা ভূলুণ্ঠিত হয়। আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, খুন, সন্ত্রাস, লুটপাট, চোরাচালান ভয়ানকভাবে বেরে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পাকিস্তানের বর্বরোচিত শাসনব্যবস্থাকেও ছাড়িয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পদ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনগণ ক্রমশ দারিদ্র্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সমাজে দুর্নীতি মাথাচাড়া দেয়। ১৯৭২ সালে একটি প্রগতিশীল সংবিধান গ্রহণ করা হলেও দ্রুত সেই সংবিধানের বুকে ছুরি মারা হতে থাকে। খুব সহজভাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে সুশাসন উপহার দিতে ব্যর্থ হন। অন্যভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনগণের উপর যে নিপীড়ন চালাতো তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালালেও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সেই নীতিগুলিই অনুসরণ করতে শুরু করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান দাবিদার হিসেবে এই দলই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে দুর্বল করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক এলিটদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই দেখা যায় আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীন আইন-শৃঙ্খলা ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি গুলিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্যারামিলিটারি বাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এরা জনমনে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করে। খুন, ধর্ষণ, লুটপাট এরা বেপরোয়াভাবে করতে থাকে। সরকার এদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয় এই বাহিনীর কার্যকলাপে। শেখ মুজিবুর রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থার একটি দুর্ভাগ্যজনক নিদর্শন হল ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেন। একে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লব বলেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাকশাল ছিল আওয়ামী লীগের শাসন ক্ষমতায় চিরস্থায়ী ভাবে অধিষ্ঠিত থাকার কৌশল। নবগঠিত বাকশালের পদাধিকারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের। শেখ সাহেব নিজে ছিলেন বাকশালের চেয়ারম্যান। এছাড়াও চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শেখ সাহেব নিজেই হয়েছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মৌল নীতি থেকে সরে এসে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন শেখ মুজিব। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবাদপত্র ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। মৌলিক অধিকার থেকে জনগন বঞ্চিত হয়। আমলাদের বাধ্যতামূলকভাবে বাকশালের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সপ্তম অধ্যায়ঃ আমার গবেষণা প্রস্তাবে যে চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। যথা -

১) ভাষা আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ভাষা আন্দোলনকে ক্রমবিকশিত করে ভাষা ভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২) শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার ভূমিকা কী ছিল? এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ছয় দফাকে একদফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জনগনের আশা-আকাঙ্খা কি পূরন করতে পেরেছিল? এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪) শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বাকশাল কোনো বিপ্লব ছিল না। এটা ছিল শাসনব্যবস্থার নাম পরিবর্তন মাত্র। শাসক ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

আমার গবেষণা পত্রের প্রস্তাবে (Research Proposal) উত্থাপিত প্রশ্নগুলি হল-

১) ভাষা আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছিলেন?

২) শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার ভূমিকা কী ছিল?

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জনগনের আশা-আকাঙ্খা কি পুরন করতে পেরেছিল?

৪) শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল?

উপসংহারে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১) ১৯৪০ সালের পর মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের দাবি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দলে দলে মুসলিম ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। শেখ মুজিবুর রহমানও মুসলিম লীগের ছাত্র নেতা হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসেবে আবির্ভূত হন। বাংলায় যারা এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, এ.কে.ফজলুল হক প্রমুখ। ১৯৪৪ সালের দিকে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে আবুল হাসিমের নেতৃত্বে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। লীগের এই প্রগতিশীল অংশ পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে বাংলাকে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই প্রগতিশীল অংশের সমর্থক। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত করে একটিমাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি মেনে নিতে পারেননি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর লীগের প্রগতিশীল অংশকে কোনঠাসা করার প্রচেষ্টা চালায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব। তারা সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করেন। তাকে করাচিবাসী হতে বাধ্য করা হয়। কারণ, সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এছাড়াও মুসলিম লীগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রগতিশীলদের দুর্বল করার প্রয়াস নেয়। লীগের প্রগতিশীল চিন্তার ধারক, বাহকরা যাতে কোনো অবস্থাতেই ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার জন্ম না দিতে পারেন তার জন্য শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই আক্রমণ শুরু করে ভাষার উপর। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির প্রধান পরিচয়। এটিকে ধ্বংস করে দিতে পারলে

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকেও পঙ্গু করা খুব কঠিন হবে না বলেই শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাদের এই ইচ্ছা সফল হয়নি।

ভাষা কোনো একটি জাতির শুধু মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও গভীর ভাবাবেগ। বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৪৮ সালে শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। তার দাবি উপেক্ষা করা হয়। শাসকগোষ্ঠী দাবি করে যে, বাংলা আসলে হিন্দুদের ভাষা। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ধীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। গঠন করা হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। দলে দলে বাঙালি ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক এই ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাঙালিরা উপলব্ধি করে যে, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা ছিল আরও গভীরে। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে ধুলিসাৎ করার এক জঘন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে চলেছে শাসকগোষ্ঠী। তাই তিনি এই আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেরা আন্দোলন চালায়। পুলিশ এই আন্দোলন দমন করতে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের উপর বিনা প্ররোচনায় চালায় লাঠি। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয় কাঁদানি গ্যাস, চালানো হয় ব্যাপক ধরপাকড়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু আন্দোলনকারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অলি আহাদের বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান না থাকলে ১১ মার্চের এই আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব হতো না।

কঠোর দমননীতি অনুসরণ করেও এই আন্দোলন দমন করা যায়নি। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে আন্দোলনের প্রবল চাপে। খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার নিঃশর্তে আন্দোলনকারীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। আন্দোলনকারীদের আট দফা দাবিও মেনে নেওয়া হয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষাকে দুর্বল করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল পাক সরকার। তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করতে না পারলে স্বাধীন সার্বভৌম ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উন্নীত করার প্রয়াস নেন।

ভাষা আন্দোলন তীব্র গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এইদিন পুলিশের গুলিতে বেশকয়েকজন আন্দোলনকারী যুবক শহীদ হন। ব্যাপক অত্যাচার করা হয় ভাষা পাগল বাঙালি ছাত্র-যুবকদের উপর। বাংলার দামাল ছেলেরা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে ছিল দৃঢ়

প্রত্যয়ী। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান জানাতে নির্মাণ করা হয় স্মৃতি সৌধ। বাহান্নর এই ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে, সেই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন চেহারা প্রকাশ্যে আসে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কারাগারে তার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্তরালে থেকে। দেখা যায় অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন শেখ মুজিব। তিনি চিরকুটের সাহায্যে নির্দেশ পাঠাতেন। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরে আমরণ অনশনে বসতে দেখা যায় শেখ মুজিবকে। এ থেকেই বোঝা যায় ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে শেখ মুজিবের প্রবল আকুতি।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলা ভাষার উপর নগ্নভাবে আক্রমণ শুরু করে। তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তাই উর্দুর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথকে তারা হিন্দুদের কবি হিসেবে গণ্য করে। বাঙালির প্রাণের উৎসব ১লা বৈশাখ উদযাপন না করার নির্দেশ জারি করা হয়। উস্কানি দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িকতাকে। তারা মনে করতেন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু করা সম্ভব।

ভাষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য কঠোর দমননীতি গ্রহণ করার পরও এই আন্দোলন দমিয়ে রাখা যায়নি। আন্দোলনকারীদের প্রবল চাপে ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন আটদফা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলা ভাষার সংস্কার করে উর্দুর প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। খুব সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীকে যেমন ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। অন্যদিকে বাঙালি জাতির আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল বৃদ্ধি করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির নয় মাসব্যাপি লড়াইয়ের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ক্রমশ বিকশিত করেছে। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালি জাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হতো। অতএব দেখা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকে সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে দেখতেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকশিত করে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বিশ্ব মানচিত্রে একটি ভাষা ভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঙলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্রনেতা যিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

২) মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনে সুনির্দিষ্ট কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। সাম্প্রদায়িকতাই ছিল এই দলের প্রধান ইস্তেহার। তবে দ্বিজাতি তত্ত্বকে তারা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে

ব্যবহার করেছিলেন। এর মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগনকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল লীগের মূল উদ্দেশ্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ধর্ম অপেক্ষা তাদের আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে।

শেখ মুজিবুর রহমান লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বাংলার মুসলিম জনগনের আর্থ-সামাজিক মুক্তি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি মনে করতেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি ঘটবে। পরিতাপের বিষয় পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, বাঙালি জাতির উপর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা আরও সুদৃঢ় ও স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই নীতি অনুসরণ করল না। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মতো বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৮০-৯০ ভাগ লোক নিয়োগ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা- বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রবল বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে পাক সরকার। রাজস্বের ৭৫% সংগ্রহ করা হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অথচ বাজেটের মাত্র ২৫% অর্থ বরাদ্দ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী চাপাতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর নতুন নতুন করের বোঝা। এই বৈষম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে পড়ে। ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোনোপ্রকার সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকে সরকার।

বাঙালি জাতির চরম আর্থ-সামাজিক সংকটের সময়ে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেন। বাংলার জনমনে ছয় দফা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বলেছিলেন এটা আমাদের বাঁচার দাবি। ছয় দফা প্রচারের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত জনসভার আহ্বান করেছিলেন সেই সভাগুলোতে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ এসে যোগ দেয়। ছয় দফা উত্থাপনের জন্য দেশোদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। দেখা যায়, জনগণ ছয় দফার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। ৭০- র সাধারণ নির্বাচনে জনতা আওয়ামী লীগকে উদারহস্তে ভোট দেয়, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠী কোনো ভাবেই বাঙালিদের রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী ছিল না।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলে দিলেন ছয় দফার সঙ্গে কোন আপোষ করার অধিকার জনগণ আমাকে দেয়নি। অন্যভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফার বাস্তবায়নে ছিলন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছয় দফার বাস্তবায়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই দেখা যায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে সংঘাত সর্বাত্মক আকার ধারণ করে, সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধের। নয় মাসব্যাপি ঐক্যবদ্ধভাবে দলমত নির্বিশেষে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় বাঙালি জাতি।

অতএব দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার মানসিক শক্তি যুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বঙ্গবন্ধুর ছয় দবা দাবিকে অতিক্রম করে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকড় উপড়ে ফেলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তাই এই কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে যে সমস্ত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

৩) পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি সংবিধানের দাবি জানিয়ে আসছিল, যে সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। ১৯৭১ সালে যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার মধ্যে একটি প্রগতিশীল সংবিধানের দাবিও ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগ জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা একটি প্রগতিশীল সংবিধান উপহার দেবে। তাই স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক ভাবেই এই গুরু দায়িত্ব আওয়ামী লীগের হাতে চলে আসে।

শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধ শেষে এই দল নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসেবে দাবি করে ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানালে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, সেই সংবিধানকে অত্যন্ত প্রগতিশীল সংবিধান হিসেবে দাবি করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ বলে যে, তারা একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে ও জনগণের সার্বিক মুক্তি দিতে পারে এমন একটি সংবিধানও প্রনয়ন করা হয়েছে।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রগতিশীল সংবিধান প্রণয়ন করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, এই দলটি ছিল উদীয়মান পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে আওয়ামী লীগ জনগণকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করে যে, পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগের পূর্বে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা অক্ষুন্ন রাখার কৌশল মাত্র। তবে এক অংশের আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী পূর্বে দেওয়া আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান চারটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলো হলো- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই

আদর্শগুলি মহান হলেও এগুলো বাস্তবায়নের আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক সক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিল না। এছাড়াও এগুলি বাস্তবায়ন করতে গেলে দেশের অভ্যন্তরে যে পরিবেশের প্রয়োজন সে সম্পর্কে আওয়ামী লীগ ভাবিত ছিল না।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই দুটি আদর্শের মধ্যে আপাত বিরোধিতা না থাকলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। এই দুটি আদর্শ একসঙ্গে বাস্তবায়িত করা কার্যত বেশ কঠিন। পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উপস্থিত করেছিলেন। বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে একসঙ্গে বাস্তবায়িত করার ফলাফল কার্যত কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবিধানের এই চারটি নীতি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য ছিল না, এগুলি কতটা বাস্তবায়িত করা হবে আর কতটা বাস্তবায়িত করা হবে না, তা ছিল সরকারের স্বেচ্ছাধীন বিষয়। বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। পরিতাপের বিষয় আওয়ামী লীগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজ দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব দেয়। ফলস্বরূপ একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি বাংলাদেশ।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে আওয়ামীলীগ কতটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে আওয়ামী লীগের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শোনা যায়নি। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের চাপেই শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাই দেখা যায় অন্য তিনটি সংবিধানের মৌল নীতির মতো ধর্মনিরপেক্ষতাও সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। বাংলাদেশকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে মনে করতে পারেনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ OIC(Organization of Islamic Cooperation)-র সদস্যপদ গ্রহণ করে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে যে সংবিধান অনুমোদিত হয়, সেই সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন ও রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই কারণে, এই সংবিধানটি বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রগতিশীলতার মর্যাদালাভ করে। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই দুটি বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলস্বরূপ সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। এছাড়াও সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের উদাসীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যার ফলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি থেকে নাগরিকরা বঞ্চিত হয়। সহজভাবে বলা যায় সংবিধান গ্রহণের সময় সংবিধানের যে প্রগতিশীল প্রকৃতি ছিল, ধীরে ধীরে তা বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা চালানো হয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচি ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ছিল না। আওয়ামী লীগের এই দোদুল্যমানতা বাংলাদেশের সংবিধানের উপর দারুনভাবে প্রভাব ফেলেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধানে যা বলা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান, তাইজুদ্দীন আহমেদ যতটা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন

আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা চিন্তা জগতে ততটা প্রগতিশীল ছিলেন না। সংবিধান বাস্তবায়িত না হওয়ার পশ্চাতে এটাও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সংবিধানে প্রগতিশীলতা যতটুকু ছিল তার উপর আঘাত করা হয় ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীতে বাকশাল ব্যবস্থা গঠন করার কথা বলা হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যাবতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতা চলে যায় এক ব্যক্তির হাতে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। শেখ সাহেব নিজেই হয়ে বসেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সরকারি কর্মচারী, সংসদ সদস্যদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিচারবিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সেটি হল স্বাধীনতার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ হয়। তাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা স্বৈরাচারী পাক শাসকবর্গের শাসনব্যবস্থাকেও অতিক্রম করে যায়।

৪)তীব্র আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট, যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শেখ সাহেব বলেছিলেন, আমাকে তিন বছর সময় দিন, এই সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবো। এদেশে অশিক্ষা, দারিদ্র্য থাকবে না, না খেতে পেয়ে মানুষ মরবে না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। ১৯৭৪ সাল ছিল বঙ্গবন্ধুর তিন বছর সময়ের শেষ বছর।

দেখা গেল তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হলো আওয়ামী লীগ সরকার। অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। খুন-সন্ত্রাস, লুটপাট, রাহাজানি, সিন্ডিকেটরাজ, সরকারি আমলা, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মারাত্মকভাবে দূর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পরে। স্বজনপ্রীতি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মারাত্মক আকার নেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বামপন্থী দলগুলো সশস্ত্র আন্দোলন চালাতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করা যায়নি। শেখ সাহেবকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কয়েকবার সেনাবাহিনী তলব করতে দেখা যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাদের প্রকাশ্যে কড়াভাবে সমালোচনা করতেও কার্পন্য করেননি শেখ মুজিব।

সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার উদ্দেশ্যে সরকার অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রনয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিচার ছাড়াই দীর্ঘদিন আটক রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা তুলে দিয়ে নাগরিক বর্গের মৌলিক

অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে পাকাপোক্ত করা হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা। অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ সাহেব ব্যর্থ হন। এই কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানকে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আওয়ামী লীগের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি গুলির দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, বাঙালির নয়নের মনি স্বাধীন বাংলাদেশে এই রকম অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাবেন এটা পূর্ব বাংলার জনগণ কখনোই প্রত্যাশা করেনি।

১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি দিনটি বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই দিনেই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। আওয়ামী লীগের এক অংশের নেতা, দেশের জনগণ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবি উপেক্ষা করে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেন। এর ফলে সংবিধানের গণপ্রজাতন্ত্রিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়।

সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র দল হিসেবে বাকশালকে ঘোষণা করা হয়। সরকারি কর্মচারী ও সংসদ সদস্যদের বাকশালে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। আইনসভাকে দুর্বল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে একমাত্র ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয় এক ব্যক্তির হাতে। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দৃঢ়চিত্তে এটা বলা যায় যে, বাকশাল ব্যবস্থাকে শেখ মুজিবুর দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে ঘোষণা খরলেও বাকশাল কোন বিপ্লব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আওয়ামী লীগের চিরস্থায়ী ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি কৌশল। বাকশাল ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদাধীকারী প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ছিলেন বাকশালের চেয়ারম্যান। বাকশালের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতিক নৌকাকে। বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন জায়গা ছিল না। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সরকারের চরম ব্যর্থতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে শাসনব্যবস্থার শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। অগণতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত ছিল। আওয়ামী লীগের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি আড়াল করে বাকশালকে একমাত্র জাতীয় দল হিসেবে ঘোষণা করে সকলকে বাকশালের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের দলীয় শাসন অক্ষুন্ন রাখার এক নীল নকশা ছিল বাকশাল।

শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এর মাধ্যমে যারা সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করছিলেন তাদের প্রতিহত করা ছিল এর উদ্দেশ্য। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতো প্রগতিশীল রাজনৈতিক সক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিল না। পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সমিতি গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। কৃষকের জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে উৎপাদিত ফসল তিনভাগে বিভক্ত করে দুই ভাগ সমবায় সমিতিকে প্রদান করার কথা বলা হয়। একভাগ সংশ্লিষ্ট কৃষককে রাখার অধিকার দেওয়া হয়। দেখা যায় যে অধিকাংশ কৃষক সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে উৎসাহ বোধ করেননি। কারণ তারা দেখেছেন সরকারি সকল আর্থ-সামাজিক সুফল প্রায় সবটাই ভোগ করেছেন আওয়ামী লীগ। খুব সহজভাবে বলা যায়, বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের যে মডেল উপস্থিত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তা জনগণ গ্রহণ করেনি। মেনে নেয়নি বাকশাল ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে।

মন্তব্যঃ শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থার সূচনা করেন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বছরেই ১৫ আগস্ট তিনি নিহত হন। তার মৃত্যুর পর বাকশাল ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। এই অবস্থায় বাকশাল ব্যবস্থার সাফল্য, ব্যর্থতা, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান সহজ কাজ নয়। এছাড়াও বাকশাল ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে কোনো স্বচ্ছ তাত্বিক ব্যাখ্যা ও পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। এই অবস্থায় বাকশাল সম্পর্কিত তথ্য, পরিসংখ্যান, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও নথিপত্রের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করেছি। নতুন গবেষকের দল বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করতে গবেষণার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবেন। নব প্রজন্মের গবেষকদের কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা।

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

বাংলা ভাষায় লেখা উৎসসমূহ

গ্রন্থসমূহ

১. অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস। অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান। *বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ*। ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

২. আহাদ, অলি। *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪।

৩. আহমদ, কামরুদ্দীন। *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*। ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ১৯৭৯।

৪. আহমদ, কামরুদ্দীন। *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ।* দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০২০।

৫. আহমদ, মহিউদ্দিন। *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি।* ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৭।

৬. আহমদ, মওদুদ। *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল।* ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩।

৭. আহমদ, সা'দ। *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন।* www.pathagar.com, ১৯৯০।

৮. আহমেদ, সিরাজউদ্দীন। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* ঢাকাঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০১।

৯. আলহেলাল, বশির। *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৫।

১০. আলম, আনোয়ার উল। *রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা।* ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩।

১১. ইকবাল, মুহম্মদ জাফর। *মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।* ঢাকাঃ প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৮।

১২. ইমাম, এইচ.টি। *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

১৩. ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি।* ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬।

১৪. ইসলাম, সিরাজুল। *কাজী নূরু-উজ্জামানঃ নির্বাচিত রচনা।* ঢাকাঃ সংহতি প্রকাশন, ২০০৪।

১৫. উমর, বদরুদ্দীন। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।* শ্রাবন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯।

১৬. ঘোষ, শ্যামলী। *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১।* ঢাকাঃ ইউপিএল, ২০০৭।

১৭. চৌধুরী, মিজানুর রহমান। *রাজনীতির তিন কাল*। ঢাকাঃ অনন্যা, জুন ২০০৩।

১৮. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। *৭১-এর দশ মাস।* ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৯. দালিম, শরিফুল হক। *যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি।* ঢাকাঃ নবজাগরন প্রকাশনি, ২০০১।

২০. সেলিম মোহাম্মদ। *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক।* বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯।

২১. ভট্টাচার্য, পিনাকী। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ।* UK: Horoppa, ২০২১।

২২. খান, আতাউর রহমান। *অবরুদ্ধ নয়মাস।* ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

২৩. সাঈদ, আবু আল। *আওয়ামী লীগের ইতিহাস।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

২৪. সেন, অরুণ। *দুই বাঙালি, এক বাঙালি।* কলকাতা ৮৪: অবভাস, ২০১৬।

২৫. সরকার, মোনায়েম এবং আলম, আশফাক উল। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১১।

২৬. সরকার, মোনায়েম এবং অন্যান্য। *বাঙালির কণ্ঠ।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১৯।

২৭. সোবহান, রেহমান। *উত্তল রোমন্থনঃ পূর্ণতার সেই বছরগুলো।* SAGE Publications Pvt. Ltd., ২০১৮।

২৮. শরীফ, ড. আহমদ, নূর-উজ্জামান, কাজী এবং কবির, শাহরিয়ার (সম্পাদিত)। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।* ঢাকাঃ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭।

২৯. মামুন, মুনতাসীর। *ছয় দফা স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু।* ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০।

৩০. মামুন, মুনতাসীর এবং রহমান, মোঃ মাহবুবুর। *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।* ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৫।

৩১. মান্নান, শেখ আব্দুল। *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান।* বাংলাদেশঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

৩২. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। *মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার*। প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২।

৩৩. ইসলাম, নুরুল। *বাংলাদেশ: জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা।* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭।

৩৪. চৌধুরী, ইনাম আহমেদ। *ভাবনায় বাংলাদেশ।* হাসি প্রকাশনী, মে ২০০৯।

৩৫. ইব্রাহিম, ড. নীলিমা। *বিন্দু-বিসর্গ।* ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

৩৬. পারভেজ, আলতাফ। *মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ।* ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

৩৭. হোসেন, শাহ্ মোয়াজ্জেম। *বলেছি বলছি বলব।* অনন্যা প্রকাশ, ২০০২।

৩৮. রশীদ,ড. শেখ আব্দুর। *সেই সিভিল সার্ভিস সেইসব সিভিলিয়ান।* মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ২০১১।

৩৯. আহমদ, শারমিন। *তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা।* ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

৪০. মণি , শেখ ফজলুল হক। *দূরবীণে দূরদর্শী।* আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১১।

৪১. খান, মিজানুর রহমান। *একাত্তরের অজানা দলিল।* প্রথম আলো, নভেম্বর ২০১৩।

৪২. আহমদ, মুনিরউদ্দীন। *বাংলাদেশ: বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর।* নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৯।

৪৩. আলী, মোহাম্মদ সা'দাত। *মফিজ চৌধুরী রচনাবলী-১।* এশিয়া পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৪৪. আনিসুজ্জামান। *বিপুলা পৃথিবী।* প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

৪৫. ছফা, আহমদ। *যদ্যপি আমার গুরু।* মাওলা ব্রাদার্স ১৯৮৮।

৪৬. মুসা, এবিএম। *মুজিব ভাই।* প্রথমা প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩।

৪৭. ইসলাম, শফিউল। *পুলিশ জীবনের সারি বাঁধা পথে।* মুক্তচিন্তা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৪৮. মোহন, মহিউদ্দিন খান। *স্বর্ণযুগের ইতিকথা।* শুভ প্রকাশন, মে ২০০৩।

৪৯. মিয়া, এম. এ. ওয়াজেদ। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।* ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৭।

৫০. মিয়া, মো.শাহেনুর। *মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু।* Dhaka-1000: Press Information Department (PID), Ministry of Information and Broadcasting, Bangladesh Secretariat, মে ২০২২।

৫১. মেজর জেনারেল রহমান, এম খলিলুর। *কাছে থেকে দেখা: ১৯৭৩-১৯৭৫*। ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

৫২. মেজর জেনারেল (অব.) চৌধুরী, মইনুল হোসেন। *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক*। ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

৫৩. মুসা, আহমেদ। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ।* ঢাকাঃ বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮।

৫৪. মুরশিদ, গোলাম। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস।* ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০।

৫৫. রহমান, শেখ মুজিবুর। *আমার দেখা নয়া চীন।* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০২০।

৫৬. রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী।* ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।

৫৭. রহমান, শেখ মুজিবুর। *কারাগারের রোজনামচা।* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১৭।

৫৮. রিমি, সিমিন হোসেন। *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮।* ঢাকাঃ প্রতিভাস, ১৯৯৯।

৫৯. লে. কর্নেল (অব.) হামিদ, এমএ। *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা।* ঢাকাঃ পিএসসি হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩।

৬০. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১।* ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৬১. রনো, হায়দার আকবর খান। *শতাব্দী পেরিয়ে।* ঢাকাঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০১২।

৬২. হক, আবুল কাসেম ফজলুল। *মুক্তি সংগ্রাম।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১২।

৬৩. হক, মাসুদুল। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ।* ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ২০১০।

৬৪. হাননান, মোহাম্মদ। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)।* প্রথম খণ্ড। ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।

৬৫. হাসিনা, শেখ। *বিপন্ন গণতন্ত্র, লাঞ্ছিত মানবতা*। ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৬৬. হাসিনা, শেখ। *শেখ মুজিব আমার পিতা।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০১৭।

৬৭. হাসান, মঈদুল। *মূলধারা '৭১*। ঢাকাঃ ইউপিএল, মার্চ ২০১৩।

সাময়িক পত্রিকা, ওয়েবসাইট, দৈনিক পত্রিকা, সেমিনার, প্রবন্ধ

১. আজিজ, আতিক। "বাংলা ভাষা প্রেমিক বঙ্গবন্ধু।" সচিত্র বাংলাদেশ ৪০, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০২০): ১২-১৪।

২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, "বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠান," Bangladesh Bank, ০৩ আগস্ট ২০১৫, https://www.bb.org.bd/governor/speech/aug032015gsb671.pdf.

৩. গাজীউল হক, "ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

৪. জাহান, ড. রওনক। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনৈতিক চিন্তাধারা।" বাংলাদেশ, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, (এপ্রিল, ২০১৯)।

৫. জয়েনউদদীন, খালেক বিন। "চুয়ান্নর নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিজয়।" নীরিক্ষা ২২৪, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ- এর গণমাধ্যম সাময়িকী (আগস্ট ২০১৯): ৩৭-৩৮।

৬. জয়েনউদদীন, খালেক বিন। "মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান।" সচিত্র বাংলাদেশ ৩৭, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭): ৪-৫।

৭. কবির, শামছুল। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা।" Jagannath University Journal of Arts 9, No.1 (January -June 2019): ৫৫-৬৪।

৮. খান, আকিল উজ জামান। "সংবিধানের চার মূলনীতি ও বঙ্গবন্ধু।" নীরিক্ষা ২২৪, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ- এর গণমাধ্যম সাময়িকী (আগস্ট ২০১৯): ৬৪-৬৫।

৯. বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যাণ ফাউণ্ডেশন আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪, ১৮৭২), ৭ই আগস্ট, ১৯৭২।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬, ১৯৭২)।

১১. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এ, এন, হামিদউল্লাহর বিবৃতি, দৈনিক ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৩।

১২. বাংলাদেশ সরকার (চাকুরী) আদেশ, ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির ১ নং আদেশ, ১৯৭২।

১৩. হক, মুহম্মদ মনিরুল, "বাংলা ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু," News Bangla 24.com., ফেব্রুয়ারি, ২০২১, https://shorturl.at/baZkW।

১৪. লিপি, নাসরীন জাহান, "ভাষা সৈনিক বঙ্গবন্ধু," তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), ফেব্রুয়ারি, ২০২১, https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pressinform.portal.gov.bd/page/a0eebc05_2c78_49cd_baf2_d7d7fbf783dc/2021-02-22-12-28-562c946da9d5bc8bf82369cde7fdcbfe.pdf।

১৫. মাসুদ রেজার মামলা, ৩০শে জুন, ১৯৭৭, ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, ও হালিমা খাতুন বনাম সরকার, ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, সুপ্রীমকোর্ট।

১৬. মুজিবের বিবৃতি, জানুয়ারী ১৭, ১৯৭২, মর্নিং নিউজ, জানুয়ারী ১৮, ১৯৭২, ঢাকা।

১৭. রেজা, মাহবুব। "ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান।" সচিত্র বাংলাদেশ ৪০, নং ৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০২০): ১০-১১।

English Language Sources

Books

1. Afzal, Rafique. *Political Parties in Pakistan: 1947-1958*. Islamabad: National Commission on Historical and Cultural Research, 1976.
2. Alam, Habibul. *Brave of Heart*. Academic Press & Publishers Library, 2006.
3. Ali, Mir Shawkat. *The Evidence*. Vol. 1. Somoy Prakashan, 2008.
4. Azad, Salam. *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh*. Bookwell Publications, 2006.
5. Chaudhry, Sardar Muhammad. *The Ultimate Crime: Eyewitness to Power Games*. Lahore: Quami Publishers, 1997.
6. Choudhury, Golam Wahed. *The Last Days of United Pakistan*. The University Press Limited, 2011.
7. Cloughley, Brian. *A History of the Pakistan Army: Wars and Insurrections*. Oxford University Press, 2000.
8. Grover, Verninder. *Encyclopaedia of SAARC Nations*. Deep & Deep, 1997.
9. Lieutenant General Nasim, A.S.M. *Bangladesh Fights for Independence*. Columbia Prokashani, 2002.
10. Malik, Amita. *The Year of the Vulture*. Orient Longman, 1972.
11. Papanek, Gustav. *Pakistan Development: Social Goals and Private Incentives*. Harvard University Press, 1967.
12. Payne, Robert. *Massacre: The Tragedy at Bangla Desh and the Phenomenon of Mass Slaughter throughout History*. Bangladesh: Macmillan Company, 1973.
13. Safiullah, Kazi Mohammed. *Bangladesh at War*. Agamee Prakashani, 2015.
14. Salik, Siddiq. *Witness to Surrender*. Oxford University Press, 1997.

Journal Articles, News Paper Articles, Seminar Presentations, Online Sources, Judgements etc.

1. Ahmed, Feroz. "The Struggle in Bangladesh." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 4, no. 1 (1972): 2–22. https://doi.org/10.1080/14672715.1972.10406271.
2. Akanda, Safar A. *East Pakistan and Politics of Regionalism*. Unpublished Ph.D. thesis, University of Denver, 1970.
3. Akhtar, Jamila. "Review: Literacy and Education: Fifth Release From the 1961 Census of Pakistan." *The Pakistan Development Review* 3, no. 3 (September 1962): 424-442.
4. Alam, Azmir. "United Front Election of 1954: The Struggle for Democracy." ResearchGate, June 2023. https://www.researchgate.net/publication/371731848_United_Front_election_of_1954_The_Struggle_for_Democracy. https://doi.org/10.5281/zenodo.8179355.
5. Asadullah, Mohammad Niaz. "Educational Disparity in East and West Pakistan, 1947-1971: Was East Pakistan Discriminated Against?" *Bangladesh Institute of Development Studies* 33, no. 3 (September 2010): 1-46.
6. Hasan, Sheikh Mehedi. "Bangabandhu, Bengaliness and Bengali Identity." In *Tungipara: A Memorial Book on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, edited by Sheikh Mehedi, 169-183. Bangladesh: Bangabandhu Teachers' Forum, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, 2015.
7. Islam, Taseen. "The Language Movement of 1952." ResearchGate, August 2021. https://www.researchgate.net/publication/353955782_Academic_The_Language_Movement_of_1952. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15457.02408.
8. Jabeen, Mussarat. "Local Government System of Pakistan: An Analysis of Explained Goals of Basic Democracies of Ayub's Era." *Research Journal of Social Sciences* 19 (2021): 49-67.
9. Karmaker, Ritesh. "Bangabandhu Kindling Language Movement." *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* 7 (July 31, 2021): 41-46.
10. Khan, A. R. "A New Look at Disparity." *Forum* 3 (January 3, 1970).
11. Nishat, Nusrat, and Pizuar Hossain. "1971 Killing of the 'Bengali' Intellectuals: An Analysis from the Perspective of the 1948 Genocide Convention." *Contemporary Challenges: The Global Crime, Justice and Security Journal* 3 (2022): 4-27. https://doi.org/10.2218/ccj.v3.7075.
12. Parveen, Usmani. "Role of the All India Muslim League." *Journal of Education, Arts, Law and Multidisciplinary* 2 (2012): 28-30.
13. Rashid, Harun-or. "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-75): His Political Thoughts and Ideals." *South Asia Institute Papers Beiträge Des Südasien-Institutes Heidelberg*, issue 1 (2022).
14. Rukunuddin, Shaikh. "Representation of Deaths Due to Misrule during the Famine of 1974 in Neamat Imam's The Black Coat." *The Creative Launcher* 7, no. 4 (2022): 103-111.
15. The High Court of Bangladesh Order, 1972 (CPO no. 5, 1972).